NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : POLITICAL SCIENCE (PGPS)

PAPER - VII
(Bengali Version)

MODULES : 1-4
(All Units)

POST GRADUATE
POLITICAL SCIENCE

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : মে, 2016

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

সপ্তম পত্র

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

ঃ বিষয় সমিতি ঃ

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত
অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য
অধ্যাপক বর্ণনা গুহঠাকুরতা (ব্যানার্জী)
অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক
অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

পাঠ রচনা

পর্যায়	একক		রচনা
প্রথম	১-৪		অধ্যাপক গৌতম কুমার বসু
দ্বিতীয়	১-২		অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য
	৩-৪		অধ্যাপিকা পিউ ঘোষ
তৃতীয়	১-৪	মূল রচনা	অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়
		অনুসৃজন	অধ্যাপক অরিন্দম সিন্‌হা
চতুর্থ	১-৪		অধ্যাপক প্রতীপ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা ঃ অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় সহায়তা বিন্যাস এবং সমন্বয়সাধন ঃ অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক এবং অধ্যাপক মনোজ কুমার হালদার

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ড. অসিত বরণ আইচ
কার্যনির্বাহী নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post Graduate Political Science (PGPS)]

পর্যায় ঃ ১ ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহ

একক ১	❑	উদারনীতিবাদ ও নয়া উদারনীতিবাদ—বাস্তববাদের ও নয়া-বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারনীতিবাদের সমালোচনা	9-21
একক ২	❑	ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব (Systems Theory)	22-33
একক ৩	❑	মার্কসীয় ও অন্যান্য র‍্যাডিক্যাল ও নয়া-র‍্যাডিক্যাল তত্ত্বসমূহ	34-45
একক ৪	❑	উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর-অবয়ববাদ	47-55

পর্যায় ঃ ২ ঃ সমসাময়িক বিষয়সমূহ

একক ১	❑	ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে মার্কিন বিদেশনীতি	59-69
একক ২	❑	সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপ	70-81
একক ৩	❑	সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা	82-90
একক ৪	❑	সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া	91-99

পর্যায় ঃ ৩ ঃ বিদেশনীতি

একক ১	❑	বিদেশনীতি অনুধাবনের জন্য ধারণাগত কাঠামো	103-124
একক ২	❑	বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ	125-150
একক ৩	❑	বিদেশনীতির দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ—জনমত, আইনসভা রাজনৈতিক দলসমূহ, স্বার্থগোষ্ঠী সমূহ এবং আমলাতন্ত্রের ভূমিকা	151-189
একক ৪	❑	বিদেশনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ	190-213

পর্যায় ঃ ৪ ঃ ভারতবর্ষের বিদেশনীতি

একক ১	❑	ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব বিস্তার ঃ কারণ সমূহ	217-227
একক ২	❑	ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গঠন	228-237
একক ৩	❑	ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন	238-247
একক ৪	❑	ভারতের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্ক	248-259

পর্যায়—১
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহ

একক ১ ❑ উদারনীতিবাদ ও নয়া উদারনীতিবাদ—বাস্তববাদের ও নয়া-বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে উদারনীতিবাদের সমালোচনা

একক ২ ❑ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব (Systems Theory)

একক ৩ ❑ মার্কসীয় ও অন্যান্য র‍্যাডিক্যাল ও নয়া-র‍্যাডিক্যাল তত্ত্বসমূহ

একক ৪ ❑ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর-অবয়ববাদ

একক ১ ☐ উদারনীতিবাদ ও নয়া উদারনীতিবাদ—বাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে উদারনীতিবাদের সমালোচনা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ বিবর্তন
১.৪ উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য
১.৫ আন্তর্জাতিক উদারনৈতিক তত্ত্বের শ্রেণীবিভাজন
১.৬ নয়া উদারনীতিবাদ
১.৭ বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উদারনীতিবাদের সমালোচনা
১.৮ 'নয়া-নয়া' বিতর্ক
১.৯ উপসংহার
১.১০ সারাংশ
১.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
১.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্য ও তার বিবিধ বৈচিত্র্য আলোচনা করা। এর পাশাপাশি নয়া উদারনীতিবাদের আবির্ভাব, এবং এই দুই তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তববাদ ও নয়া বাস্তববাদের পার্থক্য সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দেওয়া এবং 'নয়া-নয়া' বিতর্কের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিলিখন দেওয়াও এই অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১.২ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূলতঃ যে তত্ত্বগুলি গুরুত্ব পেয়েছে সেগুলি হচ্ছে: বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদ, উদারনীতিবাদ ও মার্ক্সীয় তত্ত্ব। বিংশ শতকের শেষদিক থেকে ও একবিংশ শতকের প্রথমভাগে নির্মাণবাদ (Constructivism) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম তত্ত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা মূলতঃ উদারনীতিবাদকে নিয়ে আলোচনা করব। আমরা প্রথমেই এই তত্ত্বটির উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করব—এরপর আমরা এই তত্ত্বটির মূল সূত্রগুলির ওপর আলোকপাত করব; এবং সবশেষে আমরা দেখব উদারনীতিবাদ কিভাবে নয়াউদারনীতিবাদে পরিণত হল।

১.৩ বিবর্তন

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে , আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের বিকাশ মূলতঃ রাষ্ট্র দর্শনের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদেরই প্রতিফলন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে যে নতুন ধারাটির সূচনা করেছিল, তাই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নব্য ধারাটিকে প্রভাবিত করেছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে সামন্ততন্ত্রের অবসান, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত, সংস্কার আন্দোলনের (Reformation) সূত্রপাত, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক সম্ভাব্য আবির্ভাব এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ইউরোপে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার সূচনা ও আর্থ-রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ফলে আধুনিকতার (Modernity) বিকাশই ছিল উদারনীতিবাদের সূচনা ও বিকাশের পটভূমিকা।

কী ছিল উদারনীতিবাদের ধারণা? এই রাজনৈতিক আদর্শের মূল বক্তব্যই ছিল গণতান্ত্রিকরণ, বাজার, অর্থনীতির বিকাশ, যুক্তিবাদের প্রাধান্য, ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমেই মানব উন্নয়ন ও মানবসভ্যতার বিকাশ সম্ভব। এই চিন্তা মূলতঃ দুটি ধারায় বিকশিত হয়েছিল। এর প্রথম ধারাটির মূল বক্তব্য হচ্ছে: রাষ্ট্র একটি 'প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষতিকর' (Necessary evil) প্রতিষ্ঠান। একমাত্র ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ও ব্যক্তিমালিকানার মাধ্যমেই সমাজের ও ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন সম্ভব। এটিকে বলা হয়েছে অবাধ উদারনীতিবাদ (Laise-faire liberalism)। জন লক্, ভোলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), বেনজামিন কনস্টান (১৭৬৭-১৮৩০) বা হামবলট (১৭৬৯-১৮৫৯) ছিলেন এই ধারার মুখ্য প্রবক্তা। অন্যদিকে, উদারনীতিবাদের দ্বিতীয় ধারাটি রাষ্ট্রকে মানব উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। এই মত অনুযায়ী রাষ্ট্র তার মানবকল্যাণকর কার্যাবলীর মাধ্যমে একদিকে যেমন ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বণ্টন করে এবং মানবসভ্যতাকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়। মানুষের নৈতিক মান উন্নয়ন এই চিন্তাভাবনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। লক্, রুশো, গ্রীন (১৮৩৬-১৮৮২), উইলহেম (১৮৫৪) প্রমুখ দার্শনিকগণ এই চিন্তাভাবনার পথপ্রদর্শক।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, উদারনীতিবাদের এই আলোচনা আন্তার্জাতিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পাশাপাশি, এ কথাও অনস্বীকার্য যে, এই চিন্তাবিদগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে একেবারে অস্বীকারও করেন নি। জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) তাঁর Two Treatises of Government (১৬৮৯) গ্রন্থের 'Of conquest' অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধশালী দেশগুলির তুলনামূলকভাবে দুর্বল দেশগুলির প্রতি কী ধরনের ব্যবহার হওয়া উচিত তা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যবহারের ভিত্তি যে প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তঁর মতে, দূরদর্শিতাই (Prudence) হচ্ছে বিদেশনীতির মূল সত্তা। অন্যদিকে রুশো (১৭১২-১৭৭৮) প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে সন্দিহান হলেও,তিনি মনে করেন একটি 'Confederative Republic'-এর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং ঊনবিংশ শতকের দার্শনিকগণ অবশ্য উদারনীতিবাদ সম্পর্কে অনেক বেশি আশাবাদী ছিলেন। ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর Perpetual Peace (1795) গ্রন্থে সম্ভবত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদের প্রধান বক্তব্য পেশ করেন। প্রথমত, প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাবের মধ্যেই নিহিত আছে ভবিষ্যতের শান্তির বীজ। কারণ, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যগণ যুদ্ধের ফলে মানবজীবন ও মানবসম্পদের যে বিশাল ক্ষতি হতে পারে, সে সম্পর্কে সদা সচেতন। দ্বিতীয়তঃ

'বাণিজ্যের উদ্দীপনা' ('spirit of commerce') একদিকে যেন পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা ও বিশ্বজনীন আইনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেয়, তেমনি অপরদিকে শান্তিপূর্ণ ও যুদ্ধবিহীন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। কান্টের পাশাপাশি, টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯), জেরেমী বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রমুখ দার্শনিকগণও অবাধ বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে এক শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। এই ঐতিহ্যের ধারাকে মনে রেখেই পরবর্তীকালে ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩), জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) ও তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩), রিচার্ড কোবডেন (১৮০৪-১৮৬০) প্রমুখ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। এক, অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সহযেগিতার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। দুই, একটি উজ্জীবিত ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তিন, আর এই উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হতে পারে একমাত্র আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই অর্থাৎ, গণতন্ত্র, ব্যক্তি মালিকানা ও অবাধ বাণিজ্য নীতি একটি শান্তিপূর্ণ, পরস্পর নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূখ্য উপাদান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন হবসন (১৮৫৮-১৯৪০) বা নরমান এনজেল (১৮৭২-১৯৬৭) প্রায় একই রকম মত প্রকাশ করেছেন। হবসন একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদী অভিজাত সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীকে আন্তর্জাতিক শান্তির পথে প্রধান অন্তরায় বলে মনে করেছেন, তেমনি বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করবার কথা বলেছেন। নরমান এনজেল তাঁর The Great Illusion (১৯৬০) বইটিতে উৎপাদন, পরিবহন ও যোগযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনই যে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধ এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। কায়েমী স্বার্থ এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হলেও, এনজেল মনে করেন এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এলিট শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান সংঘবদ্ধতা এবং সহযোগিতাই আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পরস্পর নির্ভরশীলতার পরিবেশকে বজায় রাখবে।

এক কথায় বলা যায়, ঐতিহাসিক ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ গণতান্ত্রিকরণ, মুক্ত বাণিজ্য ও যুদ্ধের ভয়াবহতাকে দূরীকরণের মাধ্যমে মানবসভ্যতার অগ্রগমনকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছে। কিন্তু দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদের সমর্থকেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। আর, এই বৌদ্ধিক পটভূমিকাতেই উড্রো উইলসন লীগ অফ নেশনস্ গঠনে এক অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আর, লীগের ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে জন্ম দিয়েছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। কিন্তু এই দুই আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরীর পিছনে নিহিত ছিল অবিসংবাদিত সচেতনতা: যুদ্ধমুক্ত, শান্তিপূর্ণ পরিবেশই তৈরি করতে পারে একটি পারস্পরিক নির্ভরশীল, প্রগতিশীল বিশ্বায়িত সমাজব্যবস্থা।

১.৪ উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে কখনই ঐক্যমত হন নি। বরং বলা যায়, উদারনীতিবাদ বহুমুখিন এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ বিতর্কের সূচনা করতে পারে। এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার না করে, আমরা এই তত্ত্বটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমতঃ, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অবাধ বাণিজ্য নীতির মধ্য দিয়েই মানবসভ্যতা

ক্রমান্বয়ে আরও প্রগতির দিকে এগিয়ে চলতে পারে। এই প্রগতির মূল দ্যোতক হচ্ছে: যুদ্ধের অবসান, ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ, গণতান্ত্রিকরণ ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি। রবার্ট কেওহানের মতে, বাস্তববাদ ইতিহাসের মধ্যে প্রগতির সন্ধান পায় না, উদারনীতিবাদ এক পুঞ্জীভূত প্রগতির (comulative progress) ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সংস্কৃতি, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় একমাত্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে। আর, এই সহযোগিতা প্রতিফলিত হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছু নৈতিক মানের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে, আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার মানসিকতার মাধ্যমে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনে পারস্পরিক সহযোগিতাকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করার মধ্য দিয়ে।

তৃতীয়তঃ, শান্তি, সমৃদ্ধি, ন্যায়বিচার ও সহযোগিতা নির্ভর করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার গভীরতার ওপর। আর, এটা হচ্ছে আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলেই যুদ্ধে যেমন একদিকে হয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয়, তেমনি জাতীয় সীমানার ধারণাও পরিণত হয়েছে সেকেলে ধারণায়। আর, এই আধুনিকীকরণের পদ্ধতির মূল উপাদানগুলি হচ্ছে: উদারনৈতিক গণতন্ত্র, বাণিজ্যিক ও সামরিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, চেতনার বিকাশ (cognitive progress)। আন্তর্জাতিক সামাজিক একীকরণ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন।

চতুর্থতঃ, উদারনীতিবাদ সভ্যতার বিকাশ ও মানব উন্নয়নের যে সমস্ত মানদণ্ডের ওপর গুরুত্ব দেয়—যেমন, অবাধ বাণিজ্য, উদারনৈতিক গণতন্ত্র, নৈতিকতাবোধ ইত্যাদি—সেগুলি একটি সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের চালিত করে। সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি হচ্ছে মূল আলোচ্য বিষয় (basic unit of analysis)। তার মানে এই নয় যে, এই মতবাদ রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করে। কিন্তু এই মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অজস্র এককের (actor) মধ্যে রাষ্ট্র একটি অন্যতম—হয়ত বা প্রধানতম—একমাত্র নয়। আসলে, এই তত্ত্বটি এমন এক সামাজিক চিত্রে বিশ্বাস করে যেখানে ব্যক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু পাশাপাশি, এই তত্ত্বটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার ওপর গুরুত্ব দেয়।

পঞ্চমতঃ, উদারনীতিবাদ বিশ্বাস করে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী এবং তা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনশীল। একথা যেমন অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়, তেমনি সেই একই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বার্থ বা প্রয়োজনীয়তাকে বিঘ্নিত করতে চায় না। অন্যভাবে বলা যায়, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সমন্বয় বিধান করাই আন্তর্জাতিক উদারনীতিবাদের অন্যতম লক্ষ্য।

ষষ্ঠতঃ, এই মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বহুলাংশেই গঠিত হয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক গোষ্ঠীর চরিত্র ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা যেমন একটি দেশের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি, পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাত্রা, আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যদক্ষতা ইত্যাদিও একটি দেশের বিদেশেনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সর্বশেষতঃ, আন্তর্জাতিক উদারনীতিবাদের মতে, রাষ্ট্রস্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগের প্রভাব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতখনি পড়বে, তা অনেকটাই নিভর করে রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর এবং তা সবসময়ই এগিয়ে চলে বিবর্তনের পথ ধরে। ইমানুয়েল কান্ট যেমন মনে করতেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ কখনই নিজের মধ্যে যুদ্ধ করে না—তারা নিজেদের সমস্যা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেয়। এটিই 'গণতান্ত্রিক শান্তি

তত্ত্ব' বা Democratic Peace Theory নামে পরিচিত। এই তত্ত্বটি থেকে এই অনুমান করাই যায় যে, পৃথিবী জুড়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হলেই বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু তা হবে বিবর্তনের পথ ধরে।

১.৫ আন্তর্জাতিক উদারনৈতিক তত্ত্বের শ্রেণীবিভাজন (Typology)

Mark W. Zacher ও Richard A. Matthew ১৯৯৬-এর দশকের মাঝামাঝি লেখা একটি প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক উদরনীতিবাদের ধারাকে ছটিভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমতঃ, প্রজাতান্ত্রিক উদারনীতিবাদ (Republican Liberalism): এই মত অনুযায়ী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উদারনৈতিক শান্তি (Liberal Peace) নিহিত রয়েছে এমন এক নৈতিকতায় মধ্যে যেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংঘাত সমাধানের মাধ্যমে। তাছাড়া, এই রাষ্ট্রগুলি বিশ্বাস করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়েই আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্যিক উদারনীতিবাদ (Commercial Liberalism): এই তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বাড়ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাত্রা, গভীরতা, দ্রুততা যত বাড়বে ততই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকবে এবং নৈরাজ্যের প্রবণতা ও সংঘাতের সম্ভাবনা কমতে থাকবে। এর অন্যদিকটি হচ্ছেঃ ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে সর্বজনীন ও সর্বজনগ্রাহ্য অর্থনৈতিক নীতির দাবী জোরদার করতে থাকবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে যে অর্থনৈতিক নীতি দীর্ঘদিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির অঙ্গ ছিল, তা আন্তর্জাতিক নীতির আঙ্গিনায় এসে উপস্থিত হচ্ছে বা হবে।

তৃতীয়তঃ, সামরিক উদারনীতিবাদ (Military Liberalism): Zucher ও Matthew-এর মতে, এই তত্ত্বটির উৎস খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৪৬ সালে Bernard Brodie-এর লেখা The Absolute Weapons এবং ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত John Herz-এর International Politics in the Atomic Age বই দুটির মধ্যে। সাম্প্রতিককালে ১৯৮৯-তে প্রকাশিত John Muller-এর Retreat from Doomsday: The Obsolence of Major War বইটিতেই এই তত্ত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। এই তত্ত্বটির মূল সূত্র প্রধানত দুটিঃ এক, সামরিক প্রযুক্তি ও পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্বার্থের এক পরম্পরার সৃষ্টি করেছে। দুই, সামরিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও একে অপরকে সামরিকভাবে আঘাত করবার প্রবণতা যদি কমানো যায়, তাহলে অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ অনেকটাই সুগম হয়। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার পটভূমিকায় অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, পারমাণবিক অস্ত্র নিবারণ সংক্রান্ত চুক্তি বা ব্যবস্থাসমূহ বৃহৎশক্তি বা পারমাণবিক অস্ত্র আছে এমন দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের সম্ভবনাকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

চতুর্থতঃ, জ্ঞানসঞ্জাত উদারনীতিবাদ (Cognitive Liberalism): এই তত্ত্বটির মূল প্রশ্ন হোল: যুক্তি, শিক্ষা ও জ্ঞান আদৌ কি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এককের দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থ, অগ্রাধিকারকে পরিবর্তন করে সহযোগিতামূলক প্রকল্পের দিকে নিয়ে যেতে পারে? একটু অন্যভাবে বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন একক কিভাবে শিক্ষালাভ করে, যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে বা স্বকীয় জ্ঞানকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে? যে সমস্ত বিশেষজ্ঞগণ নয়াকার্যবাদে (Neofunctionalism) বিশ্বাস করেন—যেমন আর্নেস্ট হাস বা

ডেভিড মিত্রানি—তাঁরা মনে করেন আন্তর্জাতিক একীকরণের সূত্রপাত হয় সাধারণত তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে। এই অভিজ্ঞতাই আরও বৃহত্তম ক্ষেত্রে সহযোতির পথ প্রশস্ত করে। একেই বলা হয় 'ছল্‌কে-পড়া'র প্রভাব বা spill-over effect। কারও কারও মতে, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সচেতনতা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বকে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ যেমন প্রশস্ত হয়, তেমনই আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যেরও অবসানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়।

পঞ্চমতঃ, সমাজবিদ্যাগত উদারনীতিবাদ (Sociological Liberalism): এই দৃষ্টিভঙ্গীর মুখ্যত তিনটি ধারা আছে। এক, কার্ল ডয়েস দেখিয়েছেন বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগের প্রভাব কিভাবে পারস্পরিক সংস্কৃতি, মানুষের রাজনৈতিক স্বকীয়তা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক একীকরণের পদ্ধতিকে প্রভাবিত করতে পারে। দুই, নয়াকার্যবাদ তত্ত্বে বিশ্বাসী বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে আদান প্রদান কিভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিন, কেওহান, নাই, রোসেনাও প্রমুখ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণ দেখিয়েছেন অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠনসমূহ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছে।

সর্বশেষতঃ, প্রতিষ্ঠানগত উদারনীতিবাদ (Institutional Liberalism): এই মতবাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের বা বিশ্বাস, অথবা আন্তর্জাতিক Regime অথবা আন্তর্জাতিক সংগঠন উদারনীতিবাদকে প্রভাবিত করতে পারে। এর একটি ধারা প্রতিফলিত হয়েছে English School-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে। এই ধারার অন্যতম প্রবক্তা হেড্‌লী বুল মনে করেন, বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন নিজেদের মধ্যে একই ধরনের স্বার্থ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং মনে করে এরা সকলেই একই ধরনের আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, তখনই আন্তর্জাতিক সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। অপর একটি ধারা পরিলক্ষিত হয় মানবধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পটভূমিকায়। মানবধিকারের পূর্ণাঙ্গ ধারাণাটিই দাঁড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে। এর পাশাপাশি কেউ কেউ বলেন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ধারণাটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবোধ, চেতনা, অধিকার ও দায়িত্ববোধের সূচনা করতে পারে এবং আপাত নৈরাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংজ্ঞাকে নতুনভাবে তৈরি করতে পারে।

এই আলোচনার উপসংহারে দুটি বক্তব্য রাখা দরকার। এক, Zecher ও Matthew মনে করেন আগামী দিনে পরিবেশগত উদারনীতিবাদ (Ecological Liberalism) নামে আরও একটি নতুন ধারা উদারনীতিবাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। দুই, আন্তর্জাতিক উদারনীতিবাদের একটিই লক্ষ্য—কীভাবে ব্যক্তির নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং অধিকার রক্ষা করা যায়, আর কীভবে এবং কতটা রাষ্ট্র এই কাজে সফল হল।

১.৬ নয়া উদারনীতিবাদ (New Liberalism)

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ ঠিক কোন মুহূর্তে নয়া-উদারনীতিবাদে পরিণত হল, তা বলা কঠিন। চার্লস কেজলি (Charles Kegley) নয়াউদারনীতিবাদের সন্ধান পেয়েছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) আদর্শবাদের মধ্যে। রবার্ট জ্যাকসন ও জর্জ সোরেনসেন এই তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সন্ধান পেয়েছেন আর্নেস্ট হাসের (Ernest Haas) কার্যবাদের মধ্যে এবং রবার্ট কেওহান

(Robert Keohane) ও জোসেফ নাইয়ের (Joseph Nye) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence) তত্ত্বের মধ্যে। তবে বিংশ শতকের শেষার্ধে ১৯৯১-তে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসানের পরে এবং বিশ্বায়নের গতি তীব্রতর ও গভীরতর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। আর, ১৯৮৯ সালে ফ্রান্সিস ফুকিয়ামার (Francis Fukuyama) 'The End of History?' নামক প্রবন্ধটি The National Interst নামক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর এই তত্ত্বটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা অনেকখানি বেড়ে যায়।

চার্লস কেজলি নয়া উদারনীতিবাদের যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলি হচ্ছে: গণতন্ত্রের বিকাশ, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, অর্থনৈতিক পরস্পরনির্ভরশীলতা ও এর পরিণতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় সীমানার আপাতগুরুত্বহীনতা, নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, আন্তর্জাতিক সংগঠনের পুনরুজ্জীবন, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত নিরসন, দ্বি-রাষ্ট্রিক ও বহু-রাষ্ট্রিক কূটনীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া, এবং নৈতিকতাকে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কেজলির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বহুলাংশেই সনাতন উদারনীতিবাদের নীতিগুলিরই প্রতিফলন। তবে, কেজলির আলোচনর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়া উদরনীতিবাদকে কিছুটা হলেও নুতন বৈচিত্র্য দিতে সক্ষম হয়, এবং কেজলির মতে, এই তত্ত্বটি একটি দেশের বিদেশনীতিকে সেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিরই প্রতিফলন বলে মনে করে। দুই, এই তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করা হয়নি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পশ্চাদপসরন করলেও, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তিন, শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে ও অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তি বজায় রাখা সম্ভব। চার, আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আগামী দিনে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করবে।

এনড্রু মোরাভসিক (Andrew Moravsik) তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে নয়াউদারনীতিবাদের তিনটি মূল সুত্রের উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, বিশ্বায়নের ক্রমবর্ধমান গতিময়তার ফলে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দাবী দাওয়া করছেন। আসলে সাম্প্রতিক কালে বিশ্বরাজনীতির গতিময়তা বোঝা যায় যে একটি রাষ্ট্রের জনসমষ্টি কিভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মেটাতে চাইছে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র মূলত তার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিভিন্ন দাবীদাওয়ার ভিত্তিতেই আধুনিক রাষ্ট্র তার বিভিন্ন 'পছন্দ' (Preferences) নির্ধারণ করে, আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় সেই 'পছন্দ'গুলোকে তুলে ধরার ও আদায় করার মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় পছন্দের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে কেন্দ্র করেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণ গড়ে ওঠে। বলা যায় রাষ্ট্রীয় পছন্দ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণের ওপরই নির্ভর করে আন্তর্জাতিক স্তরে নীতিসংক্রান্ত নির্ভরশীলতা। অর্থাৎ, নয়া উদারনীতিবাদ মূলত নির্ভর করে তিনটি সূত্রের ওপর: রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বসাবাসকারী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর চরিত্রর ওপর; রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রকৃতির ওপর; এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্বরূপের ওপর।

জেরী সিম্পসন (Gerry Simpson) সাম্প্রতিককালের নয়াউদারনীতিবাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি ধারার উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, পদ্ধতিগতভাবে কিভাবে তার নিজস্ব নীতিগুলিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের আলোচনা করা যায়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নয়া উদারনীতিবাদের কোন কোন প্রবক্তা

উদারনীতিবাদের আপাতদৃষ্টিতে অলীক (Utopian) আদর্শগত ধারণাগুলিকে সরিয়ে রেখে রাষ্ট্রীয় পছন্দ, বিভিন্ন পছন্দের মধ্যে কৌশলগত হিসাব (Strategic Calcutations), যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মতো পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রীয় পছন্দের প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব দিতে চান। এনড্রু মোরাসভিকের ১৯৯৭ সালে International Organization-এ প্রকাশিত Taking preferences seriously: a liberal theory of interenational politics' নামক প্রবন্ধটি এই ধারার অন্যতম প্রতিনিধি।

দ্বিতীয়তঃ, ধারাটি দাঁড়িয়ে আছে মূলতঃ দুটি যুক্তির ওপরঃ এক, এই ধারটি উদারনৈতিক রাষ্ট্র ও অ-উদারনৈতিক রাষ্ট্রের (Illiberal State) মধ্যে একটি পার্থক্য নিরূপণ করে। যে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে মান্য করে চলে, তারা হচ্ছে উদারনৈতিক রাষ্ট্রের উদাহরণ—আর যে সমস্ত রাষ্ট্র এই আইনকে অস্বীকার করে বা এর থেকে দূরে সরে থাকতে চায়, তারাই হচ্ছে অ-উদারনৈতিক রাষ্ট্র। দুই, 'আন্তঃসরকারী' ব্যবস্থার (Transgovernmentalism) মাধ্যমে অ-উদারনৈতিক রাষ্ট্রের ওপর উদারনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ ও মূল্যবোধ আরোপ করার পদ্ধতি বাদ দেওয়া হয়। পরিবর্তে, গুরুত্ব দেওয়া হয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, সমভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে লৌকিকতাবিহীন সম্পর্ক স্থাপন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা অথবা প্রাতিষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থাপনা গঠনের ওপর। এ্যানি মেরি স্লোটারের (Anne-Marie Slaughter) ২০০৪ সালে প্রকাশিত A New World Order বইটিতে এই ধারণার স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, নয়া উদারনীতিবাদের এই ধারাটি একদিন যেমন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখায়, তেমনি অপরদিকে কিভাবে সেই ভবিষ্যতে পৌঁছান যায় তার দিক নির্দেশ করে। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—কখনও অর্থনৈতিক একীকরণের মাধ্যমে, আবার, কখনও প্রয়োজন হলে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। এই তত্ত্বটি পৃথিবীকে সাম্য বা ন্যায়বিচারের জগৎ না ভেবে, স্বাধীনতার দুনিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়; এবং আইনকে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান বলে মনে করে। এই তত্ত্বটি সমসাময়িক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অপূর্ণতাকে অস্বীকার করেনা। বরং মনে করে, আরও উদারনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই দুর্বলতা দূরীভূত হবে। আর এই উদ্দেশ্যেই, এ ধারাটি মনে করে, নয়া উদারনীতিবাদের লক্ষ্যই হচ্ছে আরও 'পরিপক্ক উদারনৈতিক গণতন্ত্র'-এর (Mature liberal democracies) প্রতিষ্ঠা করা এবং 'সংরক্ষনের দায়িত্ব'কে (Responsiblity to Protect) মেনে নেওয়া। জন আইকেনবেরী (John Ikenberry) ও মেরী স্লটারের (Anne-Marie Staughtar) ২০০৬ সালে প্রকাশিত Forging a World of Liberty under Law গ্রন্থটিতে নয়উদারনীতিবাদের এই বক্তব্য বিকশিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রিন্সটন প্রজেক্ট (Princeton Project) হিসেবে পরিচিত।

১.৭ বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উদারনীতিবাদের সমালোচনা

বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তববাদের সমর্থকগণ কীভাবে উদার-ও-নয়া উদারনীতিবাদের সমালোচনা করেছেন, তা আলোচনা করার আগে খুব সংক্ষেপে এই দুটি তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা দরকার। হানস মরগেনথাউ বাস্তববাদের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি এই তত্ত্বের ছ'টি সূত্র উল্লেখ করেছেন: এক, মানবপ্রকৃতির মূল ভিত্তি স্বার্থান্ধতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা সমানভাবে প্রযোজ্য। দুই, এর পাশাপাশি ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের মানবিক বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলেচনাতেও পরিলক্ষিত হয়।

তিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র মূল বিশ্লেষণের একক এবং রাষ্ট্র সব সময়েই জাতীয় স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। চার, সারা পৃথিবী যেহেতু নৈরাজ্যের শিকার, সেহেতু সামরিক ক্ষমতার ক্রমাধ্বয়ে বৃদ্ধির মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যায়। পাঁচ, আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার একমাত্র পথই হচ্ছে শক্তি-সাম্যের (Balance of Power) সৃষ্টি করা। ছয়, আন্তর্জাতিক আইন বা সংগঠনের কার্যকারিতা সম্পর্কে এই তত্ত্বটি সর্বদাই নেতিবাচক ও সন্দিহান।

অন্যদিকে, নয়াবাস্তববাদ (Neorealism) তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বাস্তববাদের মূল বক্তব্য—যেমন, নৈরাজ্য বা শক্তিসাম্যের ধারণা ইত্যাদিকে অস্বীকার করেন না। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা, কেনেথ্ ওয়ল্জ্ (Kenneth Waltz) মনে করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'একক' (Unit) এবং 'কাঠামো' (Structure) দুটি স্তর বর্তমান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় এই দুইয়ের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ, নয়া বাস্তববাদীগণ মনে করেন 'ক্ষমতা' হচ্ছে মূলত একটি মাধ্যম (means) যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বের সমর্থকেরা সামরিক ক্ষমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (Variable) হিসেবে মনে করেন। সবশেষে, সামরিক শক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন মুখ্য নিয়ন্তার অনুপস্থিতি যেমন বাস্তববাদীদের সামনে 'নিরাপত্তাজনিত সংশয়'কে (Security Dilemma) অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে একইভাবে, একক-কাঠামোর ঘাত-প্রতিঘাতের পরিণতি হিসেবে নয়া বাস্তববাদীদের সামনে সমস্যা দেখা দিয়েছে: একক ও কাঠামোর মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী। এই সমস্যাটিকে বলা হয় 'একক-কাঠামো' সংক্রান্ত (Agent-Structure) সমস্যা।

প্রশ্ন হচ্ছে: বাস্তববাদের বা নয়াবাস্তববাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উদারনীতিবাদ বা নয়াউদারনীতিবাদকে কীভাবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে? প্রথমতঃ, উদারনীতিবাদের সমর্থকেরা মানব ইতিহাসকে সবসময়েই প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করেছেন। এরই পরিণতি হিসেবে তাঁরা হিংসাবিধ্বস্ত পৃথিবী শেষ পর্যন্ত শান্তির দিকে এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, তা হল: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কোন সামরিক সংঘাত হয়নি বলে ভবিষ্যতে হবে না এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় কী? আবার, একথাও সত্য যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি—কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে অজস্রবারই বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক নীতি এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একথা বলা বোধ হয় ভুল হবে না যে, তথাকথিত উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জোট—যাকে জেরি সিম্পসন বলেছেন 'Liberal Coalitions'—বিভিন্ন অজুহাতে, যেমন 'War on Terror' বা 'মানবিকতার খাতিরে হস্তক্ষেপ' (humanitarian intervention),—বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘাতে অবতীর্ণ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, যা ঘটছে তা হল আইনি দৃষ্টিভঙ্গীতে হয়ত হচ্ছে না, কিন্তু মানবিকতার নামে হিংসার অনুশাসন চলছে।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কী রাজনৈতিক একীকরণের জন্ম দিতে পারে? আমরা যদি ইউরোপীয়ন ইউনিয়নের দিকে নজর দিই তাহলে দেখা যাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ও তার জটিলতা রাজনৈতিক একীকরণের লক্ষ্যকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে গ্রীসের অর্থনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানির ভূমিকা এবং গ্রীসকে কঠোর অর্থনৈতিক সংযমী নীতি (austerity measures) পালনে বাধ্য করা সম্ভবত এই ইঙ্গিতই দেয় যে অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল

রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল রাষ্ট্রের দাবী মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক একীকরণের পথে অন্তরায় হয়েই থাকবে।

তৃতীয়তঃ, বিশ্বায়নের যুগে নব্য উদারনীতিবাদের প্রবক্তাগণ যতই রাষ্ট্রের পশ্চাদপসরণের কথা বলুন না কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্ত-সরকারী সংস্থায় বা যোগসূত্রের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেলেও, এরা রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণকে খুব একটা পরিবর্তন করতে পারেনি বলেই অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন।

চতুর্থতঃ, নয়া উদরনীতিবাদের বক্তব্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। আবার, একই সঙ্গে তাঁরা মনে করেন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃদুনিয়ার মধ্যে বিভাজনের সীমানা অত্যন্ত ক্ষীণ। আর, এখানেই প্রশ্ন ওঠেঃ রাষ্ট্র যদি একবার তার নিজস্ব 'পছন্দ' ও 'অগ্রাধিকার' (priorities) নির্ধারণ করে ফেলে, তাহলে তার পরিবর্তন করা কি সম্ভব? নয়া উদরনীতিবাদীগণ মনে করেন, এই ধরনের পরিবর্তন তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পছন্দ ও অগ্রাধিকার পরিবর্তিত হবে। এই যুক্তিতে বাস্তববাদীদের রাষ্ট্রের পছন্দ অগ্রাধিকারকে সার্বজনীন, সমপর্যায়ভুক্ত এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করার প্রবণতাকে অস্বীকার করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে: সেক্ষেত্রে নয়া উদরনীতিবাদিগণ আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ফেলেন।

১.৮ নয়া-নয়া বিতর্ক (Neo-Neo Debate)

উদারনীতিবাদ ও নয়াউদারনীতিবাদের উপরোক্ত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশ্ন তোলা যায়: নয়া-বাস্তববাদ ও নয়াউদারনীতিবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ডেভিড বল্ডউইন (David Baldwin) এই দুই তত্ত্বের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলি নিরূপণ করেছেন। এক, নয়াবাস্তবাদীগণ নৈরাজ্যকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। নয়াউদারনীতিবাদীগণ নৈরাজ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার (survival) প্রয়োজনীয়তাকে তুলনামূলকভাবে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করেন। এরা মনে করেন, নয়াবাস্তববাদীগণ আন্তর্জাতিক পরস্পরিক নির্ভরশীলতা, বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক অনুশাসন (International Regime) গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিতে চান না।

দুই, নয়াবাস্তববদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তখনই সম্ভব, যখন রাষ্ট্র তা করতে উদ্যত হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জন করা যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন একে বজায় রাখা। নয়াউদারনীতিবাদীগণ মনে করেন, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যখন পরস্পরের পরিপূরক হবে, তখনই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব। তিন, উদরনীতিবাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন একক নিজস্ব সর্বজনগ্রাহ্য স্বার্থের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে লাভবান (Absolute Gains) হতে পারে। অন্যদিকে, নয়াবাস্তববাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার লক্ষ্যই হচ্ছে কেউই যেন বেশি শক্তিশালী না হয়ে ওঠে—অর্থাৎ, এরা আপেক্ষিক লাভ (Relative Gain) তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। চার, নয়াবাস্তববাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আপেক্ষিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নিরাপত্তা বজায় রাখা ও স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। নয়া উদারনীতিবাদীগণ অপর দিকে গুরুত্ব দেন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং অ-সামরিক বিষয়বস্তু, যেমন পরিবেশ সংরক্ষণ, ইত্যাদির ওপর।

পাঁচ, নয়াবাস্তববাদীগণ রাষ্ট্র স্বার্থ বা অভিপ্রায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন রাষ্ট্রীয় সামর্থ্যের (capabilities) ওপর। এই মত অনুযায়ী প্রতিযোগী রাষ্ট্রের অভিপ্রায় সম্পর্কে অনিশ্চয়তার জন্যই রাষ্ট্র নিজস্ব সামর্থ্য বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। অপরদিকে নয়া উদারনীতিবাদ গুরুত্ব দেয় রাষ্ট্রের অভিপ্রায় ও পছন্দ-অপছন্দের ওপর। সর্বশেষতঃ নয়াউদারনীতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশাসনকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান উপাদান বলে মনে করে—তাঁদের মতে, এগুলোই আন্তর্জাতিক সহযোতিার পথ প্রশস্ত করে। অপরদিকে, নয়া বাস্তববাদীগণ মনে করেন রাষ্ট্রীয় আচরণ অথবা নৈরাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার ওপর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা অনুশাসনের প্রভাব খুবই নগণ্য।

১.৯ উপসংহার

উপসংহারে, আমরা নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে পারি: এক, উদারনীতিবাদ ও নয়া উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্যই হচ্ছে ব্যক্তি এবং সমষ্টি-ই হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল আলোচ্য বিষয়। রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তি এবং বিভিন্ন অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গড়ে তুলতে পারে। দুই, এই মতবাদ এক চিরায়ত আশাবাদের স্বপ্ন দেখায়। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে মানবসমাজ এক ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিন, নয়াউদারনীতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনীতির (Political Economy) ওপর গুরত্ব আরোপ করে। এদের প্রধান যুক্তি হচ্ছে, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র এক পরিপূর্ণ শান্তির দিকে এগিয়ে চলে—রাষ্ট্রব্যবস্থার সামনে বিপন্নতাবোধ যত কমে আসতে থাকে, আন্তর্জাতিক সংঘাতের সম্ভাবনাও তত কমতে থাকে। এই তত্ত্বটির মূল লক্ষ হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে নিরাপত্তা, উন্নতি ও ব্যক্তির মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। চার, এই তত্ত্ব অনুযায়ী তিনভাবে শান্তির পথ প্রশস্ত হতে পারে: বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তি, গণতন্ত্রের মাধ্যমে শান্তি ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে শান্তি। বাণিজ্যবৃদ্ধি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাকে তুলনামূলক ভাবে গৌণ করে রাখবে; অর্থনৈতিক উদারীকরণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলবে; আর আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংখ্যাবৃদ্ধি শান্তি ও সমৃদ্ধিকে বিশ্বায়িত করে তুলবে। পাঁচ, আর এই চিন্তাকে সামনে রেখেই সাম্প্রতিক কালে গড়ে উঠেছে বিশ্ব সুশাসনের (Global Governance) তত্ত্ব। এই তত্ত্ব যত না রাষ্ট্রকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচনা করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সংস্কার নিয়ে, এবং গণতন্ত্রকে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায়, বা অরাষ্ট্রীয় সংস্থাকে কোন পদ্ধতিতে আরও বেশি সক্রিয় ও সৃজনশীল করে তোলা যায়, তা নিয়ে।

সবশেষে বলা যায়, উদারনীতিবাদ ও নয়াউদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্বরাজনীতি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার এক গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম যথার্থ তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি যেমন সামরিক ক্ষমতার প্রাধান্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তেমনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে, তার ওপর গুরুত্ব দেয়। এর পাশাপাশি এই তত্ত্বটি যথাযথভাবে ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ব ব্যবস্থার গতিময়তা আলোচনার মাধ্যমে এক সম্ভাব্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর স্বপ্ন দেখায়।

১.১০ সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমেই দেখেছি উদারনীতিবাদের বিবর্তন—কারণ, এই বিবর্তনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আন্তর্জাতিক উদারনীতিবাদের সাম্প্রাতিক ধারণাটি। উল্লিখিত হয়েছে আন্তর্জাতিক উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন প্রগতির পুঞ্জীভূত চেহারা, আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার গুরুত্ব, আধুনিকীকরণের সঙ্গে উদারনীতিবাদের সম্পর্ক, ব্যক্তির উপর গুরুত্ব, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা, আভ্যন্তরীণ ও বহির্জগতের মধ্যে সমন্বয়ের গুরুত্ব এবং শান্তির পূর্বশর্ত হিসেবে গণতন্ত্রের সম্ভাব্য ভূমিকা। উদারনীতিবাদকে ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: প্রজাতান্ত্রিক, বাণিজ্যিক, সামরিক, জ্ঞানসঞ্জাত, সমাজবিদ্যাগত ও প্রতিষ্ঠানগত উদারনীতিবাদ। উদারনীতিবাদ কীভাবে নয়াউদারনীতিবাদে পরিণত হল, সেই আলোচনা করতে গিয়ে নয়া উদারনীতিবাদের উৎপত্তি, মূল বৈশিষ্ট্য সূত্র, এবং এর বিভিন্ন ধারার ওপর সৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বাস্তববাদ ও নয়াবাস্তবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার মাধ্যমে উদরনীতিবাদ ও নয়াউদারনীতিবাদের মধ্যে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে—যা 'নয়া-নয়া' বিতর্ক নামে পরিচিত—তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। উপসংহারে, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই তত্ত্বটি কিভাবে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করতে পারে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে।

১.১১ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ তত্ত্বের বিবর্তনের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।
২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদারনীতিবাদ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করুন।
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পাঠের ক্ষেত্রে নয়াউদারনীতিবাদ তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. প্রজাতান্ত্রিক উদারনীতিবাদকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন?
২. সামরিক উদারনীতিবাদ অথবা জ্ঞানসঞ্জাত উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. বাণিজ্যিক উদারনীতিবাদ অথবা প্রাতিষ্ঠানিক উদারনীতিবাদের ওপর টীকা লিখুন।
৪. এনড্রু মোরাভসিক বর্ণিত নয়া উদারনীতিবাদের মূল অনুমানগুলি সংক্ষেপে লিখুন।
৫. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নয়া-নয়া' বিতর্ক বলতে কি বোঝায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. জন লক্ যে অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তার শিরোনামটি কী? আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে তিনি কি বলেছিলেন?
২. 'Perpetual Peace' বইটির লেখক কে? বইটির লেখক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে কী বলেছিলেন?

৩. উদারনৈতিক রাষ্ট্র ও অ-উদারনৈতিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪. 'প্রিন্সটন প্রকল্পের' ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Baylis, John, Steve Smith and Patricia Owens eds. *The Globalization of World Politics* (Oxford University Press), chapters 6 and 7.
2. Jackson, Robert and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford Unversity Press) chapter 4.
3. Kegley, Charles Jr. ed., *Controversies in International Relations Theory: Realism and the Neoliberal Challenges* (New York St. Martin's Press), chapters 1, 5 and 6.
4. Reus-Smit, Christian and Duncan Snidal eds. *The Oxford Handbook of International Relations* (Oxfoed University Press), chapters 13 and 14
5. বসু, গৌতমকুমার, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব ও বিবর্তন* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ), প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়

একক ২ ☐ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব (Systems Theory)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ ব্যবস্থার সংজ্ঞা
২.৪ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের মৌলিক নীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
২.৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব
২.৬ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের সমালোচনা
২.৭ উপসংহার
২.৮ সারাংশ
২.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে ব্যবস্থা তত্ত্বটির মৌলিক নীতিগুলোকে, বৈশিষ্ট্যসমূহকে তুলে ধরার এক প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, এই তত্ত্বটির বিভিন্ন দিক, বিবর্তন, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর সমালোচনা তুলে ধরাও এই অধ্যায়টির অন্যতম উদ্দেশ্য।

২.২ ভূমিকা

১৯৫০-এর দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যবহারবাদী বিপ্লবের (Behavioral Revolution) পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাবেকী পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে বিতর্কের পটভূমিকায় ব্যবস্থা তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে এই তত্ত্বটির গুরুত্ব কিছুটা কমলেও, ১৯৭৯ সালে কেনেথ ওয়ালটজের (Kenneth Waltz) বিখ্যাত গ্রন্থ Theory of International Politics প্রকাশিত হলে 'ব্যবস্থা' সংক্রান্ত ধারণাটির সাময়িকভাবে আবির্ভাব হয়। কেনেথ ওয়ল্‌জ্ এই তত্ত্বটির এবং ধারণার তীব্র সমালোচনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার উন্মেষ ঘটান যেটি নয়াবাস্তববাদ (Neorealism) বা কাঠামোগত বাস্তববাদ (Structural Realism) নামে বিখ্যাত। এই অধ্যায়ে আমরা ব্যবস্থাতত্ত্বকে নিয়ে. আলোচনা করব। আমরা প্রথমে 'ব্যবস্থা' বা Systm-এর একটি সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করব। এর পরে আমরা এই তত্ত্বের স্বরূপ, মৌলিকনীতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব। এর পর আমরা দেখব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ এই তত্ত্বটির বিভিন্ন দিক কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তার ধারাবহিকতা। সবশেষে, এই

তত্ত্বের সাধারণ সমালোচনা এবং কেনেথ ওয়ল্‌জের তীক্ষ্ণ সমালোচনা তুলে ধরা হবে।

২.৩ 'ব্যবস্থা'-র সংজ্ঞা

১৯৬৫ সালে জে. গুডম্যান (Jay S. Goodman) নামে একজন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ Background নামক পত্রিকায় 'The Concept of System in International Relations Theory' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধে 'ব্যবস্থা' বা System-এর তিন ধরনের সংজ্ঞা উল্লেখ করেছিলেন। প্রথম সংজ্ঞাটিতে তিনি 'ব্যবস্থা'কে দেখেছিলেন একটি বর্ণনা হিসেবে (System-as-Description): এই ধারণা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মূলতঃ কতকগুলি মিথষ্ক্রিয়ার সমাহার এবং এই মিথষ্ক্রিয়াগুলির নিজস্ব প্রবণতা বা ধারা আছে। এই ধারা বা প্রবণতাগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই সংজ্ঞাটির মূল উল্লেখ দেখা যায় জেমস রোসেনাউ-এর (James Rosenau) লেখায়—রোসেনাউ-এর মতে 'ব্যবস্থা' সাধারণত নিহিত থাকে পরিবেশের মধ্যে, এবং এটি তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখে। স্বাভাবিকভাবে, এই 'ব্যবস্থা' নিজস্ব কাঠামো এবং পদ্ধতির মধ্য দিয়ে স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখে বা নিজেকে পরিবর্তন করে। জন হার্জের (John Herz) যৌথ নিরপত্তা ব্যবস্থা, জর্জ লিস্কার (George Liska) সমতা বজায় রাখার ব্যবস্থা' বা মর্টন কাপলানের (Morton Kaplan) বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (যা পরে উল্লিখিত হবে) এই প্রথম পর্যায়ের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত।

গুডম্যান ব্যবস্থার দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিকে 'ব্যবস্থা'কে একটি 'ব্যাখা' (System-as-Explanation) হিসেবে দেখেছেন। এই সংজ্ঞা অনুসারে 'ব্যবস্থা' হচ্ছে কতগুলি 'সুবিন্যস্ত ধারা' (arrangement)—এই সুবিন্যস্ত ধারাগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এককের (Unit) ব্যবহার ও কার্য্যাবলী ব্যাখ্যা করতে সাহয্য করে। কেনেথ ওয়ালটজের 'তৃতীয় ভাবমূর্তি' (Third Image), বা কাপলানের শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থার (Loose Bipolar System) ধারণা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

'ব্যবস্থা'র তৃতীয় সংজ্ঞাটিতে গুডম্যান এটিকে একটি 'পদ্ধতি' (System-as Method) বলে মনে করেছেন। এই সংজ্ঞা অনুসারে 'ব্যবস্থা' হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার অন্যতম পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণী ধারণা (Analytical concpt)। এই বক্তব্য অনুযায়ী ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন একক কিভাবে একটি সুবিন্যস্ত ধারার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছে, অথবা, একক-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারিক ধারা তৈরি হচ্ছে, তার আলোচনা করা। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'ব্যবস্থা' যেমন কার্যকারণ সম্পর্ক আলোচনা করতে পারে, তেমনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাজনও করতে পারে—এটি যেমন বৃহত্তর স্তরে সমগ্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে আলোচনা করতে পারে, তেমনি, উপ-ব্যবস্থারও (Sub-system) আলোচনা করতে পারে। চার্লস ম্যাকলেলান্ডের (Charles MaClelland) 'সংগঠিত জটিলতা'র (Organized Complexity) ধারণা বা কাপলানের ক্রীড়া তত্ত্বের (Game Thoery) প্রয়োগের উল্লেখ করেন,- তখন তা এই 'ব্যবস্থা' ধারণার তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত হিসেবে গুডম্যান মনে করেন।

গুডম্যানের বক্তব্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ব্যবস্থা' ধারণাটির ব্যবহার হয়েছে অনেকটাই যথেচ্ছভাবে। আসলে অনেক বিশেষজ্ঞই 'ব্যবস্থা' বলতে সঠিক কী বোঝায়, তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেন নি। যেমন, আইনিস ক্লড (Inis L. Claude) তাঁর বিখ্যাত বই Power and International Relations (১৯৬২)-এ 'ব্যবস্থা'র ধারণাটি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কখনই এই ধারণাটির সংজ্ঞা দেননি।

অপরদিকে ব্যবস্থাকে পদ্ধতি হিসেবে দেখলে, যে কোন ধারণার বিশেষজ্ঞই এই 'ব্যবস্থা' শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন, তুলনামূলক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তথা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন, তাঁরা বারবার এই ধারণাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা কখনই পরিষ্কার হয় নি এই 'ব্যবস্থা' বলতে তাঁরা কী বোঝাচ্ছেন। ইমানুয়েল ওয়লারাস্টাইনের বিশ্ব-ব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন তোলা সম্ভবত একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। মূল সমস্যা হচ্ছে 'ব্যবস্থা'র ধারণাটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। গুডম্যানের মত অনুযায়ী, 'ব্যবস্থা'র প্রথম সংজ্ঞাটি যেহেতু একান্তই বর্ণনা ভিত্তিক, সেহেতু এর তাত্ত্বিক তাৎপর্য খুব বেশি তা বলা যাবে না। কিন্তু 'ব্যবস্থা' যখন 'ব্যাখ্যা' বা 'পদ্ধতি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন এই ধারণাটির তাত্ত্বিক গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে যায়। তিনি মনে করেন, 'ব্যবস্থা'কে যখন 'ব্যাখ্যা হিসেবে দেখা হয়, তখন তার মূল বক্তব্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে যে 'সুবিন্যস্ত ধারা' আছে, সেটিই মূলত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিণতি (Outcome) নির্ধারণ করে। কাপলান, ওয়লজ বা রিচার্ড রোসক্রেনস্ (Richard Rosecrance) সেই প্রচেষ্টাতেই ব্রতী হয়েছিলেন।

২.৪ ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের মৌলিক নীতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা তত্ত্বের আলোচনা করা হয়, তা এসেছে মূলত Genral Systems Theory (GST) থেকে। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় GST-র তিনটি অনুমানের উল্লেখ করেছেন: এক, ব্যবস্থা হচ্ছে কয়েকটি সম্মিলিত উপাদানোর সমাহার। দুই, এই সম্মিলিত উপাদানের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া সহজেই মেনে নেওয়া যায় বা উপলব্ধি করা যায়। তিন, প্রতিটি উপাদানই আবার এককভাবে এই বিভিন্ন উপাদানের সমাহারের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ, এই বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে দেখলে বলতে হয়: 'ব্যবস্থা' মূলত একটি কাজের সঙ্গে (Effect) কারণের (cause) সম্পর্ক তৈরি করে—উপকরণ (Input) পরিণত হয় উপপাদে (Output)। এটি নিঃসন্দেহের ব্যবস্থা তত্ত্বের সহজতম বিবৃতি।

এখন, এই অনুমানগুলোকে আমরা যদি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার (International System) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে, জোসেফ ফ্র্যাংকেলের (Joseph Frankel) মতে, আমরা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারি। এক, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মূল উপাদান হচ্ছে রাষ্ট্রের কার্যাবলী। দুই, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও গতিময়তা বা কার্যক্রম নির্ধারিত হয় এই বিভিন্ন এককের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। তিন, এই একক সমূহের কার্যসূচি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্রিয়াপ্রণালী নির্ধারিত হয় এই ব্যবস্থার পরিবেশসংক্রান্ত প্রভাবের দ্বারা। এখানে পরিবেশ (Environment) বলতে বোঝান হয় পারিপার্শ্বিকতাকে যার দ্বারা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হতে পারে—যেমন, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে জোসেফ ফ্রাংকেল, ওরান ইয়ংকে (Oran Young) অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কতকগুলি ধারণাকে (Concepts) চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এক, এই তত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে সমস্ত বিশেষজ্ঞই কতকগুলি ধারণাকে মেনে নিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে: একক (Unit), কাঠামো (Structure), পদ্ধতি (Processs) এবং পটভূমিকা (Context)। দুই, যে কোন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকেই কতকগুলি

উপব্যবস্থাতে ভাগ করা যায়—এই বিভাজন হতে পারে ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে, যেমন দক্ষিণ এশিয়া, ইউরেশিয়া ইত্যাদি, আবার, তা হতে পারে কর্মসূচির ভিত্তিতে, যেমন সার্ক, আশিয়ন (ASEAN) ইত্যাদি। তিন, আলোচনার সুবিধার জন্য পটভূমিকা (Context) এবং 'পরিবেশে'র (Environment) মধ্যে একটি কৃত্রিম বিভাজন করা হয়েছে। আমরা যদি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাকে 'context' বা 'পটভূমিকা' বলে মনে করা যেতে পারে। আবার, যদি আঞ্চলিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাহলে অন্যান্য আঞ্চলিক ব্যবস্থা বা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে 'পরিবেশ' বা 'Environment'-এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, এই বিভাজন একান্তই গবেষণার বা আলোচনার সুবিধার জন্য।

এখন ব্যবস্থা তত্ত্ব যেহেতু কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে এই তত্ত্বে সাপেক্ষ বা আস্থাস্থাপক উপাদান (Dependent variable) ও-স্বাবলম্বী উপাদান (Independent variable) কোনগুলি? মূলত, একক, কাঠামো, পদ্ধতি এবং পটভূমিকাকে স্বাবলম্বী উপাদান বলে উল্লেখ করা যায়। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একক বলতে বোঝায় সেই সমস্ত সংগঠিত গোষ্ঠীকে যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং অন্য কোন গোষ্ঠীর কাছে আপাতদৃষ্টিতে অধিগত (Subordinate) নয়। রাষ্ট্র, বহুজাতিক সংস্থা, আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আবার বিভিন্ন এককের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে যে বিশেষ ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকে কাঠামো (Structure) বলে উল্লেখ করা হয়। শক্তিসাম্যের ব্যবস্থা, দ্বিমেরু বা বহুমুখীন (Multipolar) ব্যবস্থাকে কাঠামো হিসেবে মনে করা যেতে পারে। এগুলিকে কাঠামো বলা হয় কারণ আন্তর্জাতিক এককগুলি এই বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়ে নিজেদেরকে পরিচালিত করতে হয়েছে এবং সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছে। কাঠামো সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে একটি নিয়মানুগ ধারায় (Regularities) পর্যবসতি হয়। পদ্ধতি (Process) কিন্তু কাঠামো থেকে ভিন্ন—পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন এককের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যম ও বিভিন্ন ধরণ। পদ্ধতিসমূহের আলোচনা করা যায় বিভিন্ন প্রণালীর (mode) মাধ্যমে—যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোচনাটি দ্বিরাষ্ট্রীয় (bilateral) বা বহুরাষ্ট্রীয়—(multilateral) স্তরে হচ্ছে কিনা অথবা, আলোচনার পরিবেশ সহযোগিতামূলক না সংঘাতপূর্ণ ইত্যাদি। আর পটভূমিকা (context) বলতে বোঝায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাকে। এগুলোকে স্বাবলম্বী উপাদান বল হয়—কারণ, আপাতদৃষ্টিতে এগুলো অন্তত কিছুকালের জন্য স্থিতিশীল হয় (stable) এবং এদের প্রভাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, আমরা যে উপাদানগুলিকে স্থায়ী বলে মনে করছি, সেগুলোও পরিবর্তনশীল এবং এই পবির্তনকেও অন্তত কিছু সময়ের জন্য স্থায়ী ধরেই, আমরা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনগুলি আলোচনা করি, অর্থাৎ, ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব স্বাবলম্বী ও সাপেক্ষ বা আস্থাজ্ঞাপক উপাদানসমূহের সম্পর্ক অনেকটাই পদ্ধতিগত (Methodological)।

ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের সাপেক্ষ বা আস্থাজ্ঞাপক উপাদানকে জোসেফ ফ্রাংকেল মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আলোচিত অথবা সমলোচিত উপাদানটি হচ্ছে ক্ষমতা (Power)। এর বিবিধ সংজ্ঞা থাকলেও, মূলত ক্ষমতা বলতে বোঝান হয় একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নির্দেশে বা অনুরোধে পরিচলিত হয়। ক্ষমতা কখনও কৃতি (possession), কখনও চালিকা শক্তি (moving forces), কখনও পারস্পরিক সম্পর্ক ভিত্তিক। ক্ষমতা কখনও সম্ভাব্য (Potential), কখনও প্রকৃত (Actual), আবার কখনও বা অনুমিত (Putative)। পারমাণবিক অস্ত্র কোন রাষ্ট্র তৈরি করলে, এটি তার অধিগত শক্তি। সে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে

প্রয়োগ করবে কি করবে না মূলত চালিকা শক্তির পরিচয়—অর্থাৎ, এই পারমাণবিক অস্ত্র কোন রাষ্ট্রের হাতে থাকা মানে, এটি নির্ধারণ করবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক। আবার, এই শক্তি হবে সম্ভাব্য তখনই যখন অন্যরাষ্ট্র পারমাণবিক রাষ্ট্রের হাতে কতকগুলি পারমাণবিক অস্ত্র আছে বা আদৌ তার প্রয়োগ করবে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা করবে বা চিন্তা করবে। এটি একই সঙ্গে অনুমিত ক্ষমতারও প্রতিফলন হতে পারে। আর প্রকৃত ক্ষমতা বলতে বোঝাবে কী পরিমাণ অস্ত্র পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রটির আছে, তার ওপর।

দ্বিতীয় সাপেক্ষ উপাদানটি হচ্ছে ক্ষমতার ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ (Management of Power)। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাস্তব ও নয়াবাস্তববাদীদের মতে আন্তর্জাতিক স্তরে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ হয় শক্তি-সাম্যের মাধ্যমে—আবার, উদারনীতিবাদ বা নব্যউদারনীতিবাদীদের মতে এই নিয়ন্ত্রণের মূল মাধ্যম হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংগঠন যা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তৃতীয় সাপেক্ষ উপাদান হচ্ছে স্থায়িত্ব (stability)। কেউ স্থায়িত্ব দেখে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কিছু উপাদানের পরিবর্তনশীলতা হিসেবে—একে বলা হয়েছে 'কাঠামোগত স্থায়িত্ব' (structural stability)। আবার, অনেকে মনে করেছেন, সাময়িক বিশৃঙ্খলার (disturbences) মধ্যেও ভারসাম্যের (Equilibrium) দিকে ফিরে যাবার প্রবণতাই হচ্ছে স্থায়িত্ব—একে বলা হয়েছে 'গতিময় স্থায়িত্ব' (Dynamic Stability)। তবে, একটা দিক পরিষ্কার যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে: ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্ততপক্ষে কিছু সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে বর্তমান থাকতেই হবে। চতুর্থ সাপেক্ষ উপদান হচ্ছে পরিবর্তন (Change)। এটি সাপেক্ষ এবং স্থাবলম্বী উপাদান—দুটি ক্ষেত্রেই পরিবর্তন হতে পরে। প্রশ্ন হচ্ছে, পরিবর্তনের ব্যাপকতা কতখানি হবে, কোন দিকে যাবে, কীরকম হবে—মসৃণ না আকস্মিক, বা এই পরিবর্তন অন্যান্য ব্যবস্থাকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারবে। বিংশ শতকের শেষে ১৯৯১-তে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে দ্বিমেরুব্যবস্থার অবসান ও একক-মেরু (Unipolar) ব্যবস্থার উদ্ভব বা বহুমেরু ব্যবস্থার (Multipolar) প্রবণতা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলি তুলে ধরে। সর্বশেষতঃ, সাপেক্ষ উপাদান হিসেবে জোসেফ ফ্র্যাংকেল উল্লেখ করেন 'ব্যবস্থা-পরিবর্তন' বা System transformation-এর। এক্ষেত্রে 'ব্যবস্থা-পরিবর্তন' বলতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার কথা বলা হয়নি। এক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকায় কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কি না অথবা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা আরও পরস্পর নির্ভরশীল হয়েছে কি না, তা এই গুণগত পারিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারে।

২.৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব

মর্টন কাপলানের (Morton Kaplan) লেখা System and Process in International Politics (১৯৫৭) বইটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের অন্যতম প্রধান বিবৃতি বলে অনেকে মনে করেন। এই বইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে তত্ত্বগতভাবে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা,তাঁর মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একই ধরনের আচরণ বারবার অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই আচরণগুলি একটি বা কয়েকটি বিশেষ ধারায় (Pattern) চিহ্নিত করা যায়। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ব্যবহারিক ধারাগুলি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চতুর্থতঃ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবহারের অন্যান্য ব্যবস্থা, যেমন সামরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য, যোগাযোগ

ও তথ্য ব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত। কাপলান মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরূপ বা মডেল (Model) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং এই মডেলগুলিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরীক্ষা (test) করা যায়। তিনি মনে করতেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অজস্র উপাদান থাকার জন্য এবং বিভিন্ন এককের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন আন্তর্জাতিক এককের আচরণপদ্ধতি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব বিশেষ ধরনের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আচরণ পদ্ধতি ও কোন পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা স্থায়ী হবে, কখন ও কীরকম পরিবর্তন আসবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম হবে। কাপলানের তত্ত্ব তিনটি অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: এক, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সম্ভাব্য আচরণ ব্যাখ্যা করা যায়। দুই, রাষ্ট্রনায়কেরা তথ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল এবং এর ভিত্তিতে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিন, এই তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা ও এর ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুমান করতে পারে।

এই আলোচনার ভিত্তিতে কাপলান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ছটি মডেলের উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে 'শক্তি সাম্যে'র ব্যবস্থা ('Balance of Power' System)। উল্লেখ্য কাপলান শক্তিসাম্য কথাটি উদ্ধৃতি (' ') চিহ্নের মধ্যে রেখেছেন—কারণ তিনি এই ব্যবস্থাটিকে একটি আলংকারিক চরিত্র (metaphoric character) বলে মনে করেছেন। এই ব্যবস্থাটি কার্যকরী কিভাবে হবে সে সম্পর্কে মোট দুটি প্রয়োজনীয় নিয়মের তিনি উল্লেখ করেছেন। এই নিয়মগুলি হচ্ছে: এক, রাষ্ট্রগুলি ক্ষমতা/সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে, কিন্তু যুদ্ধ করার চেয়ে নিজেদের মধ্যে দরদস্তুর (negotiate) করবে। দুই, সামর্থ্য বাড়ানোর চেয়ে যুদ্ধ লিপ্ত হবে। তিন, প্রয়োজনীয় এককে অপসারণ করার চেয়ে, যুদ্ধ বন্ধ করবে। চার, কোন এককের বা যৌথশক্তির নিজস্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রসারে বিরোধিতা করবে। পাঁচ, যে একক সমূহ সমস্ত অতিরাষ্ট্রীয় সংগঠনের সমর্থক হবে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। ছয়, পরাজিত অথবা নিয়ন্ত্রিত যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জাতীয় একক রয়েছে, তাদের শক্তি সাম্যের ব্যবস্থার অংশগ্রহণকারী একক হিসেবে যোগ দিতে সম্মত হবে, অথবা, পুরনো কিছু অপ্রয়োজনীয় এককে প্রয়োজনীয় এককের শ্রেণীভুক্ত করতে রাজী হবে, সমস্ত প্রয়োজনীয় এককে অংশগ্রহণকারী বলে স্বীকার করতে হবে। তাঁর মতে, শক্তি সাম্যের ব্যবস্থার নিম্নোক্ত পরিণতি দেখা যায়: এক, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী (alliance) হবে অত্যন্ত নির্দিষ্ট এবং স্বল্প সময়ের জন্য, এবং এর পরিবর্তন নির্ভর করবে রাষ্ট্রের নিজ নিজ স্বার্থের ওপর। দুই, যুদ্ধ হলেও, তা হবে খুবই স্বল্প সময়ের জন্য। তিন, এই ব্যবস্থায় টিকে থাকার মূল সূত্রই হচ্ছে, কোন রাষ্ট্র যদি খুব শক্তিশালী হবার চেষ্টাও করে, তাকে নজরে রাখতে হবে যে অপর রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি যেন তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে। কাপলান অবশ্য একথা উল্লেখ করতে ভোলেননি যে, শক্তিসাম্যের মূলসূত্র কেউ যদি মানতে অস্বীকার করে, তাহলে এই ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

কাপলানের দ্বিতীয় মডেলটি হচ্ছে শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Loose Bipolar System)। এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব হচ্ছে এই ব্যবস্থায় অতিরাষ্ট্রীয় সংস্থা—যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ন্যাটো (NATO)—সমতা বজায় রাখতে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। শক্তি-সাম্যের ব্যবস্থা থেকে এর মূল পার্থক্যই হচ্ছে অতিরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রকের (Reglator) ভূমিকা পালন করতে গিয়ে শক্তিসাম্যের অন্তর্গত কোন গোষ্ঠীরই পক্ষ না নিয়ে মধ্যস্থতাকারীর (Mediator) ভূমিকা নেয়। ঠিক, এর বিপরীত মডেল হচ্ছে অভেদ্য দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Tight Bipolar System)। এই ব্যবস্থায় গোষ্ঠীবদ্ধ সদস্যরাষ্ট্র বা সার্বজনীন এককেরা হয় গুরুত্ব হারায় বা নিজস্ব অস্তিত্ব লোপ পায়। যেহেতু, এখানে মধ্যস্থতার কোন ভূমিকা নেই, সেহেতু, এই ব্যবস্থা হয়ে পড়ে একান্তই নিষ্ক্রিয়, এবং স্থায়িত্ব হ'য়ে পড়ে অনিশ্চিত। কাপলান এই মডেলটি নিয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা করেননি।

চতুর্থ ও পঞ্চম মডেল—যেগুলো হল যথাক্রমে চিরায়ত ব্যবস্থা (Universal System) এবং স্তরভিত্তিক ব্যবস্থা (Hierarchical System)—নিয়ে কাপলান কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা করেননি। চিরায়ত ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার একটি উপ-ব্যবস্থা (Sub-system) বলে গণ্য করতে হবে। এটা যেমন একক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব বজায় রেখেও একটি মৈত্রীসংস্থা (Confederation) হতে পারে, তেমনি সংঘবদ্ধ এবং একক সার্বজনীন সংস্থাও হতে পারে। স্তরভিত্তিক ব্যবস্থায় নিহিত আছে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা ভৌগোলিক বিভাজনের কার্যভিত্তিক (functional) ব্যবস্থার ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। তুলনামূলকভাবে কাপলান Unit Veto System-এর ওপর বেশি আলোচনা করেছিলেন। এই কল্পনাতীত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বেশ কিছু রাষ্ট্রেরই পারমাণবিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু এদের মধ্যে কোন রাষ্ট্রের-ই অবিশ্বাস্য প্রথম আঘাতের (Incredible first strike) ক্ষমতা নেই। এই ব্যবস্থায় পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকলেও, ব্যাপকভাবে অসামরিক ব্যবস্থাকে (counter-value attack) বা সামরিক ব্যবস্থাকে (counter-force attack) আক্রমণের সম্ভাবনা নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন, পারমাণবিক যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ার (Escalation) সম্ভাবনাই এই মডেলের প্রধান নিয়ন্ত্রক। এই মডেলগুলির বাইরে কাপলান ১৯৬৬ সালে লেখা 'Variantds of Six Models of the Internationl System' প্রবন্ধে আরও কয়েকটি মডেলের উল্লেখ করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে: অত্যন্ত শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থা (Very Loose Bipolar System), দ্যতাঁত (Detente) ব্যবস্থা, অস্থির গোষ্ঠী ব্যবস্থা (Unstable Block System), এবং অসম্পূর্ণ পারমাণবিক বিকীর্ণ ব্যবস্থা (Incomplete Nuclear Diffusion System)। অত্যন্ত শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রই ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব ভূমিকা পালন করবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ঔপনিবেশিকতার অবসানের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সম্ভাব্য ভূমিকার কথা ভেবেই এই মডেলের উল্লেখ। দাঁতাত ব্যবস্থা যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে সহযোগিতার সম্ভাবনা, অস্থির গোষ্ঠী ব্যবস্থার সম্ভাব্য বিশ্লেষণ হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত—অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের পটভূমিকায় দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে কিছু অনুমান। একথা বলাই বাহুল্য, ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানে এই দুটি মডেল এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সর্বশেষ মডেলটি অস্থির গোষ্ঠী ব্যবস্থারই বিস্তৃতি। এর মূল প্রশ্ন হচ্ছে: তুলনামূলকভাবে ছোট রাষ্ট্রগুলি যদি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয় ও বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ছবিটি কীরকম হবে? কাপলানের মতে, এই ব্যবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা হবে, সীমিত, সংঘাতের সম্ভাবনা হবে প্রবল এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই মডেলটি সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যেতে পারে।

মর্টন কাপালানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিকগণকে প্রভাবিত করেছে। যেমন রিচার্ড রোসক্রেন্স (Richard Rosecrance) তাঁর ১৯৬৩ সালে লেখা Action and Reaction in World Politics গ্রন্থে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন: এক, উপাদান (input) —এখানে রাষ্ট্রকে তিনি মূলত ব্যবস্থার সংহতিনাশক (disruptor) বলে মনে করেছেন। দুই—নিয়ন্ত্রক (Regultor)।—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান—যেন কনসার্ট অফ্ ইউরোপ বা জাতিসংঘ বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে এই ভূমিকা পালন করেছে। তিন, পরিবেশ—এটি মূলত বোঝায় কিছু পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে যা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। চার—উপপাদ (outcome)। তাঁর মতে, ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে: এই বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক কীভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে সেটি বিভিন্ন বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা। আবার স্ট্যানলী হফ্ম্যান (Stantley Hoffman) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বিশ্বরাজনীতির বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্কের ধারা নির্ধারণের পদ্ধতি

হিসেবে মনে করেছেন। ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব হচ্ছে তাঁর কাছে একটি 'বৌদ্ধিক নির্মাণ' (Intellectual Construct) যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর যথার্থ বিশ্লেষণ করা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে দেখতে হবে কিভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। মাইকেল সুলিভ্যান (Michael Sullivan) ক্যাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্ব আলোচনা করে, ক্ষমতাকে ব্যবস্থার একটি অন্যতম দিক হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের—যেমন, কার্ল ডয়েশ, ডেভিড সিংগার বা ডিনাজিনসের আলোচনা বিশ্লেষণ করে সুলিভ্যান বলেছেন ক্ষমতাকে ব্যবস্থাতত্ত্বের একটি দিক হিসাবে দেখান যায়—এবং এই হিসেবে ক্ষমতা একটি 'লক্ষ্য' বা 'goal' নয় বা একটি 'পরিস্থিতি' বা 'Situation' এর ব্যাখ্যা নয়। বরং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কার্যসূচি কি হবে, তার আন্দাজ করা যায়। অপরদিকে জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর A General Theory of International Relations (১৯৯৩) বইটিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের মাধ্যমে আলোচনা করতে গিয়ে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছেন—বিদেশনীতি সংক্রান্ত ক্ষুদ্র স্তর (Foreign Policy Microsystem), জাতীয় রাষ্ট্রসংক্রান্ত বৃহৎ ব্যবস্থা (National State Macrosystem) এবং আন্তর্জাতিক অতিবৃহৎ ব্যবস্থা (International Megasystem)। এই মত অনুযায়ী কাপলান প্রথম দুটি ব্যবস্থাকে আলোচনা করেননি—ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামগ্রিক আলোচনা কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে কেনেথ ওয়ল্জ্ (Kenneth Waltz) ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বটির তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন—আবার, একই সাথে 'ব্যবস্থা' শব্দটির মধ্য দিয়ে নয়াবাস্তববাদী তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত Theory of International Poltics গ্রন্থে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক স্তরে 'ব্যবস্থা' শব্দটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: এক অর্থে, এটি হচ্ছে কতগুলি এককের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার পরিণতি—অর্থাৎ 'ব্যবস্থা' গঠিত হয় কতকগুলি এককের মিথষ্ক্রিয়া নিয়ে। অপরদিকে, একটি ব্যবস্থার দুটি স্তর থাকতে পারে—একটিকে বলা যায় কাঠামো এবং এই কাঠামো (Structure) ব্যবস্থা স্তরে কার্যকরী হয় এবং অন্য স্তরে থাকে কতকগুলি একক যারা পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ায় জড়িত। ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে এই দুটি স্তর কাজ করে ও একে অপরকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করা। ওয়ল্জের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের লক্ষ্য হচ্ছে দুটি: এক, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার গতিময়তা নির্ধারণ করা—লক্ষ্য রাখা বিবিধ উপাদানের উপর, যেমন, একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা কতটা স্থায়ী (durable) বা কতটা শান্তিপূর্ণ (Peaceful) তার ওপরে নজর রাখা। দুই, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিময়তা কতটা নির্ধারিত হয়েছে কাঠামো ও বিভিন্ন এককের মধ্যে পারস্পরিক মিথক্রিয়ার মাধ্যমে তা আলোচনা করা। তিনি তাঁর Theory of International Politics (১৯৭৯) গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে রিচার্ড কাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করে, এই তত্ত্বটিকে 'লঘুকৃত' (Reductionist) বলে আখ্যাত করেছেন। এই লঘুকরণকে অতিক্রম করার জন্য এবং আরও বেশি যথাযথ ও বৈষম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা কার জন্য কেনেথ ওয়ল্জ্ তাঁর ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বকে তিনটি অনুমানের ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে কোন নীতির ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে—তাঁর মতে, মূলত নৈরাজ্য ও বিকেন্দ্রকীরণের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন এককের মধ্যে আপাত পার্থক্য থাকলেও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা স্তরভিত্তিক (Hierarchical) নয়—বরং, সমতার ভিত্তিতেই এই বিভিন্ন একক পরস্পরের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় জড়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু সমস্ত সার্বভৌম এককই সমতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, সেহেতু সমস্ত এককই মোটামুটি একই ধরনের কাজ করে। যেমন, সমস্ত সার্বভৌম এককই নিজ নিজ নিরাপত্তা রক্ষা করাকেই অন্যতম প্রধান কাজ বলে মনে করে। সর্বশেষতঃ, ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে সামর্থের যথেষ্ট পার্থক্য (distribution of capabilities) আছে—আর সামর্থ্যের পার্থক্য একক স্তরে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হলেও, সেটি কিন্তু প্রধানত

উৎসারিত হয় কাঠামোর স্তর থেকে। এই তিনটি উপাদানের যে কোন একটিতে পরিবর্তন কিন্তু ব্যবস্থার কাঠামোয় পরিবর্তন আনবে। ওয়ল্‌জের মতে কাঠামোর প্রথম উপাদান—নৈরাজ্য ও বিকেন্দ্রীকরণ—মোটামুটি স্থায়ী উপাদান। দ্বিতীয় উপাদানটি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যবস্থা যেহেতু নৈরাজ্যভিত্তিক, সেহেতু সব এককই এক ধরনের আচরণ করে থাকে। কিন্তু তৃতীয় উপাদানটি যেহেতু সবচেয়ে বেশি পরিবর্তনশীল, সেহেতু এই এই উপাদনটিই—সামর্থ্যের বিভিন্নতাই—সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই আলোচনার ভিত্তিতে কেনেথ ওয়ল্‌ল্‌জ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন: এক, দ্বিমেরুকরণ অনিশ্চয়তাকে অনেক বেশি দূরে সরিয়ে রাখত সক্ষম—ফলে, যে কোন বিকল্প কাঠামো থেকে এটি অনেক বেশি স্থায়ী। দুই, বিংশ শতাব্দীতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবার চেয়ে, কমে যাবার দিকেই প্রবণতা বেশি রয়েছে। তিন, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অনেক বেশি স্থায়িত্ব আনতে পারে। নিঃসন্দেহে এই তিনটি বক্তব্যই যথেষ্ট সমালোচনা আহ্বান করে আনতে পারে।

২.৬ ব্যবস্থামূলক তত্ত্বের সমালোচনা

এই তত্ত্বটির, বিশেষতঃ কাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের, তীব্র সমালোচন করেছেন কেনেথ ওয়ল্‌জ। প্রথমতঃ, কাপলানের তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বটিতে যে এমন কোন ধারণা (Concepts) ব্যবহার করেননি, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের জটিল কাঠামোর (Framework) অন্তর্ভুক্ত করবে। আসলে, কাপলান তার আলোচনায় কতগুলি শ্রেণীবিন্যাস করেছেন—কিন্তু তত্ত্বনির্মাণ করেননি। প্রকৃপক্ষে তিনি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি পরিবেশকে ব্যাখ্যা করেননি, পরিবেশ ও ব্যবস্থা দুয়ের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ করেননি—অথবা, অন্যান্য ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগী বা প্রতিযোগী হবে, তাও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেননি।

দ্বিতীয়তঃ, কাপলান তাঁর লেখায় বারবার কতকগুলি অপরিহার্য নিয়ম বা 'Essential Rules'-এর উল্লেখ করেছেন। কোন একক যদি এই 'অপরিহার্য নিয়ম' ক্রমান্বয়ে অনুসরণ করে চলে, তাহলে ব্যবস্থার পরিবর্তন (Transformation) কী স্থগিত হয়ে থাকবে? কাপলান নিঃসন্দেহে একথা বলেছেন যে পারিপার্শ্বিক শর্তবালীর যখন পরিবর্তন ঘটবে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন এককের ব্যবহার ও কার্যাবলীতে পরিবর্তন ঘটবে—আর, তার সাথেই ঘটবে সমগ্র ব্যবস্থার পরিবর্তন। কিন্তু কিভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ঘটবে এই পরিবর্তন, তা নিয়ে কিন্তু কাপলান নীরব থেকেছেন।

তৃতীয়তঃ, কাপলানের মতে প্রতিটি ব্যবস্থার একটি নিজস্ব সত্তা (identity) আছে এবং বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সত্তার পরিবর্তন ঘটে। ফলে এই সত্তার পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন উল্লেখ ও স্বীকার করতে হবে, তেমনি দেখতে হবে এই পরিবর্তনের জন্য কোন কোন উপাদান (variable) দায়ী। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু কাপলান এই 'সত্তা'র বৈশিষ্ট্য কী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন? উত্তর নেতিবাচক হতে বাধ্য—কারণ, কাপলান যে বিভিন্ন মডেল উল্লেখ করেছেন, সেগুলি শুধুমাত্র কতগুলি উপাদানের সমষ্টিমাত্র যা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বুঝতে সাহায্য করে মাত্র। চতুর্থতঃ, কাপলান এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ককেই ব্যবস্থাস্তরের মিথষ্ক্রিয়া বলে মনে করেছেন। পঞ্চমতঃ, কাপলান যখন শক্তি সাম্যের কথা আলোচনা করেছেন, তখন তিনি পাঁচটি রাষ্ট্রকে শক্তিসম্যের ব্যবস্থায় অপরিহার্য জাতীয় একক (essential national action) বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একথা উল্লেখ করতে সম্ভবত ভুলে গেছেন যে কোন স্বাবলম্বী ব্যবস্থায় (Self-help system)—যেখানে দুই বা ততোধিক একক থাকবে—সেখানেই শক্তিসাম্যের ব্যবস্থা তৈরি হবে।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কাপলানের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের সমালোচনা করতে গিয়ে এই তত্ত্বটির মধ্যে রাজনৈতিক বাস্তববাদের ছায়া দেখতে পেয়েছেন। এই মত অনুযায়ী আপাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আলোচনা করার আড়লে, আসলে কাপলান রাজনৈতিক বাস্তববাদের প্রতিই পরোক্ষ সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে, রবার্ট জ্যাকসন ও জর্জ সোরেনসেন মনে করেছেন, কাপলানের তত্ত্বটি একদিকে বর্ণনাত্মক (descriptive) এবং অপরদিকে আদর্শগত (Normative)। কাপলানের শক্তিসাম্যের তত্ত্ব একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কীভাবে আচরণ করে তার বর্ণনা করে, তেমনি এই বিশেষ ব্যবস্থায় কীভাবে আচরণ করা উচিত, সে সম্পর্কে কতকগুলি নীতি নির্দেশ করে। সমস্যা হচ্ছে, একটি 'ঘটনা' (fact) একটি 'নীতি' (norm) নয়—আর ঘটনা ও নীতিকে এক করে ফেললে এক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এই দুই লেখকই মনে করেন কাপলান ইতিহাসকে ব্যবহারবাদী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, কাপলান ইতিহাসকে দেখেছিলেন একটি 'পরীক্ষাগার' (laboratory) হিসেবে। সমস্যা হচ্ছে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে যথার্থভাবে নির্দেশ করা, ব্যাখ্যা করা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কেউ কি বলতে পেরেছিল ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান কবে হবে বা কীভাবে হবে? ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা এক জটিল কাজ।

ওয়ালটজ্ যেমন কাপলানের তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন, তেমনি ওয়ালটজের তত্ত্বও কিন্তু সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। মূলত এই তত্ত্বটির চারটি সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন এককের স্বার্থ ও পছন্দের (Interest-based preferences) চরিত্র ও উৎস সবসময়ে সঠিকভবে নির্দিষ্ট করা যায় না। কারণ, এই উপাদানগুলি সবসময়ে ব্যবস্থার কাঠামো থেকে সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি অথবা আদর্শগত দিকও বিভিন্ন সময়ে স্বার্থ ও পছন্দের জন্ম দেয়। স্বাভাবিক ভবে, এই তত্ত্বটি স্বার্থ ও পছন্দের পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিক নির্দেশ করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ওয়ল্জ্ ব্যবস্থার যে তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, সেটিও এতই সাধারণ যে এরা ব্যবস্থার পরিবর্তন (system change) সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। তৃতীয়তঃ, ওয়ল্জ্ বিংশ শতাব্দীতে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ওপর গুরুত্ব না দেওয়া বা পারমাণবিক শক্তির বিধ্বংসী ক্ষমতাকে যে ভাবে আলোচনা করেছেন, তা মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। চতুর্থতঃ, ওয়ল্জ্ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সামর্থ্যের বন্টন বা বিভিন্নতাকেই একমাত্র পরিবর্তনের সূত্র বলে মনে করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সামর্থ্যের বর্ণনা বা বিভিন্নতা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু, এই উপপাদ ছাড়াও অন্যান্য সম্ভাবনাও তো—যেমন, একে অপরকে পরিহার করে চলা, বা নিজ নিজ প্রভাবের অঞ্চল সৃষ্টি করা বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া—বাস্তবায়িত হতে পারত। হয়নি কেন? এর জন্য দরকার এই দুই দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির যথার্থ আলোচনা। অর্থাৎ, সামর্থ্যের ভিন্নতাকে একটি মাত্র কাঠামোগত কারণ হিসেবে দেখলে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জটিলতার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ হবে না। সবশেষে, বলা দরকার, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বকে উন্নত করার প্রয়াস পেলেও, তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে উঠেছে অনেকটাই বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয় বা Eclectic এবং তাঁর অঙ্কের প্রয়োগ আলোচনাটিকে করে তুলেছে অনেকটাই বিমূর্ত (Abstract)।

২.৬ উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, মর্টন কাপলান ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বটিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছেন—কিন্তু এই তত্ত্বটি কতগুলো সমস্যা তুলে ধরেছে যার সমাধান কিছুটা হলেও অধরাই

রয়ে গেছে। কেনেথ ওয়ালটজের তত্ত্ব নিঃসন্দেহে নতুন গবেষণার দিকে নির্দেশ করেছে, কিন্তু এই তত্ত্বও স্বাভাবিকভাবে সমালোচনার উর্দ্ধে যায়নি। কিন্তু ব্যবস্থজ্ঞাপক তত্ত্ব নিঃসন্দেহে কতগুলি নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এক, বহুমেরুব্যবস্থা না দ্বিমেরু ব্যবস্থা কোনটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনবে? ওয়ালটজ যদি দ্বিমেরুব্যবস্থার সমর্থক হন, কাপলান যুক্তি দেবেন বহুমুখীব্যবস্থার পক্ষে। প্রশ্ন হল: সোভিয়েতের অবসানের পরে তথাকথিত একমেরু ব্যবস্থার (Unipolar System) ব্যাখ্যা কি এই তত্ত্বের মাধ্যমে সম্ভব? দুই, কেনেথ ওয়লজ্ ১৯৫৯ সালে Man, State and War গ্রন্থে তিনটে রূপক (Three images)-এর বক্তব্য তুলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্তর বিশ্লেষণের (Level of Analysis) সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। মানবপ্রকৃতি ও তার আচরণ (Image I), রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো (Image II) এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Image III)—এই তিনটির মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ? ওয়লজ্ অবশ্যই শেষের ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে জে. ডেভিড সিঙ্গার (J. David Singer) তাঁর লেখা 'The Level of Analysis: Problem in International Relation' প্রবন্ধে একই সমস্যা তুলে ধরেছিলেন। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা না জাতীয় রাষ্ট্র স্তরভিত্তিক আলোচনা কোনটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? ওয়ালটজ্, কাপলান ও সিঙ্গারের অতীতের আলোচনা ও বিতর্ক আজ কিছু প্রশ্ন নতুন করে তুলে ধরেছে: প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতগুলি স্তর এবং কোন স্তরের আলোচনা, বেশি গুরুত্বপূর্ণ? দ্বিতীয়তঃ, কোন মানদণ্ডের ওপর এই স্তরগুলি নির্ধারিত হবে ও কীভাবে এক স্তরকে অপর স্তর থেকে পৃথক করা হবে? তৃতীয়তঃ, এই স্তরভিত্তিক সমস্যার যদি সত্যিই সমাধান হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কি ভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি সর্বস্তরভিত্তিক (holistic) আলোচনা সম্ভব হবে? এই বিতর্ক আবারও শুরু হয়েছে। ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও স্তর-বিশ্লেষণের সমস্যা আলোচনার পাশাপাশি আরও একটি আলোচনার নতুন দিগন্ত উঠে এসেছে। সেটি হচ্ছে: জটিলতা তত্ত্ব (Complexity Theory) আলোচনার মধ্য দিয়ে কি ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের সমস্যার সমাধান সম্ভব? এই তত্ত্বের চারটে দিক—স্ব-সংগঠন (self organization), অ-সমান্তরাল (non-linear) অগ্রসরমানতা, উন্মুক্ততা (openness) এবং সম-বিবর্তন (co-evolution)—কি ব্যবস্থাজ্ঞাপক আলেচনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে সক্ষম হবে? আমরা উপসংহারে টানি হেইনজ্ ইউলাই-এর (Heinz Eutau) একটি উক্তি দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, অভিজ্ঞতাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গড়ে ওঠে ধীরে, নীরবে এবং টুকরো টুকরো করে সংগৃহীত তত্ত্ব, পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে এই প্রচেষ্টার মধ্যে।

২.৮ সারাংশ

এই অধ্যায় প্রথমে আমরা 'ব্যবস্থা', যে সংজ্ঞাগুলি আছে, সেগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি। এরপরে এই তত্ত্বের মৌলিক নীতি, ধারণা ও বৈশিষ্ট্যগুলির বিস্তৃত আলেচনা করা হয়েছে। এরপরই আমরা এই তত্ত্বটি নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞের চিন্তাধারা বিধৃত করেছি। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রধানত মর্টন কাপলানের চিন্তাধারার ওপরে—আর, তারই সাথে যুক্ত হয়েছে কেনেথ ওয়ালজের বক্তব্য। এই আলোচনার অনুসৃত হয়েছে এই তত্ত্বগুলির সমালোচনার মাধ্যমে। আর, সবশেষে এই তত্ত্বটি সাম্প্রতিককালে যে প্রশ্নগুলি তুলে ধরেছে তার কয়েকটি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

২.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. জে. গুডম্যান বিশ্লেষিত 'ব্যবস্থা'-র তিনটি বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন।
২. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।
৩. মর্টন কাপলান নির্ধারিত 'ব্যবস্থা'র বিভিন্ন ধরনের মডেল চিহ্নিত করুন ও তাদের বিশ্লেষণ করুন।
৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের একটি পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের বিভিন্ন ধারণাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. মর্টন কাপলান বর্ণিত "শক্তি সাম্যে"র বিভিন্ন ধারা চিহ্নিত করুন।
৩. কেনেথ ওয়ললজের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ধারণাটি বিচার করুন।
৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ব্যবস্থাজ্ঞাপক তত্ত্বের অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. 'ব্যবস্থা একটি বর্ণনা' বলতে আপনি কি বোঝেন?
২. 'ব্যবস্থা একটি ব্যাখ্যা' এবং 'ব্যবস্থা একটি পদ্ধতি'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
৩. নির্ভরশীল ও স্বালম্বী উপাদানের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নিরূপণ করবেন?
৪. Unit Veto System বলতে কী বোঝায়?
৫. কেনেথ ওয়ললজ কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তিনটি রূপক বর্ণনা করেছেন?

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bandyopadhyay, Jayantanuja, *General Theory of International Relations* (Allied Pubishers), pp. 39-78 and pp. 218-221.
2. Booth. Ken and Steve Smith eds. *International Relations Theory Today*, (Polity Press). chapter 8 and 11.
3. Frankel, Joseph, *Contemporary International Relations Theory and the Behaviour of States* (Oxford University Press), pp. 33-41.
4. Goodman, Jay S. 'The Concept of "System" in *International Relations Theory Today*. Background vol. 8. no. 4. February 1965. 257-268.
5. Hoffman, Stanley ed. *Contemporary Theory in International Relations* (Prentice Hall), pp. 104-123.
6. Rosenau, James N ed. *International Poltics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory* (The Free Press), chapter 27.

একক ৩ ☐ মার্কসীয় ও অন্যান্য র‍্যাডিক্যাল ও নয়া-র‍্যাডকাল তত্ত্বসমূহ

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : মার্কস ও লেনিনের বক্তব্য
৩.৪ মার্ক্সবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
৩.৫ বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব (World System Theory)
৩.৬ অনুসন্ধিৎসামূলক তত্ত্ব (Critical Theory)
৩.৭ নয়া-মার্কসীয় তত্ত্ব (Neo-Marxist Theory)
৩.৮ উপসংহার
৩.৯ সারাংশ
৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
৩.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কসীয় ও নয়া-মার্কসীয় চিন্তাধারাগুলো সহজবোধ্য ভাষায় তুলে ধরাই এই এককের মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া, ১৯৯০-এর দশকের পরে নব্য মার্কসীয় ধারা কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছে, সেটি তুলে ধরারও একটি প্রয়াস করা হয়েছে এই এককে।

৩.২ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব আলোচনায় মার্কসীয় ধারা এসে পৌঁছেছে কিছুটা দেরিতে—যদিও এই তত্ত্বটির মূলসূত্র তৈরি হয়েছিল ১৯১৬ সাল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলেছে। বিশ শতকের গণতন্ত্র ও সমাজবাদের সংঘাত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিমেরু বিশিষ্ট পৃথিবীর সূচনা এবং ক্ষমতার রাজনীতির ঢক্কা-নিনাদ মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও গুরুত্বকে অনেকখানি আবৃত করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পর থেকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব উত্তর-দক্ষিণের (North-South) ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, দ্রুত রাষ্ট্র-গঠনের (State-building) প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট ও অনুন্নত দেশগুলির ওপর তার প্রভাব, বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় চিন্তাধারাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনা ক্ষেত্রে একটি অন্যতম ঐতিহ্য হিসেবে নিয়ে আসে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে দ্বি-মেরুকরণের ভূ-রাজনীতির গুরুত্বহীনতা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নির্দেশিকা পালনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি,

মার্কসীয় তত্ত্বকে শুধুমাত্র আতর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত তত্ত্বগুলোকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মুখোমুখি করেছে তাই নয়, এই তত্ত্বটি সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনার পথ প্রশস্ত করেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসীয়ধারার বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে তা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমেই আমরা দেখব মার্কস ও লেনিন আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিভাবে আলোচনা করেছিলেন। এর ভিত্তিতে, আমরা চেষ্টা করব মার্কসবাদের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কী কী তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এরপর আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব সেই তত্ত্বগুলি যেগুলি মার্কসীয় চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হচ্ছে: বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব এবং সমালোচনামূলক তত্ত্ব। সবশেষে, আমরা দেখব নব্য মার্কসবাদীরা বিশ শতকের শেষভাগে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

৩.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: মার্কস ও লেনিনের বক্তব্য

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) নিজে কখনও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেননি। এ কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তা উল্লেখও করেছিলেন, কিন্তু এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিয়ে তিনি নীরবই ছিলেন। Manifesto of the Communist Party (১৮৪৮) নামক ছোট পুস্তিকাতে তিনি এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৮৯৫) বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক বাজারকে শোষণের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই উৎপাদন ব্যবস্থা ওভোগ্যপণ্যকে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দিতে সক্ষম হবে বা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার Capital-এর প্রথম খণ্ডে মার্কস আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের উল্লেখ করেছেন। এই শ্রমবিভাজনের ভিত্তি গড়েই উঠেছে আধুনিক শিল্পের কেন্দ্রস্থলগুলির সুবিধার জন্য—পৃথিবীর একটি অংশ কাঁচামাল রপ্তানি করবে এই শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। আর এই শিল্পোন্নত দেশগুলি ব্যস্ত থাকবে শিল্পায়নের কার্যসূচিতে। (Capital vol. 1, Moscow: Progress Publihers, 1977 Reprint, p. 425)। কিন্তু মার্কস কখনই বিশদভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হননি।

কিন্তু মার্কসের এই বিক্ষিপ্ত মন্তব্যগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পরবর্তীকালে লেনিন বা বুখারিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব। মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব অনেকখানিই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদের ধারণার মধ্যে। এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ধনতন্ত্রের বিকাশ আন্তর্জাতিক স্তরে তৈরি করেছে এক অসম উন্নয়নের—আর, এই অসম উন্নয়নই নির্ধারণ করেছে উন্নত ও অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে। ভ্লাদিমির উলিচ উলিয়ানভ লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪) লেখা, এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশিত Imperialism: The Highest Stage of Capialism নামক ছোট একটি পুস্তিকাতে মার্কসীয় সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বটি বিবৃত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ খুঁজতে গিয়ে লেনিন সাম্রাজ্যবাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এক, এই সময়ে পণ্য রপ্তানির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, মূলধনের রপ্তানি। দুই, মুলধন ও উৎপাদন কেন্দ্রীভূত ও উন্নত হয়ে ওঠার ফলে সৃষ্টি হয় একচেটিয়া কারবারের। তিন, ব্যাংক মূলধন ও শিল্পজাত মূলধন একত্রিত হয়ে যে Finance Capital তৈরি

হয়, তা তৈরি করে একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীতন্ত্র। চার, ধনতান্ত্রিকদের নিয়ে যে আন্তর্জাতিক একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সারা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। পাঁচ, এই বিভাগ পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আগামীদিনের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের বীজ বপন করা হয়। ১৯১৫ সালে নিকোলাই বুখারিনের (১৮৮৮-১৯৩৯) লেখা Imperialism and World Eonomy বইতে প্রায় অনুরূপ যুক্তিই দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মতে, কাঁচামাল সংগ্রহ করা, উৎপাদিত দ্রব্যের দূরাঞ্চলে বিক্রি করা এবং মূলধন বিনিয়োগের মধ্যেই নিহিত ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিকাশের সূত্র। আর, এই সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ফলে তৈরি হল এক আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন যার একদিকে সৃষ্টি হল একটি সুদৃঢ়, সুসংহত উন্নত অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী—আর, অপরদিকে রয়ে গেল মূলত কৃষিভিত্তিক বা আধাভূমিভিত্তিক অনুন্নত কিছু রাষ্ট্র। তৈরি হল উন্নত-অনুন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে এক মেরুকরণের এবং সৃষ্টি হল বিশ্বব্যাপী অসম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার।

৩.৪ মার্কসবাদ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন হচ্ছে: মার্কসবাদের প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি? প্রথমতঃ, বাস্তববাদ বা উদারনীতিবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের স্তরটি (Level of analysis) সূচিত হয় রাষ্ট্রীয় স্তর থেকে। কিন্তু মার্কসবাদের ক্ষেত্রে এই স্তরটি সূচিত হয় গঠনতন্ত্র বা Systemic স্তর থেকে। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তববাদীগণের আলোচনার কেন্দ্রস্থলে আছে রাষ্ট্র। উদারনীতিবাদীগণ দৃষ্টি দেন রাষ্ট্র, অ-রাষ্ট্রীয়, উপরাষ্ট্রীয় এবং আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় সংস্থার পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্ব দেয় ধনতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা, উৎপাদনের সম্পর্ক এবং শ্রেণী সম্পর্কের ওপরে। তৃতীয়তঃ, বাস্তববাদের ভিত্তি হচ্ছে বিলিয়ার্ড বল মডেল যেখানে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ধারিত হয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Action-Reaction) ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। উদারনীতিবাদের ভিত্তি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মাকড়সার জালের (cobweb model) মত এক ব্যবস্থার যেখানে প্রতিটি একককই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অপরদিকে মার্কসীয় ধারা বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে এক Octopus মডেলের সন্ধান পায় যেখানে শক্তিশালী গোষ্ঠী বা সংগঠন দুর্বল রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীকে নিজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দিতে চায়না। চতুর্থতঃ, বাস্তববাদ যেখানে রাষ্ট্রকে একটি অন্যতম একক হিসেবে দেখে, মার্কসবাদ সেখানে রাষ্ট্রকে ধনী শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে। পঞ্চমতঃ, মার্কসীয় ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিময়তা নির্ভর করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিভাবে নিজস্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে তার বিশ্লেষণের ওপর। এটি বাস্তববাদ ও উদারনীতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন। বাস্তববাদীদের মতে রাষ্ট্র একটি যুক্তিবাদী সংস্থা যার মূল উদ্দেশ্যই হল জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। আর, উদারনীতিবাদীগণ মনে করেন সন্ধি, দরকষাকষি এবং আপসের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করা। ষষ্ঠতঃ, বাস্তববাদীদের কছে জাতীয় নিরাপত্তাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। উদারনীতিবাদের কাছে বহুমুখী বিষয় প্রধান গুরুত্ব পায়। কিন্তু মার্কসীয় ধারায় মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক কার্যকরণসমূহ। সপ্তমতঃ, বাস্তববাদীদের কাছে বিদেশনীতি পরিচালিত হয় বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। উদারনীতিবাদীদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী চিন্তাভাবনার মধ্যে। অষ্টমতঃ, বাস্তববাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালিত হয় এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত নিয়মে। উদারনীতিবাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিবর্তনশীলতার মধ্যে দিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু মার্কসবাদীগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্থায়ী ও চিরায়ত ছাঁচে অগ্রসর হয়। একমাত্র বৈপ্লবিক পদ্ধতিই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। নবমতঃ, বাস্তববাদের কাছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এক চিরায়ত সংঘাতের ক্ষেত্র। উদারনীতিবাদের সমর্থকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে দেখেছেন একটি সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে, কিন্তু মার্কসবাদীরা আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে দেখতে চেয়েছেন শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে। সর্বশেষতঃ, বাস্তববাদ বিশ্বাস করে এক অপরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়। উদারনীতিবাদ আস্থা রাখে প্রগতিশীল ক্রমবিবর্তনের পদ্ধতিতে। কিন্তু মার্কসবাদ দৃষ্টি রাখে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক সমতাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার দিকে।

৩.৫ বিশ্ব-ব্যবস্থা সম্পর্কিত তত্ত্ব

মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনা করলে একটি নতুন ধারণা গড়ে ওঠে। তা হচ্ছে: বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে—বিশেষত উন্নত ও উন্নয়নশীল বা অনুন্নত রাষ্ট্রের সম্পর্কের পেছনে নিহিত আছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতির ঘাতপ্রতিঘাতের এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই তত্ত্বটির মূল জিজ্ঞাসাই হল: অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি ও উন্নয়নের ধারা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের মাধ্যমে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিল? বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের মূল প্রবক্তা ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন (Immanuel Wallerstein) এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। তিনটি খণ্ডে লেখা The Modern World System বইটিতে এই তত্ত্বটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৭৪, ১৯৮০ এবং ১৯৮৯ সালে।

তাঁর মতে, এই তত্ত্বটির বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে নিম্নোক্তরূপ: এক, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে একটি মাত্র একক (Unit)-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি মাত্র শ্রমবিভাজন এবং একাধিক সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। দুই, তিনি মূলত, দুটি বিশ্বব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন—একটি হচ্ছে বিশ্বসাম্রাজ্য (World Empires), এবং অপরটি হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতি (World Economies)। চীন, মিশর, রোম প্রমুখ প্রাক্ আধুনিক সভ্যতাসমূহ বিশ্ব সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যদিকে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রমুখ ইউরোপীয় শক্তিসমূহকে তিনি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মূল নিয়ন্ত্রক বলে উল্লেখ করেছেন। তিন, ষোড়শ শতকে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তনের ফলে এক ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থা প্রথমে ইউরোপের সঙ্গে লাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক স্থাপন করলেও, তা পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে। চার, এই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাকে ওয়লারস্টাইন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন—বিশ্বব্যাপী বিস্তারের ফলে পৃথিবী বিভক্ত হয়েছিল তিনটি ভাগে। এগুলোকে বলা হয় 'কেন্দ্র' (core), 'প্রত্যন্ত' (Periphery) এবং 'আধা-প্রত্যন্ত' (Semi-peripehery)। 'কেন্দ্র' বলতে বোঝায় অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলিকে; 'প্রত্যন্ত' বলতে বোঝায় অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে—আর, 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্রগুলির অবস্থান এই দুই ব্যবস্থার মাঝামাঝি।

ওয়ালারস্টাইন সমগ্র পৃথিবীকে একটি মাত্র একক (unit) হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর মতে সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিবর্তন ব্যাখ্যা করা যাবে বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে এই রাষ্ট্রগুলির মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এটিকে 'বিশ্বব্যবস্থা' বলা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এটি যে কোন রাজনৈতিক এককের চেয়ে বৃহত্তর। আবার, এটিকে 'ব্যবস্থা' বলা হয়েছে তার কারণ এই ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ একে অপরের সঙ্গে কার্যকরণ সূত্রে আবদ্ধ এবং একটির পরিবর্তন অপর অংশের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। ওয়ালারস্টাইন দেখিয়েছেন ঐতিহাসিকভাবে এই বিশ্বব্যস্থার

কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। প্রথম পর্যায়টি—যেটি 'ক্ষুদ্রব্যবস্থা' (mini-system) বলে উল্লেখিত হয়েছে—সেটির বিস্তৃতি ছিল খ্রীষ্টজন্মের দশহাজার বছর আগে অবধি। আর, এই সময়ে শ্রমবিভাজন ছিল একটি গোষ্ঠীসংস্কৃতির মধ্যে আবদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হত কেন্দ্রের মাধ্যমে। কেন্দ্রই বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে কর আদায় করত এবং বিনিময়ে নিরাপত্তা দিত এই গোষ্ঠীগুলোকে। ১০,০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫,০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এই ব্যবস্থা উল্লিখিত হয়েছে 'বিশ্ব-সাম্রাজ্য' (World Empire) নামে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত যে ব্যবস্থাটি অব্যাহত আছে তাকে ওয়ালারস্টাইন অভিহিত করেছেন বিশ্ব অর্থনীতির যুগ (World Economy) বলে। এই সময়ের মূল বৈশিষ্ট্য হল: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান পরিসর, মূলধনের সঞ্চয়ীকরণ (accumulation) এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও অঞ্চলের মধ্যে মেরুকরণই জন্ম দেয় 'কেন্দ্র', 'প্রত্যন্ত' এবং 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্র ব্যবস্থার। এখানে উল্লেখ্য, ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধিতা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ওয়ালারস্টাইন দ্বি-মেরু বিশিষ্ট পৃথিবীকে খুঁজে পাননি। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে বিশ্ব-ব্যবস্থার বাইরে যাওয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় সূচনা করে না। বরং এই পতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে অন্যান্য উন্নত আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক সংঘাত ও প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবে।

বিশ্বব্যবস্থার এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। এক, ওয়ালারস্টাইনের এই তত্ত্বটির অন্যতম প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই তত্ত্বটি দুটি বা ততোধিক রষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কটি দেখতে চান আন্তর্জাতিক স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সেই উন্নয়নের পরিণতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক স্তরবিন্যাসের আঙ্গিকে। কিন্তু যেটা উল্লিখিত হয়নি বা গৌণ থেকে গেছে তা হল একটি দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভর করে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীসম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক শ্রেণীস্বরূপের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। দুই, এন্টনী ব্রিউয়ারের (Anthony Brewer) মত অনুযায়ী ধনতন্ত্রের বিকাশ ও গতিময়তার মধ্যে একটি স্বতঃবিরোধিতা আছে—যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংকট এবং পরিবর্তন দুয়েরই সূচনা করতে পারে, কিন্তু এই তত্ত্বটি ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিবর্তনে এই স্বতঃবিরোধিতাকে উল্লেখ করেনি। তিন, এই তত্ত্বটি যখন কেন্দ্র-প্রত্যন্ত বা আধা-প্রত্যন্ত সম্পর্ক আলোচনা করেছে, তখন এই সম্পর্কও যে পরিবর্তনশীল হতে পারে, তার কোন ইঙ্গিত করেনি। 'প্রত্যন্ত' অঞ্চল যদি 'আধা-প্রত্যন্ত' অঞ্চলে পরিণত হয়, তাহলে এই নতুন 'আধা-প্রত্যন্ত' অঞ্চলে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ ও শোষণের পদ্ধতি কীরকম হবে, তা নিয়ে আলেচনা এই তত্ত্বটিতে অনুপস্থিত। চার, এই তত্ত্বটি উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে, তার ওপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেমন, চীন-ভারত-ব্রাজিল-রাশিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিত ভাবে BRICS নামে একটি মূলত অর্থনীতিভিত্তিক আন্তঃআঞ্চলিক (Transregional) সংগঠন গড়ে তুলেছে। আপাতদৃষ্টিতে, এই দেশগুলিকে 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়। বিশ্বব্যবস্থার তত্ত্ব অনুযায়ী কী হবে এই দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক? অথবা, এই তথাকথিত 'আধা-প্রত্যন্ত' রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ ভাবে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে দরকষাকষি (bargaining) করতে পারে? নাকি উন্নত দেশগুলির কাছে শেষপর্য্যন্ত অবনত হয়েই থাকবে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতার এই সম্ভাবনা অথবা ব্যাখ্যা কিন্তু এই তত্ত্বটির থেকে প্রত্যাশা করা যায় না।

এই তত্ত্বটির আলোচনা শেষ করা যায় দুটি বক্তব্য উল্লেখ করে। প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি ধনতন্ত্রের বিকাশের

মাধ্যমে কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, তার একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছে। দ্বিতীয়ত, ওয়ালারস্টাইন মনে করছেন, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা সম্ভবত অন্তিম পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে। কিন্তু এর বিকল্প কী হবে সে সম্পর্কে চূড়ান্ত বলার সময় এখনও আসেনি।

৩.৬ অনুসন্ধিৎসামূলক তত্ত্ব (Critical Theory)

মার্কসীয় চিন্তাভাবনাকে বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে থাকে। এই তত্ত্বটির মূল উৎস প্রোথিত আছে ইতালীয় মার্কসবাদী এন্টনিও গ্রাম্‌সির (১৮৯১-১৯৩৭) দৃষ্টিভঙ্গী এবং ফ্রাংকফুর্ট গোষ্ঠীর (Frankfrurt School) চিন্তাভাবনার মধ্যে। গ্রামসির মতে রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যেই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বকীয় ক্ষমতার প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কার্যকরী করতে রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিশালী গোষ্ঠী অন্যান্য দুর্বলতর গোষ্ঠী স্বার্থগুলির সঙ্গে নিজস্ব স্বার্থের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিবিধ স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয়ের ফলে একেবারে 'নতুন, অনুপম এবং ঐতিহাসিকভাবে মূর্ত-সমন্বয়' ('new, unique and historically concrete combinations') সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ সামাজিক কাঠামোয় যে কোন পরিবর্তনই হোক না কেন তার প্রতিফলন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও হতে বাধ্য। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় একটি দেশের আভ্যন্তরীণ নীতি কি বিদেশনীতিকে বা একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতি সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন নীতিকে প্রভাবিত করে? গ্রামসির মতে, এক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি এবং দুর্বলশক্তির মধ্যে পার্থক্য করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, শক্তিশালী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে কিছুটা হলেও তুলনামূলকভবে অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা (autonomy) ভোগ করে। যে প্রশ্নটি এখানে অপরিহার্য তা হচ্ছে: ক্ষমতাবান গোষ্ঠী কিভাবে, অথবা শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে, অন্যান্য ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোকে নিজস্ব স্বার্থের বাহক করে তোলে? গ্রামসি এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে 'সম্মতিভিত্তিক কর্তৃত্ব' (hegemony)-এর ধারণাটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, শক্তিশালী গোষ্ঠী নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাক্ষরতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেনা—এরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে শাসকশ্রেণীর নিজস্ব নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জনগণের 'স্বতঃস্ফূর্ত' ('spontaneous') মতকে নিজের সমর্থনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে।

অন্যদিকে, ফ্রাংকফুর্ট গোষ্ঠী—যার সূচনা ১৯২০/১৯৩০-এর দশকে—মূলত মার্কসীয় অর্থনীতির ওপর খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। পরিবর্তে, এই গোষ্ঠী গুরুত্ব দিয়েছিল সংস্কৃতি ও 'সাংস্কৃতিক শিল্প' (Culture Industry), আমলাতন্ত্র, কর্তৃত্ববাদ ইত্যাদির ওপর। এক কথায় বলা চলে, এই গোষ্ঠীর মূল আলোচ্য বিষয় ছিল উপরী কাঠামোর (Superstructure) ওপর। কিন্তু সমালোচনামূলক তত্ত্বের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জ্ঞান তত্ত্বসমূহের (Theories of Knowledge) পর্যালোচনা, মুক্তির (Emancipation) অনুসন্ধান এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার নৈতিক ভিত্তির অনুসন্ধান। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা জুরগেন হেবরমাসের (১৯২৯-) মতে মুক্তি আসতে পারে একমাত্র যোগাযোগের (communication) মাধ্যমে এবং মৌলিক গণতন্ত্র (Radical Democracy) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই একমাত্র 'মুক্তি'র সম্ভবনা উন্মুক্ত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে মূলত দু'জন বিশেষজ্ঞের লেখার মাধ্যমে। এরা হলেন রবার্ট কক্স (Robert Cox) এবং এনড্রু লিংকলেটার (Andrew Linklater)। প্রথমজন

যদি গ্রামসীয় চিন্তাভাবনাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় নিয়ে এসে থাকেন, দ্বিতীয়জন মূলত হেবারমাসের চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রবার্ট কক্স-এর আলোচনায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। প্রথমত, কক্স বিশ্ব রাজনীতির পঠনপাঠনে দু'ধরনের তত্ত্ব দেখতে পেয়েছেন। একটিকে তিনি বলেছেন সমস্যা-সমাধানের তত্ত্ব বা Problem-solving Theory। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে গৃহীত ধ্রুবকগুলিকে (parameter)—যেমন, রাষ্ট্র, যুদ্ধ, শক্তিসাম্য ইত্যাদিকে—মেনে নিতে হবে যেখানে পরিবর্তনের সম্ভবনা কম। অন্যদিকে, তিনি যাকে সমালোচনামূলক তত্ত্ব বা Critical Theory বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধ্রুবকগুলোকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সম্মুখীন করা। অর্থাৎ, যুদ্ধ যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি অবধারিত সত্য হয় তাহলে সমস্যা-সমাধানের তত্ত্ব যুদ্ধ কিভাবে বন্ধ করা যায়, সেই সূত্র আবিষ্কারে ব্রতী হবে। কিন্তু সমালোচনামূলক তত্ত্ব ঐতিহাসিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করবে, এবং সম্ভব হলে কিভবে যুদ্ধবিহীন পৃথিবী তৈরি করা যায়, তার পথনির্দেশ করতে সচেষ্ট হবে। দ্বিতীয়ত, কক্স গ্রামসির 'সম্মতি-ভিত্তিক কর্তৃত্বের' (hegemony) ধারণাটি বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র বা পৃথিবীতে প্রধান চিন্তাধারণাগুলি, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বাস্তব সামর্থ্য যদি সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়, তাহলেই সূচনা হয় সম্মতিভিত্তিক কর্তৃত্বের। সামাজিক শক্তি, রাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যবস্থা—এ সবই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইমত অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলি নিজ নিজ মত ও আদর্শ অনুযায়ী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলেছে শুধুমাত্র সামরিক সামর্থের মাধ্যমে নয়। এর বাইরেও, এই দেশগুলি পৃথিবী জুড়ে বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে প্রান্তিক ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি সহমত গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজস্ব প্রভুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহও এই প্রভুত্ব স্থাপনে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কক্স মিলেনিয়ম জার্নালের ১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'Social Forces, States and World Orders' প্রবন্ধটিতে একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন। সেটি হচ্ছে, 'Theory is always for someone, and for some purpose'—অর্থাৎ, তত্ত্ব সবসময়েই তৈরি হয় কারও জন্য, এবং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। সবশেষে, কক্স-এর মত অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক সমাজ সম্পর্কে আলোচনা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন, কোন তত্ত্ব 'মুক্তি'র (Emancipation) প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও পথনির্দেশ করবে। তাঁর মতে প্রান্তিক ও দুর্বল রাষ্টগুলির বিশ্বায়ন বিরোধী প্রতিক্রিয়া, 'কেন্দ্র' ও 'প্রান্তিক' রাষ্ট্রগুলির এলিট শ্রেণীর মধ্যে বিশ্বের সম্পদ বন্টন নিয়ে সহমত—সবই দিকনির্দেশ করে আধিপত্য-বিরোধী গোষ্ঠী (Counter Hegemonic Bloc) গঠনের প্রয়োজনীয়তার। কিন্তু এই গোষ্ঠীর ভূমিকা কতখানি সার্থক হবে, তা নিয়ে কক্স কিন্তু দ্বিধার উর্দ্ধে উঠতে পারেননি।

অপরদিকে এন্ড্রু লিংকলেটার মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষের স্বাধীনতাকে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি উচ্চতায় নিয়ে যাওয় যায়। তাঁর মতে মানবগোষ্ঠীর মূল সমস্যার সূত্রপাতই হয়েছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র তার 'আবদ্ধ গোষ্ঠী'র (Bounded Community) ধারণার মধ্য দিয়ে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশীর বিভাজন করেছে—এবং সূচনা হয়েছে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং বহিষ্করণের রাজনীতি (Politics of inclusion and exclusion)। রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যারা থাকবেন, তারা হলেন নাগরিক, আর সেই সীমানার বাইরে যারা তার হলেন বিদেশী। লিংকলেটারের তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে: প্রথমত:, এই তত্ত্বটির একটি ঔচিত্যবোধক (Normative) কার্যক্রম আছে। চেতনা ও যুক্তির পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের সম্ভাবনাই এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রবার্ট কক্সের মতো লিংকলেটারও মনে করেন 'মুক্তি' (Emancipation) হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের

অন্যতম গন্তব্য। মুক্তি বলতে তিনি বোঝেন সম্মতি দেওয়ার স্বাধীনতা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে এক আলোচনায় (Dialogue) অংশগ্রহণের স্বাধীনতা। অর্থাৎ, মুক্তির তিনটি পর্যায় আছে, এক, ক্ষমতা ও বলপ্রয়োগের পরিবর্তে পারস্পরিক আলোচনা বা কথোপকথন এবং সম্মতির ওপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। দুই, সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলা তাদের নিয়ে যারা একটি 'আলোচনা-গোষ্ঠী' (Speech Community) তৈরি করতে পারবেন এবং যে গোষ্ঠীর বিশ্বায়িত হবার সম্ভবনা থাকবে। তিন, এ সবেরই পূর্বশর্ত হবে এমন এক আর্থসামাজিক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে এই গোষ্ঠীর সদস্যরা নামমাত্র (nominal) অংশগ্রহণ না করে সদর্থক ভূমিকা পালন করবেন। এই ধরণের প্রকল্প সফল করতে হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু হবে: কথোপকথন ও সম্মতির প্রকৃতির ওপর প্রতিফলন; অভিন্নতা ও বিভিন্নতার পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর প্রতিফলন; সার্বজনীন ও বিশেষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর প্রতিফলন, এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার নৈতিক তাৎপর্যের ওপর প্রতিফলন। অর্থাৎ, সার্বজনীন নৈতিকতার (universal ethics) ওপর গুরুত্ব দিয়ে লিংকলেটার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন।

এই তত্ত্বটির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে গতানুগতিক ভাবে বর্ণনা করতে অস্বীকার করে—অর্থাৎ, যা হচ্ছে, তাই কেন হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে, একথা এই তত্ত্বে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এই তত্ত্ব দেখতে চায় কিভাবে কোন ঘটনা ঘটছে, এবং কী ঘটা প্রকৃতপক্ষে উচিত ছিল। অন্যভাবে বলা চলে, এই তত্ত্ব 'কেন'র (Why) ওপর গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে 'কিভাবে' (How) ঘটছে বা কি ঘটা 'উচিত' (Ought) ছিল তার ওপর গুরুত্ব দেয়। আর, এই সম্ভাব্য আলোচনার পদ্ধতিগত (methodological) দিক নির্দেশ করতে গিয়ে লিংকলেটর 'ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিক' (Historical-sociolgical) পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'মুক্তি'র আলোচনা করতে গেলে দেখতে হবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মানবসভ্যতা কীভাবে ঐক্য ও সার্বজনীন আচার আচরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং অনিশ্চিত, নৈরাজ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অস্তিত্বরক্ষার প্রচেষ্টা কতখানি আধুনিকতা (Modernity), জ্ঞান-উন্মেষ (Enlightenment) বিশ্বায়নের (Globalization) পথে অন্তরায় হয়েছে। আর, এখানেই লিংকলেটার মনে করেছেন, এই পরিবর্তনের আলোচনা তখনই সার্থক হবে, যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ সঠিক ও বাস্তবভিত্তিক কর্মপন্থা নির্দেশ করবেন। লিংকলেটার এই বিষয়ের ওপর খুব বেশি আলোচনা করেননি। তাঁর মতে সমলোচনামূলক তত্ত্বের 'বাস্তব দর্শন ('Practical Philosophy') হচ্ছে: বর্তমানের একটি ঔচিত্যবোধক পর্যালোচনা, উন্নততর ভবিষ্যতের একটি বিকল্পের ছবি আঁকা এবং বর্তমান প্রজন্মকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা (Praxis) সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর, এই পথে অগ্রসর হবার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে আদর্শ আন্তর্জাতিক নাগরিক তৈরি করা। নিঃসন্দেহে, এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু, এর মূল সমস্যা প্রধানত দুটি। এক, রবার্ট কেওহান (Robert Keohane) যিনি এই তত্ত্বটিকে 'মননশীল' (Reflectivist) ধারা বা ঐতিহ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি মনে করেন এই তত্ত্ব বা ধারাটি, এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই এর প্রভাব রয়ে গেছে অনেকটাই বিমূর্ত। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ—যেমন, জন মেয়ার্সহাইমার (John Mearsheimer) বা ক্রিশ্চিয়ান রিউস-স্মিথ (Christian Rues-Smith) মনে করেন, এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনাকে ব্যাখা করা বা আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে বা সচেষ্ট হয়নি। ফলে, তত্ত্বটি রয়ে গেছে শুধুমাত্র চিন্তার জগতেই। কিন্তু, এতদ্‌সত্ত্বেও বলা চলে—এই তত্ত্বটির অন্যতম অবদানই হচ্ছে এটি আন্তর্জাতিক

সম্পর্ককে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়েছে—আর বিতর্ক তুলে ধরেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও আপাত সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বগুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে।

৩.৬ নয়া মার্কসীয় তত্ত্ব (Neo-Marxist Theories)

সমালোচনামূলক তত্ত্ব বা বিশ্বব্যাবস্থা তত্ত্ব ছাড়াও ১৯৬০-এর দশক থেকে শুরু করে বিভিন্ন চিন্তাবিদ মার্কসীয় তত্ত্ব ও ভাবধারাকে অনুসরণ করে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন আন্দ্রে গুন্দর ফ্রাংক (Andre Gunder Frank)। পরনির্ভরশীলতা তত্ত্বের (Dependency Theory) অন্যতম ধারা 'অনুন্নয়নের উন্নয়ন'-এর (Development of Underdevlopment) প্রবক্তা হিসেবে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার সারমর্ম এইরকম: ঐতিহাসিকভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে এক অর্থনৈতিক শৃংখল তৈরি হয়েছে। এই শৃংখলের শীর্ষে আছে উন্নত দেশগুলি। এদেরকে তিনি উল্লেখ করেছেন 'মেট্রোপলিস্' (Metropolis) নামে। আর একেবারে শেষপ্রান্তে রয়েছে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি—যারা মূলত এই মেট্রোপলিসের 'উপগ্রহ' (Satellite) দেশ হিসেবে কাজ করে। আর এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নেমে এসেছে একেবারে অনুন্নত রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত। আর, মেট্রোপলিস ও উপগ্রহ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট হয়েছে আরেক ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার যাকে তিনি 'উপ-সাম্রাজ্যবাদী' (Sub-imperialism) ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। ফ্রাংকের মতে, নিজস্ব উদ্বৃত্তকে ব্যবহার করতে না পারার ফলে এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অনুবর্তী-রাষ্ট্রগুলিতে মেরুকরণ ও শোষণজনিত বিরোধিতা সৃষ্টি করার এবং বজায় রাখার প্রয়াসই অনুবর্তী বা 'উপগ্রহ' রাষ্ট্রগুলিতে উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন অনুন্নত দেশগুলিতে যে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজন সৃষ্টি করে, তারই ফলস্বরূপ স্থায়ী হয় অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন। এই ধারারই অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ওয়ালটার রডনী (Walter Rodney) বা সামির আমিন (Samir Amin) আফ্রিকার অনুন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই তত্ত্বটির প্রয়োগ করেছেন। রডনি মনে করেন তথাকথিত উন্নত দেশগুলি তাদের শোষণের ধারাকে ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তোলায়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ক্রমশ আরও অনুন্নত হয়ে পড়ছে। সামির আমিনের আলোচনা মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছে অনুন্নয়নের উন্নয়ন, পৃথিবীজোড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র এবং কেন্দ্রস্থিত ধনতন্ত্রীদের দ্বারা প্রান্তিক বা অনুবর্তী রাষ্ট্রের সর্বহারা শ্রেণীর ওপর শোষণের প্রকৃতির ওপর।

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সত্তর ও আশির দশকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত নয়ামার্কসবাদী তত্ত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সোভিয়েট ইউনিয়নের আকস্মিক অবসান এবং বিশ্বায়নের গতিময়তা কিছুটা হলেও ১৯৯০-এর দশকে এই চিন্তাধারাটির গতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর শেষকাল থেকে নয়া-মার্কসীয় ধারাটি আবার জেগে ওঠে। বিশ্বায়নের কুফল, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট এবং মার্কিন আধিপত্য এই তত্ত্বটিকে নুতন করে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসে। আলেক্স কেলিনিকস (Alex Callinicos), লিও পানিৎচ (Leo Panitch) বা পিটার গাওয়ান (Peter Gowan) প্রমুখ নয়া মার্কসবাদীগণ মনে করেন, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বজুড়ে নয়া উদারনীতিবাদের বিকাশ ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে। এরই পাশাপাশি সূচনা হয়েছিল ডলার-ওয়ালস্ট্রিটের যৌথ অনুশাসনের। আর, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, প্রতিষ্ঠানগুলির—বিশেষতঃ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক

অর্থভান্ডার ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার—বিশেষ অর্থনৈতিক ভূমিকা। ফ্রেড হ্যালিডে (Fred Halliday) ধনতন্ত্র, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিবর্তনকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বেনে টেসকে (Benne Teschke) বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ধনতন্ত্রের বিবর্তনে সাহায্য করেছিল তার বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আবার, ডেভিড হারভে (David Harvey) সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ধারার সন্ধান পেয়েছেন। একটিকে তিনি বলেছেন 'ক্ষমতার ভূখণ্ড সংক্রান্ত যুক্তি' (Tarritorial Logic of Power)—এই যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ও পরিচালকবর্গ কিভবে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করবেন তার ওপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি। অন্যদিকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন আরেকটি যুক্তি যাকে তিনি উল্লেখ করেছেন 'ক্ষমতার ধনতান্ত্রিক যুক্তি' (Capitalist Logic of Power) হিসেবে। এই যুক্তিটি মনে করে বিশ্ব-রাজনীতি পরিচালিত হবে আন্তর্জাতিক মূলধনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। তাঁর মতে, এই দুই যুক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটি পার্থক্য থাকলেও, এই দুই যুক্তি কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে একে-অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

কিন্তু নয়ামার্কসবাদী ধারনার একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় এই শতকের প্রথমদিকে প্রকশিত মাইকেল হার্দ (Michael Hardt) ও এন্টনিও নেগ্রির (Antonio Negri) যৌথভাবে লেখা Empire নামক বইটির মধ্যে। এই দুই লেখকের বক্তব্য হচ্ছে আধুনিক সার্বভৌমত্বের সূচনা হয়েছিল ইউরোপে। কিন্তু এর বিকাশ ঘটেছিল ইউরোপের সঙ্গে বহির্বিশ্বের, মূলত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। একদিকে ইউরোপের আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ও অন্যদিকে পৃথিবীর ওপর ইউরোপের আর্থ-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুটি দিক। উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে ধনতন্ত্রের প্রসার ও সুদৃঢ়করণ। হার্দ ও নেগ্রি মনে করেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিবর্তিত হয়েছে রাষ্ট্র, সমাজ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘটনার সমাবেশের মধ্যে ক্রমাগত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। ওয়েস্টফেলিয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার মধ্য দিয়ে তৈরি করেছিল আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের (inside-outside) মধ্যে বিভাজন। সাম্রাজ্যবাদ এই বিভাজনকে করেছিল সুদৃঢ়। সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন এই বিভাজনকে পরিবর্তন করে সৃষ্টি করতে চাইছে এক উন্মুক্ত বিশ্বব্যবস্থার। ফলে সার্বভৌমিকতা হয়ে যাচ্ছে 'অ-কেন্দ্রস্থ' (de-centered) এবং 'অ-ভূখণ্ডীয়' (deterritorialized)। এই পরিবর্তনে ফলে মূলধনের গতি হয়েছে অবাধ—আর, তার সাথে সাধারণ মানুষের ভাবনা-চিন্তাও বহুলাংশে রাষ্ট্রীয় সীমানাকে অতিক্রম করে গতিময় হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে: পরিবর্তিত ব্যবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ধনতন্ত্র কী জনমুখী হয়ে উঠবে? আর যদি তা না পারে, তাহলে আগামীদিনে পরিবর্তনের প্রতিভূ হয়ে উঠবে কে? এই দুই লেখকের উত্তর হচ্ছে—'the multitude' বা 'জনতা'ই হবে এই পরিবর্তনের প্রতিভূ। এই 'multitude'-এর সংজ্ঞা হার্দ ও নেগ্রি দেননি। কিন্তু তাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমী ভাবনাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত বিষয়বস্তুর মধ্যে জনগণের ভূমিকা কোন তত্ত্বই উল্লেখ করেনি—রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের পরিচালকরাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মুখ্য ধারক ও বাহক বলে বিধৃত হয়েছেন। হার্দ ও নেগ্রি এই ধারণায় আঘাত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্ব—বিশেষত বাস্তববাদ ও উদারনীতিবাদ—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও শক্তি-সাম্যের ওপর গুরত্ব দিয়েছেন। হার্দ ও নেগ্রি এই গতানুগতিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে 'জনতা'কে দেখেছেন পরিবর্তনের প্রতিভূ হিসেবে, আর সমালোচনামূলক তত্ত্বের মত মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বিকল্প ব্যবস্থার কোন ছবি এই দুই বিশেষজ্ঞ আঁকেননি ঠিকই—কিন্তু শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার প্রকল্প থেকে বের হয়ে এসে সুন্দরজীবনের কথা ভেবেছেন।

৩.৮ উপসংহার

উপসংহারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখনীয়, এক, একথা ঠিক মার্কস ও এঙ্গেলস আন্তঃ-ভৌগোলিক, আন্তঃ-রাষ্ট্র সম্পর্কের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করেননি—সেটা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। স্বাভাবিক ভাবে এই 'ভূ-রাজনৈতিক ঘাটতি' (Geopolitical deficiency) মার্কসীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই শূন্যতা দূর করা যাবে তখনই যখন ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তঃ-ভৌগোলিক সম্পর্কের গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা হবে। দুই, বাস্তববাদীরা যে 'নৈরাজ্যের যুক্তি' বা উদারনীতিবাদীরা যে 'মুলধনের যুক্তি তুলে সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা করেন, তার বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার আলোচনা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রভুত্ব ও শোষণের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাবনাও আগামীদিনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালের মার্ক্সীয় ও নয়ামার্কসীয় আলোচনা নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। একদিকে এই আলেচনা দিক নির্দেশ করছে এমন এক সম্ভাবনার যা আত্মরক্ষা বা নৈরাজ্যের পরম্পরাকে সরিয়ে দিয়ে কিভাবে সুন্দর জীবনের প্রতিষ্ঠা করা যায়। অপরদিকে, এই দৃষ্টিভঙ্গী সেই প্রশ্নটি সবার সামনে তুলে ধরেছে যা মার্কস তাঁর Theses on Feuerbach-এর (১৮৫৪) দীর্ঘকাল আগে করেছিলেন, দার্শনিকেরা পৃথিবীকে শুধুমাত্র ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: কীভাবে এর পরিবর্তন করা যাবে? নয়ামার্কসীয় চিন্তাধারা কিছুটা হলেও এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

৩.৯ সারাংশ

এই অধ্যায়ে মার্কস ও লেনিনের বক্তব্যকে ভিত্তি হিসেবে ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হয়েছে—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলি থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কসীয় ধারণার প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে দেখেছিলেন তার আলোচনা, পরবর্তীকালে এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮০-র দর্শকে মার্কসীয় দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে যে দুজন বিশেষজ্ঞ—রবর্ট কক্স ও এনড্রু লিংকলেটার—যে সমালোচনামূলক বা অনুসন্ধিৎসামূলক তত্ত্বের সূত্রপাত করেছিলেন, সেগুলোর বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৬০-এর দশকের শেষ সময় থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে নয়া-মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হয়েছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখার মধ্যে, সেই ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার বর্ণনা এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবশেষে যে বক্তব্যটি খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, তা হল—এই নয়ামার্কসীয় চিন্তাধার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তত পক্ষে পরিবর্তনের পদ্ধতি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন।

৩.১০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্কসীয় তত্ত্বসমূহের থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কিভাবে করবেন? আলোচনা করুন।

২. ইমানুয়েল ওয়লারাস্টাইন বর্ণিত বিশ্ব ব্যবস্থাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩. ইমানুয়েল ওয়লারাস্টাইন কর্তৃক লিখিত বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্বের একটি পর্যালোচনা করুন।

৪. রবার্ট কক্স কর্তৃক বিধৃত সমালোচনমূলক/অনুসন্ধিৎসামূলক তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৫. সমালোচনমূলক/অনুসন্ধিৎসামূলক তত্ত্ব সম্পর্কে এনড্রু লিংকলেটারের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. সাম্রাজ্যবাদের ওপর লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২. বিশ্ব সাম্রাজ্য ও বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য ওয়ালারস্টাইন কিভাবে নিরূপণ করেছেন?

৩. সমালোচনালমূলক/ অনুসন্ধিৎসামূলক তত্ত্ব ও সমস্যা-সমাধানমূলক তত্ত্বের মধ্যে আপনি কীভাবে পার্থক্য নিরূপণ করবেন?

৪. আন্দ্রে গুন্দর ফ্রাংক উল্লিখিত 'অনুসরণের উন্নয়ন' তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. মার্কস ও এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে কী বলেছেন? সংক্ষেপে লিখুন।

২. কেন্দ্র ও প্রত্যন্তের মধ্যে আপনি কিভাবে পার্থক্য করবেন?

৩. 'আধা-প্রত্যন্ত' বলতে কি বোঝায়?

৪. 'মুক্তি' বলতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কি বোঝান হয়?

৫. 'ক্ষমতার ভৌগোলিক যুক্তি' ও 'ক্ষমতার ধনতান্ত্রিক যুক্তি'র মধ্যে পার্থক্য করুন।

৬. 'জনতা' বলতে কি বোঝান হয়?

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Baylis, John, Steve Smith and Patricia Owens eds. *The Golobalization of World Politics* (Oxford University Press), chapter 8.
2. Reus-Smit, Christian and Duncan Snidal eds. *The Oxford Handbook of International Relations* (Oxfoed University Press), chapters 9, 10, 19 and 20.
3. Smith Steve, Ken Booth and Marysia Zalewski eds *International Relation Theory. Positivism and beyond* (Cambridge University Press), chapter 13.
4. বসু, গৌতমকুমার, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: তত্ত্ব ও বিবর্তন* (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ), পৃষ্ঠা ১৬-২১, ৫৭-৬৭, ১০৯-১১৫ এবং ১৬০-১৭৭।

একক ৪ ☐ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর-অবয়ববাদ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের উৎস ও সাদৃশ্য
৪.৪ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ
৪.৫ সমালোচনা ও অবদান
৪.৬ উপসংহার
৪.৭ সারাংশ
৪.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
৪.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা, এই দুই মতবাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গী বিবৃত করা। এরই সাথে এই তত্ত্বদ্বয় কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠন পাঠনকে প্রভাবিত করেছে, সে সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা সর্বসমক্ষে তুলে ধরা।

৪.২ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং উত্তর অবয়ববাদ সমার্থক কী না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন উত্তর-অবয়ববাদ একটি দার্শনিক তত্ত্ব বা চিন্তাজগতের আকর। এটি কোন বিশেষ যুগে বা সময়ে আবির্ভূত হয়নি—বরং এই তত্ত্বটি ঐতিহাসিকভাবে কাঠামোবাদ (Structuralism) এরই অগ্রগমন ও পরিমার্জন। অপরদিকে উত্তর-আধুনিকতা (post-modernity) মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ও নতুন ঐতিহ্য। সাম্প্রতিক কালে যে কোন নুতন বা অভিজ্ঞতালব্ধ ধারাকেই 'উত্তর-'এই বিশেষণ দেবার প্রবণতা এসেছে। কিন্তু যারা এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাঁরা উত্তর-আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিতাবাদের মধ্যে (Post modernism) একটি পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেন। এই মত অনুযায়ী উত্তর-আধুনিকতা একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগের সূচনা এবং তারই অগ্রগমন ও বিবর্তনের প্রতিফলন। অপরদিকে, উত্তর-আধুনিকতাবাদ একটি নতুন চিন্তাধারা যা বিশ্বরাজনীতিকে একটি নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে আলোচনা করে থাকে। এরা মনে করেন, উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদ উভয়েরই একটি সমদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী আছে—তা তাত্ত্বিক (theoretical) হোক, বা ধারণাগতই (conceptual) হোক অথবা পদ্ধতিগতই (methodological) হোক। উভয় দৃষ্টিভঙ্গীই নৈতিকতার দিক থেকে 'বাস্তব'কে (Real) এবং

যা আপাতঃদৃষ্টিতে গ্রহণীয় (given) তাকে প্রশ্ন করে এবং প্রশ্নবাণে (interrogate) বিদ্ধ করে, এদের পিছনে অন্তর্নিহিত (hidden) অর্থকে (meaning) তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে চায় এবং এই তথাকথিত 'বাস্তব' ও 'গ্রহণীয়'-র আড়ালে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন যোগসূত্র এবং বিশেষ উদ্দেশ্য বা কার্যসূচি আছে কিনা তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। আমরা এখানে এন্টনী বার্ককে (Anthony Burke) অনুসরণ করে আলোচনা করব উত্তর আধুনিকতাবাদ কীভাবে উত্তর অবয়ববাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে এবং উভয়েরই প্রায়-সমদর্শী তাত্ত্বিক, ধারণাগত এবং পদ্ধতিগত চিন্তাভাবনা বিশ্ব-রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করব উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের মধ্যে সাদৃশ্যগুলি। দ্বিতীয় অংশে আমরা এই প্রায়-সমার্থক দুই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং এদের তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। এর পরের অংশে এদের সমালোচনা, সমালোচনার প্রত্যুত্তর ও এদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবদান নিয়ে আলোচনা করা হবে। সবশেষে, আমরা দেখব এই দুই ধারার প্রভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নতুন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে কী না।

৪.৩ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের উৎস ও সাদৃশ্য

আমরা প্রথমে সেই ধারণা ও পদ্ধতিগুলির ওপর দৃষ্টিপাত করি যেগুলো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং উত্তর অবয়ববাদের প্রবক্তাগণ আলোচনা করেন। প্রথমত, এই দুই তত্ত্বই অনেকখনি প্রভাবিত হয়েছে ফারদিনান্দ ডি সাঁসুরের (Ferdinand de Sanssure) ভাষাতত্ত্বের দ্বারা। সাঁসুরের (১৮৫৭-১৯১৩) মতে ভাষার গঠনশৈলীর দুটো দিক আছে: একটি হচ্ছে 'সিগনিফায়ার' (Signifier), অর্থাৎ যা উচ্চারিত হয়। আরেকটি হচ্ছে 'সিগ্‌নিফায়েড' (Signified), অর্থাৎ যা উচ্চারণের মাধ্যমে সূচিত হয়। এককথায় বলা যায়, একটি শব্দ উচ্চারণ বা বাক্যগঠন বা কথনের মধ্য দিয়ে সামাজিক জীবনে কিছু 'অর্থ' (Meaning) বিন্যাস করা হয়। যেমন, আমরা যখন বলি 'সীমান্তের ওপার থেকে যারা এসেছেন....', তখন আমরা বুঝে নিই 'সীমানার ওপারে' যারা থাকেন তারা বিদেশি, আবার 'সীমানার এপারে' যারা থাকেন তারা স্বদেশি। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে, এই খুব সাধারণ একটি বাক্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে 'স্বদেশি-বিদেশি' সত্ত্বার পার্থক্য বা বিভিন্নতা। সাঁসুরের মত অনুযায়ী, ভাষাশৈলীর গঠনের অর্থানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই আমরা বিভিন্ন ঘটনার, দৃষ্টিভঙ্গীর, উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য (Difference) নিরূপণ করতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, যে ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই গোষ্ঠী ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে তা হচ্ছে জাক দেরিদার (Jacques Derrida) বিনির্মাণ-এর (Deconstruction) ধারণা। দেরিদার (১৯৩৫-২০০৪) মতে যে কোন গঠনশৈলীর মধ্যে 'অর্থ' খুঁজে পাওয়া কঠিন, কারণ, গঠনশৈলীর 'অর্থ' অনেক বদলে যায় সময়, স্থান ও সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। বিনির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য এই নয় যে, যাকে আমরা 'বাস্তব' বলে মনে করছি, তাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমনভাবে 'বাস্তব'কে উল্লেখ করা যাতে তার সত্তা স্পষ্ট হয়, তার শ্রেণীবিভাগ করা যায় এবং তা হয়ে ওঠে যথার্থ অর্থবহ। যেমন, মার্কিন বিদেশনীতির ক্ষেত্রে কিছু রাষ্ট্রকে 'দুষ্ট' রাষ্ট্র (Rouge states) বলে উল্লেখ করা হয়। তখন শুধুমাত্র এই রাষ্ট্রগুলি যে কোন সময় পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলতে পারে বলে মনে করলে বিশ্বরাজনীতির আলোচনা আংশিক থেকে যাবে।

বিনির্মাণ আরও গভীরে গিয়ে দেখবে এই বিশেষ শব্দটির মধ্য দিয়ে কোন আন্তর্জাতিক স্তর বিন্যাসের প্রতিফলন ঘটছে কিনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন দ্বৈতবিভাজন (Dichotomy) তৈরি হচ্ছে কিনা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই শব্দটি উল্লেখের মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু উন্নয়নশীল দেশকে এমন একটি বিশেষণে ভূষিত করছে যাতে এই রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হয়ে উঠতে পারে এবং বিপজ্জনক রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ এই দুটি মাত্র শব্দের মধ্যে নিহিত আছে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার স্তর-বিন্যাসের ছবি এবং ক্ষমতাবান রাষ্ট্রের প্রভুত্ব বজায় রাখার আপাত অপ্রকাশিত গোপন প্রয়াস ও প্রচেষ্টা।

এই বিনির্মাণের আলোচনা থেকে আমরা আবিষ্কার করি তৃতীয় একটি ধারণা। এটি হচ্ছে বাচন বিশ্লেষণের (Discourse Analysis) ধারণা—আর, এই ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা জ্ঞানের (Power-knowledge) মেলবন্ধন (nexus)। এই ধারণাটি এসেছে মূলত মিশেল ফুকোর (Michel Foucault) দার্শনিক তত্ত্ব থেকে। ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) কোন ধারণা বা concept-কে সংজ্ঞায়িত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিশেষ ধারণাটি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এবং তা কীভাবে তথাকথিত 'সত্য'কে (Truth) প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন, একই ব্যক্তি একই সময়ে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের দৃষ্টিতে 'সন্ত্রাসবাদী'—আবার, অপর একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের চোখে 'মুক্তিযোদ্ধা'। অর্থাৎ, ফুকোর মতে, একটি নির্দিষ্ট সুতরাং অভ্রান্ত 'সত্য' বলে কিছু নেই—আছে অজস্র 'সত্য' এবং তার প্রকৃতি নির্ভর করে দেশ-সমাজ ও কালের মানদণ্ডে। এখানে মনে রাখা দরকার ফুকো বাচন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র ভাষার ওপর নির্ভর করেননি—তিনি মনে করতেন, আচার-আচরণ বা রীতিনীতি (Practices), প্রতীক (Representations), ব্যাখ্যা (interpretation) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তৈরি হয় সত্যের 'অনুশাসন' (Regime of truth)। আর এই বাচনিক পদ্ধতিতেই নির্মিত হয় সত্তা, প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক সম্পর্ক এবং সম্ভাবনা দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের। একথা বলা যায়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতবাদের বা উত্তরকাঠামোবাদের সমর্থকগণ বাচন-বিশ্লেষণও বিকল্প-বাচন (Counter Discourse) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গী, তত্ত্ব ও ধারণাসমূহের নির্মাণ পদ্ধতির নিগূঢ় দিকটি আবিষ্কারে সচেষ্ট হন এবং ক্ষমতা কিভাবে জ্ঞানকে প্রভাবিত করে, তার ব্যাখ্যা করেন। আর, এর পাশাপাশি বিনির্মাণ ও জিনিওলজির (Geneology) মাধ্যমে এরা চেষ্টা করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সত্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে। জিনিওলজি বলতে বোঝান হয় সংগ্রামের এক যন্ত্রনাময় পুনরাবিষ্কার, প্রচলিত প্রতর্কের (Discourse) ওপর আক্রমণ, টুকরো হয়ে যাওয়া অধীনস্থ, স্থানিক ও বিশেষজ্ঞানের পুনরুদ্ধার, মহান সত্য, সমন্বয়কে চ্যালেঞ্জ করা এবং সমালোচনা ও সংগ্রামকে উজ্জীবিত করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই চিন্তাধারার প্রবক্তাগণ যখন পরিবেশদূষণ নিয়ে আলোচনা করবেন তারা অবধারিতভাবে প্রশ্ন করবেন: বিশ্ব পরিবেশ দূষণের গভীরে তথাকথিত উন্নয়নের ধারণা ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কি ভূমিকা রয়েছে? কোন রাষ্ট্রগুলি এই আলোচনার থেকে দূরে সরে থাকছে বা দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে? উপেক্ষিত অথচ বিশ্ব পরিবেশ দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী, রাষ্ট্রগুলির প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতি কী? এই ধারণাটির মূল প্রশ্ন হচ্ছে 'কিভাবে' (how) ঘটছে? 'কেন' (why) এদের কাছে ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সবশেষে, যে ধারণাটি এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রায় সমার্থক এই দুটি ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে আন্তঃপাঠক্রিয়ার (intertextuality) ধারণা। এই ধারণাটির মূল উৎস রয়েছে সাঁসুর, মিখাইল বাখতিন (Mikhail Bakhtin) এবং জুলিয়ে ক্রিস্তেভার (Julia Kristeva) লেখার মধ্যে। এর মূল কথা হচ্ছে:

আমরা যে কোন আন্তর্জাতিক ঘটনাকে একটি পাঠ (Text) হিসেবে দেখতে পারি। বাখতিনকে (১৮৯৫-১৯৭৫) অনুসরণ করে বলা যায় সমস্ত পাঠ তথা ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের মুহূর্ত, সময়ের স্রোতে ভেসে আসা বহুস্মৃতি—যা একে অপরকে শোনায় নিজ নিজ কথা। আবার ক্রিস্তেভার (১৯৪১-) মতে একটি পাঠ একান্তভাবে তার নিজস্ব নয়, সে অন্য পাঠ থেকে ধার করে, এবং একে অপরকে অতিক্রম করার (neutralize) চেষ্টা করে। যখন আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ আলোচনা করি, তখন তার মধ্যে লীগ অফ নেশনসের কভেনান্টের প্রভাব যেমন দেখা যায় তেমন-ই তাকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। আন্তঃপাঠক্রিয়ার লক্ষ্যই হচ্ছে একটি পাঠের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পাঠের আবিষ্কার, দুয়ের সহবস্থান ও সংঘাত ও স্বকীয় উপস্থিতিকে নির্ধারণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ঘটনার ব্যাখ্যা করা ও অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা। এই পাঠ কখনও ঘোষিত বক্তব্য, লিখিত সনদ, অনুল্লিখিত ভাষ্য, কোন আপাতদৃষ্টিতে নীরব ছবি অথবা বিশেষ সম্মেলনের প্রতিরূপ। জেমস্ ডের ডেরিয়ানের (James Der Derian) 'On Diplomacy' (১৯৮৭) ও 'Anti-Diplomacy' (১৯৯৩) বা ডের ডেরিয়ন ও মাইকেল শাপিরের (Michael Shapi) সম্পাদিত International/ Intertextual Relations (১৯৮৯) আন্তঃ পাঠক্রমের উজ্জ্বল উদাহরণ।

৪.৪ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ

প্রশ্ন হচ্ছে: উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর অবয়ববাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কী এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞগণ সেগুলোকে কিভাবে আলোচনা করেছেন? এই সমদর্শী তত্ত্বদ্বয়ের প্রথম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—এরা আধুনিকতাকে সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ বলে মনে করে না। এদের মতে পৃথিবীতে একটি মাত্র সত্য আছে, একথা ঠিক নয়—মূলত পৃথিবীতে একাধিক সত্য আছে। এরা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃসম্পর্কের মধ্যে আধুনিকতার সমগোত্রীয় বা সমভাবাপন্ন প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতাকে 'ভিন্ন ধরনের', 'ভিন্নমত পোষণকারী' ও 'অনুগামী' বলে অস্বীকার না করে, সেগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। যেমন, রিচার্ড এশ্‌লে (Richard Ashley) বাস্তববাদীদের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বকে বিনির্মাণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে বাস্তববাদীরা যেভাবে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে একটি অখণ্ড, সংগঠিত ও এককসত্ত্বা বিশিষ্ট ব্যবস্থা বলে মনে করেন, তা কিন্তু বাস্তবের সঠিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটায় না। অথবা আর. বি. জে. ওয়াকার (R. B. J. Walker) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Inside/Outside: International Relations as Political Theory (১৯৯৩)-তে দেখিয়েছেন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে স্থানিক (Spatial) দিক—এখানে রাষ্ট্রীয় জনগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ (Inside) দিকটি দেখান হয়। নিরাপত্তা ও সামঞ্জস্যের এখানে চিরায়ত অবস্থান। আর, এর বাইরে (outside) রয়েছে আইন শৃংখলাহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা ও শত্রুতার এক অখণ্ড অস্তিত্ব। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অপর দিকটি হচ্ছে সময়গত (Temporal)। এদিক থেকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও প্রগতির স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে। কিন্তু বহিঃর্বিশ্বের সংঘাত, নৈরাজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোন ভাবনা আসতেই পারে না। ওয়াকারের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এই অভ্যন্তরীণ ও বহিঃর্বিশ্বের কৃত্রিম বিভাজনের মধ্য দিয়ে সার্বভৌমত্বকে একটি অনতিক্রম্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওয়াকারের বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সপ্তদশ শতকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশ্ব ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার একটি প্রয়াস অর্থাৎ, সার্বভৌমত্ব একটি ঐতিহাসিক গঠনমাত্র

(historical construct)—এটি জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক ও বিশ্ব নাগরিকের ধারণার মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা সমাধানের একটি পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই মতাবলম্বীদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে মত বা সিদ্ধান্তকে সার্বজনীন বা চিরায়ত বলে মনে করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট দিক মাত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারও অজস্র সম্ভবনা থাকতে পরে যা যে কোন কারণেই হোক না কেন, স্বীকার করে নেওয়া হয়নি। এই তত্ত্বের কোন কোন প্রবক্তা দেখিয়েছেন সার্বভৌমশক্তি হিসেবে রাষ্ট্র কিভাবে রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী কোন কোন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অধিকার দিতে বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের দাবী তুলে ধরবার অধিকারকে অস্বীকার করেছেন। পল কীল (Paul Keal) বা উইলিয়াম কনোলী (William Connolly) এই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয়তঃ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের সমর্থকগণ মনে করেন যেটাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা বাস্তব (reality) বলে মনে করছেন, তা আসলে 'সামাজিক নির্মাণ' (social construction) ছাড়া আর কিছু নয়। এরন বিয়ার্স স্যাম্পসন (Aaron Beers Sampson) দেখিয়েছেন যে কেনেথ ওয়ালট্জ (Kenneth Waltz) বা আলেকজন্দর ওয়েন্ট (Alexander Wendt) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে একটি আদিম সমাজব্যবস্থা হিসেবে দেখিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সামনে দুটি পথের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে: হয় এই স্থায়িত্ব (status quo) মেনে নিতে হবে অথবা আন্তর্জাতিক দুনিয়াকে 'সভ্য' হতে হবে, অর্থাৎ পশ্চিমী দুনিয়ার আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অনুকরণ করতে হবে। স্যাম্পসন দেখিয়েছেন ওয়ালটজ্ মূলত এমিল ডুরকহাইমের (Emile Durkheim) তত্ত্ব অনুকরণ করেছেন। এই তত্ত্বটির মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে যে প্রশাসকেরা তথাকথিত আদিম সাম্রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন তারা কিভাবে প্রশাসন পরিচলনা করবেন। ওয়ালটজ্ এই ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এমন এক তত্ত্ব তৈরি করলেন যার লক্ষ্যই হচ্ছে প্রগতির চেয়ে ক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া, পরিবর্তনের চেয়ে ভারসাম্যকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধকের ওপর নির্ভর করা।

চতুর্থতঃ, এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান (Objective Knowledge) প্রতিষ্ঠ করা সম্ভব নয়। বরং তাঁরা মনে করেন সদর্থকবাদ (Positivism) যে আদিকল্পের (Paradigm) উল্লেখ করে, তা আসলে সমাজে ক্ষমতার সম্পর্কের (Power Relations) প্রতিফলন মাত্র। রিচার্ড এশলে তাঁর বিখ্যত প্রবন্ধ The Poverty of Neo Realism-এ (১৯৮৪) দেখিয়েছেন নয়াবাস্তববাদ কিভাবে নিয়ন্ত্রণের কার্যসূচিকে বিস্তৃত করে এবং ক্ষমতা প্রসারের যুক্তিকে প্রসারিত করে এবং ক্ষমতার যে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে তাকে স্বীকার করে না। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন সদর্থকবাদ যে আখ্যায়িকা (Narration) বা আদিকল্পের উল্লেখ করেন তা কখনই বস্তুনিষ্ঠ নয়। কারণ, যে তথ্যের (data) ওপর এই আখ্যানগুলি দাঁড়িয়ে আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিক সত্যের প্রতিফলন ঘটায়।

পঞ্চমতঃ, যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে: উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর অবয়ববাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্নকে কিভাবে দেখে থাকে? আপাতদৃষ্টিতে, এই সমার্থক তত্ত্বদুটির মধ্যে নিঃসন্দেহে নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে, এর প্রবক্তাগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে কোন সমস্যাকেই দেখতে চেয়েছেন একটি প্রশ্নবোধক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিক নৈতিকতার প্রশ্নও এই তত্ত্বের সমর্থকেরা কিন্তু কোন চিরায়ত নৈতিকতার মানদণ্ড তুলে ধরতে পারেন নি বা সচেষ্ট হননি। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা যখন সার্বভৌমত্বের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন তা তাঁদেরকে বিশ্বজনীনতাবাদের

(Cosmopolitanism) কাছাকাছি নিয়ে যায়। আবার যখন তারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন ধারণা বা ঘটনাকে তার পটভূমিকায় এবং আনুষঙ্গিকতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেন, তখন তা অনেকাংশেই হয়ে ওঠে সমভোগতান্ত্রিকতার (Communitarianism) নিকটবর্তী চিন্তাধারা। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এই তাত্ত্বিকদের লেখায় নৈতিকতার প্রশ্ন উঠে এসেছে। যেমন, জুডিথ বাটলার (Judith Butler) মনে করেন 'আত্ম' (Self) কখনই 'অপরকে' ছাড়া গড়ে ওঠেনা। ক্যাম্পবেল (Campbell) উল্লেখ করেছেন স্থান, সংস্কৃতি, সীমানার দূরত্ব অতিক্রম করে 'দায়িত্ব' পালনের প্রয়োজনীয়তার। মাইকেল সাপিরো 'অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের নৈতিকতা'র (ethics of encounter) কথা বলেছেন। এর মুখ্য বক্তব্য হচ্ছে নিজস্ব সত্তা বা নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলেও অপরকে স্বাগত জানাতে হবে। এছাড়াও, এই তত্ত্বের আলোকে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়, যেমন, মানবাধিকার, মানবিকতার খাতিরে হস্তক্ষেপ (humanitarian intervention), উদ্বাস্তু সমস্যা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (War on Terror), নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বজনীনতাবাদের যে ক্রমবিবর্তনের পথে শান্তির প্রতিষ্ঠা, অথবা উচ্চ আদর্শসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি নির্মাণ ইত্যাদি সম্পর্কে এই তত্ত্বের কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

সবশেষে বলা যায়, উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদ সার্বভৌমত্বের ধারণাকে যেমন বিনির্মাণ করে, তেমনি বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক-এর মধ্যে পার্থক্য এবং একে অপরকে বিভিন্ন ধরণের দ্বৈততার মধ্য দিয়ে কীভাবে পারস্পরিক স্থায়িত্ব আনতে পারে তার আলোচনা করে। আর, এই তত্ত্ব দুটি কখনই সার্বজনীন প্রত্যর্কে বিশ্বাস করে না কারণ সব প্রত্যর্ক বা তত্ত্বই কোন না কোনভাবে ক্ষমতার সম্পর্কের দ্বারা গঠিত হয়।

৪.৫ সমালোচনা ও অবদান

উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের সমালোচনা হয়েছে মুলত পদ্ধতিগত দিক থেকে। এই তত্ত্বের আলোচনাপদ্ধতি অত্যন্ত গভীর এবং এরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমস্যাগুলো নুতন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবেই আলোচনা করেছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এরা সত্তা, সংস্কৃতি, মান (norm), অনুশাসন ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কখনও বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকরণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেনি। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মোটামুটিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব ও ধারণার সমালোচনা এবং বিকল্প ভাবনা করতে গিয়ে, এই তত্ত্বটির গৃহীত ধারণা ও তত্ত্বগুলি বহুলাংশেই হয়ে গেছে 'অনিশ্চিত' (unsettled) এবং 'রাজনীতি বহির্ভূত' (depoliticized)। সর্বশেষ, এই তত্ত্বের একটি নেতিবাচক দিক আছে। সব তত্ত্ব এবং পদ্ধতিই যদি হয় ক্ষমতার সম্পর্কের প্রতিফলন, তা হলে তত্ত্ব নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনেকখানিই হয়ে যায় অপ্রয়োজনীয়। আর, সব তত্ত্বই যদি হয় ক্ষমতার সম্পর্কের পরিণতি, তাহলে উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদ কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে? আবার, এই তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পঠন পাঠনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পারে এক ধরনের অবিশ্বাসের ধ্যানধারণা। এই তত্ত্বটির আলোচনার মধ্যে বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনের দিক নির্দেশ যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি দেখা যায় না কোন সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সমাধানসুত্রের পথনির্দেশ।

এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের সমর্থকেরা নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন।

প্রথমত, লেন হ্যানসেন (Lene Hansen) প্রত্যর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোসনিয়া সংকটের আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যুক্তিবাদীরা যে কার্যকরণ সম্পর্ক উল্লেখ করেন, তা একদিকে যেমন খুবই সংকীর্ণ তেমনই অপরদিকে অত্যন্ত স্থবির। এই কার্যকরণ সম্পর্কের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে, এটি মনে করে কার্যকরণের বাইরে কোন সমাজবিজ্ঞানের সমস্যা আলোচনা করা যায়না। আবার, এটাও সত্য যে কার্যকরণ বিশ্লেষণ যুক্তিবাদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিদেশনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও প্রত্যর্ক বিশ্লেষণ বিভিন্ন আলংকারিক বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে সেই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বের করতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বগোষ্ঠীর প্রবক্তারা মনে করেন আপাতদৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে ঘটনাবলী আমরা দেখি বা যে বিশ্লেষণ আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তা এই ঘটনার পেছনে যে আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য অথচ সামাজিক বিবর্তনের গভীরে যে কারণগুলি লুকিয়ে আছে, তাকে তুলে ধরেনা বা তুলে ধরতে প্রস্তুত নয়। আরনেস্টো লাকলাউ-এর (Ernesto Laclau) মতে, সমাজ বিবর্তনের পথে অনেক ঘটনাকেই অবাঞ্ছিত বলে দূরে সরিয়ে রাখা হয় বা তার আপাত-গুরুত্বই আলোচনা করা হয়। প্রশ্ন করা হয় না যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কেন একটি নির্দিষ্ট পথেই এগিয়ে চলেন—তা রাষ্ট্রীয় স্তরেই বা আন্তঃর্জাতিক স্তরেই হোক। এককথায়, প্রতিষ্ঠান বা এর ভিত্তি থেকে যায় সমস্ত জিজ্ঞাসার বাইরে। উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর অবয়ববাদ এই গঠনের স্তর নিয়েই প্রশ্ন করে।

সবশেষে, উল্লেখ করা দরকার যে, উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর অবয়ববাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশাল দরজা খুলে দিয়েছে। রির্চাড এশ্‌লে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধে The Achievements of Post-Structuralism-এ এই অবদানগুলি উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে: সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধিত্বের (Representation) সমস্যা বা স্বতঃবিরোধিতার আলোচনা, প্রতিভূ (agency), ক্ষমতা ও প্রতিরোধকে (Resistance) নুতন দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যালোচনা; জ্ঞান, স্মৃতি ও ইতিহাসকে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করা; স্থান ও সময় গতি ও স্থান এবং সীমানা ও সীমানাবহির্ভূতর মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা, আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ, স্থানিক ও সামগ্রিক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা, সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অন্ত্যবাসী (subaltern) ও প্রান্তবাসী (marginalised) গোষ্ঠীর ভূমিকা, তাদের প্রতিরোধের পদ্ধতি ও এই ধরনের আলোচনার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই বিশাল গবেষণার কর্মসূচী থেকে একটি পাল্টা প্রশ্নই উঠে আসে: উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদ যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নেতিবাচক প্রভাবই বিস্তার করত, তাহলে কী এই বিশাল গবেষণার দিক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা থাকত?

৪.৬ উপসংহার

এই আলোচনার পরিসমাপ্তিতে, এ কথা উল্লেখ্য যে, উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদ উভয়েই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ধারা সৃষ্টি করেছে। এর একটি হচ্ছে উত্তর উপনিবেশবাদ (Post colonialism) এবং অপরটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমাজবিদ্যার (International Political Sociology) ধারা। প্রথম ধারাটি মূলত মনোনিবেশ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতা, স্তরবিন্যাস ও প্রভুত্ব কিভাবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তার ওপর। সাম্প্রতিককালে

স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বস্তরে বিভিন্ন ঘটনা ও তার পরিবর্তনকে ক্ষমতা কিভাবে প্রভাবিত করেছে, তা জানা যায় সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তিত গতিময়তার মাধ্যমে। পশ্চিমী অগ্রগতির ধারাই যে একমাত্র ধারা নয়, তাও সমালোচিত হয়েছে এই উত্তরউপনিবেবাদী চিন্তা-ভাবনার মধ্যে। এছাড়া, প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা, জাতি ও লিঙ্গের (Gender) পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্ব ধনতন্ত্র ও শ্রেণী এবং উত্তর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি বা পুনরুদ্ধার (recovery), প্রতিরোধ এবং নিযুক্তির সম্পর্কের আলোচনা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছে উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও পদ্ধতিগত আলোচনা সংক্রান্ত নবতম সংযোজনের দ্বারা।

দ্বিতীয়ত, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমাজবিদ্যার ধারাটি সৃষ্টি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'-এর (War on Terror) পরিপ্রেক্ষিতে। এই চিন্তাধারাকে অনেকেই 'প্যারিস স্কুল'-এর (Paris School) চিন্তাধারা বলে অভিহিত করেন। এই চিন্তাধারার মূল প্রশ্ন হচ্ছে: রাষ্ট্রীয় পেশাদারী নিরাপত্তা রক্ষী, রাষ্ট্রের অন্তর্গত পুলিশী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বেসরকারী বা অ-রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষীর (Private militia) কার্যাবলী ও চরিত্রের মধ্যে কোন যথার্থ পার্থক্য আছে কি? এই ধারার অন্যতম প্রবক্তা দিদিয়ার বিগো (Didier Bigo) মনে করেন বর্তমান কালে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সামরিক মৈত্রীর (alliance) ভূমিকার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। তাঁর মতে নিরাপত্তা ও নিরাপত্তাহীনতাকে (Insecurity) দ্বি-ভাজন (binary) করা যায় না—বা একটি সদর্থক ও অপরটি নেতিবাচক বলা যায় না। রাজনৈতিক বাস্তববাদীদের 'নিরাপত্তাজনিত উভয়সংকটের' (security dilemma) সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও, পার্থক্য হচ্ছে, বাস্তববাদীরা এই সংকটকে মূলত রাষ্ট্রীয় সংকট হিসেবে দেখেন। কিন্তু দিদিয়ার বিগো মনে করেন এই ধরনের সংকট সৃষ্টির পেছনে রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় একক (unit)—উভয়ের সমান ভূমিকা আছে।

এই দুটি ধারার বাইরে আরও একটি ধারা উল্লেখ করা দরকার। সেটিকে বলা যায় ব্যতিক্রমীবাদের ধারা (exceptionalism)। সাম্প্রতিককালে, বিশেষত, সন্ত্রাসবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, বহু উচ্চারিত 'ব্যতিক্রমী সময় ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাকে আমন্ত্রণ জানায়' বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এই তত্ত্বটি। ওয়াল্টার বেনজামিনের (Walter Bejamin) বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইটালীয় দার্শনিক গিওরগিও আগামবেন (Giorgio Agamben) বলেছেন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নীতিগুলি (counter terrorism policies) গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে শূন্যতায় পর্যবসিত করেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত যে কোন মানুষকে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং বিনা বিচারে জেলে পাঠানোর রাষ্ট্রীয় অধিকার নাগরিক ও বিদেশি উভয়কেই অরক্ষিত করে ফেলে। আগামবেনের মতে ব্যতিক্রমী পরিবেশে ব্যতিক্রমী গণতান্ত্রিক নীতি মেনে নেওয়াই হয়ে গেছে বর্তমানকালে 'স্বাভাবিক'—'আমাদের ব্যক্তিদেহ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই' ('our private body has now become indistinguishable from our body politic')। এর তাৎপর্য হচ্ছে—যা ওয়াল্টার বেঞ্জামিন (১৮৯২-১৯২৭) ভেবেছিলেন দীর্ঘদিন আগে—রাষ্ট্রঘোষিত 'ব্যতিক্রমী' পরিস্থিতি সমস্ত মানুষকে নিক্ষেপ করেছে নিরাপত্তাহীনতার চিরায়ত ব্যবস্থার মধ্যে।

৪.৭ সারাংশ

এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমেই উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর অবয়ববাদ সমার্থক কী না তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। সাঁসুর, ডেরিডা ও ফুকোর চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে এই দুই ধারার বিবর্তন ও তাদের

পারস্পরিক সাদৃশ্য আলোচিত হয়েছে। এর পরে এই দুই তত্ত্বের সম-বৈশিষ্ট্যগুলি—যেমন, আধুনিক সভ্যতাই চূড়ান্ত নয় ও একাধিক সত্যের অস্তিত্ব, সিদ্ধান্তের বহুমুখীনতা ও বিবিধ সম্ভাবনার অস্তিত্ব, বাস্তবকে সামাজিক নির্মাণের অঙ্গবিশেষ, তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠজ্ঞান বা ধারণার গভীরে ক্ষমতার-সম্পর্কের ভূমিকা এবং নৈতিকতার প্রশ্নে আপেক্ষিকতা—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নির্দিষ্ট প্রয়োগের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। পদ্ধতিগত দিক থেকে এই তত্ত্বের দুর্বলতা এবং এই যুক্তিসমূহের বিরুদ্ধে উত্তর ও তারই সাথে এই তত্ত্বের অবদানগুলি তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে এই তত্ত্বের সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি হিসেবে উত্তর সাম্রাজ্যবাদ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান ও ব্যতিক্রমীবাদের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকাতবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদের উদ্ভাবনের জন্য যে ধারণা ও তত্ত্বগুলি সাহায্য করেছিল সেগুলো আলোচনা করুন।

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করুন।

৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদের একটি সমালোচনা লিখুন। আপনি এই সমালোচনার উত্তর কীভাবে দেখেন?

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. বাচন বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝায়? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে?

২. ফার্দিনান্দ দি সাঁসুর ও জাঁক দেরিদার দৃষ্টিভঙ্গী কীভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর গঠনবাদ ও উত্তর আধুনিকতাবাদের উৎস হিসেবে দেখা হয়েছে তার ওপর একটি টীকা লিখুন।

৩. উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদের চিন্তকগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতাকে কিভাবে দেখেছেন তা আলোচনা করুন।

৪. উত্তর কাঠামোবাদ ও উত্তর আধুনিকাতাবাদের প্রভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে সমস্ত স্কুলের সৃষ্টি করেছিল সেগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদের মধ্যে পার্থক্যকে আপনি যথার্থ বলে মনে করেন? সংক্ষেপে আপনার যুক্তি দিন।

২. উত্তর আধুনিকতাবাদ ও উত্তর কাঠামোবাদের কিছু অবদান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিহ্নিত করুন।

৩. প্যারিস স্কুলের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৪. ব্যতিক্রমীবাদের ওপর গিওরগিও আগামবেনের দৃষ্টিভঙ্গী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Baylis, John, Steve Smith and Patricia Owens eds. *The Globalization of World Politics* (Oxford University Press), chapters 10 and 11.
2. Booth, Ken and Steve Smith eds. *International Relations Theory Today* (Polity Press), chapter 10.
3. Jackson, Robert and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford Unversity Press) chapter 9.
4. Peoples, Columba and Nick Vaughan-Williams, *Critical Security Studies (Routledge)*, chapter 4.
5. Reus-Smit, Christian and Duncan Snidal eds. T*he Oxford Handbook of International Relations* (Oxford University Press), chapters 21 and 22.
6. Smith Steve, Ken Booth and Marysia Zalewski eds. *International Relations Theory. Positivism and beyond* (Cambridge University Press), chapter 11.

পর্যায়—২
সমসাময়িক বিষয়সমূহ

একক ১ ❑ ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে মার্কিন বিদেশনীতি

একক ২ ❑ সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপ

একক ৩ ❑ সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা

একক ৪ ❑ সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া

একক ১ ☐ ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে মার্কিন বিদেশনীতি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ একমেরুকৃত পৃথিবীতে আমেরিকা
১.৪ ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে চ্যালেঞ্জসমূহ
১.৫ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
১.৬ আমেরিকার বর্তমান অবস্থান
১.৭ সারাংশ
১.৮ প্রশ্নাবলী
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- এক মেরুকৃত পৃথিবীতে মার্কিন বিদেশনীতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।
- ঠাণ্ডা যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে মার্কিন বিদেশনীতির চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি'র তাৎপর্য্য অনুধাবন করা।
- বর্তমান বিশ্বে মার্কিন বিদেশনীতির অবস্থান বিষয়ে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

১.২ ভূমিকা

সমসাময়িক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্নাতীতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিধর রাষ্ট্র। যদিও কিছু বিশেষজ্ঞের মতে আমেরিকা পূর্বতন বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে যে মর্যাদা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় বা ঠাণ্ডা-যুদ্ধোত্তর সময়ের গোড়ার দিকে ভোগ করে এসেছে তা এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হতে শুরু করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপেক্ষিকভাবে একটি নতুন সভ্যতা ও সাবেকী তথা স্থিতিশীল গণতন্ত্রের উদাহরণ এই বিশ্ব রাজনীতিতে। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাদ দিয়ে) আমেরিকার জন্মলগ্ন থেকে, বলতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের সময় থেকে, আমেরিকা 'অন্য-নিরপেক্ষ স্বাভিমুখী' নীতি (isolationism) গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে মোটামুটিভাবে আমেরিকা বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব সাক্ষী হয় দুটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের উত্থানের যথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই সময়কালে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি তাদের পূর্বতন 'বৃহৎ শক্তির' মর্যাদা হারিয়ে

ফেলে বিশেষত ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি। শীঘ্রই দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রদ্বয় জড়িয়ে পড়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধে। আমেরিকা মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিস্তারের আতঙ্ককে প্রতিরোধ করার উপায় হিসেবে বেছে নেওয়ায় অনেকাংশে সংঘাতপূর্ণ বাতাবরণের সৃষ্টি করল। এর ফলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়কার মার্কিন নীতি কমিউনিজমের বিস্তার বিরোধক নীতি (Containment policy) হিসেবে প্রচার পায়।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় বিশ্ব দেখা যায় দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদিকে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপীয় ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অবস্থান। অপর দিকে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। ঠাণ্ডা যুদ্ধ যদিও কার্যত দুই শিবিরের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত ছিল—মূলত বলা যেতে পারে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত-তবুও কখনই তা সামরিক সংঘাতের চূড়ান্ত রূপ নেয়নি। অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়, মোটামুটিভাবে ১৯৯১ সালে বলা যেতে পারে। আশির দশক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সঙ্কটে ভুগছিল যে এই সময় থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস হওয়ার সুযোগে একের পর এক পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে কমিউনিস্ট সরকারগুলির পতন শুরু হয়। অবশেষে ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতনের সাথে সাথে দ্বিমেরু পৃথিবীর এক মেরুকরণ হয়।

১.৩ একমেরুকৃত পৃথিবীতে আমেরিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বিশেষত আমেরিকানরা, এই অবস্থাকে শীঘ্রই একমেরু অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করেন যদিও এই একমেরুকরণের প্রকৃতি আসলে কিরকম তা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক লেগেই ছিল। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ছিল না কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তীকালে ১৯৯১ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'বৃহৎ শক্তিরূপে' প্রকাশ পায়। সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকা এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে উদ্ভূত হয়। সোভিয়েতের পতনের পর পরই যে ধারণা মার্কিন মহলে দানা বাঁধতে শুরু করে তা হল, আমেরিকা কি তাহলে এইবার তার পূর্বতন 'স্বাতন্ত্রবাদী' নীতির পথ ধরবে—যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিনীরা চাইছিল যে আমেরিকা আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করুক বিশ্বরাজনীতিতে। সোভিয়েতের পতনের সাথে আমেরিকাও অনেক নিরাপদ অনুভব করল। কিন্তু গত দু-দশক থেকে যে বিতর্ক দানা বাঁধছে তা হল আমেরিকা কি একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। আরও যে প্রশ্ন উঠছে তা হল বিশ্বের অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্র যেমন রাশিয়া, চীন এবং আমেরিকার কিছু ইউরোপীয় জোটসঙ্গী তারা কিভাবে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য গ্রহণ করবে। এই দেশগুলি কিন্তু আমেরিকার প্রতি তাদের বিদেশ নীতির অবস্থান কি হবে এই নিয়ে চিন্তিত এবং এটি তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাও বটে। মার্কিন বিদেশনীতি কিন্তু একটি লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে চলেছে আর তা হল কোনরকম প্রতিপক্ষ শক্তির উদ্ভবকে নিরোধ করা। যদি চিরাচরিত মার্কিন বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আমেরিকা পশ্চিম গোলার্ধে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল এবং যাতে অন্য কোনো শক্তি ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব এশিয়া দখল না করতে পারে সেদিকেও কড়া নীতি অবলম্বন করেছিল। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত একটি Pentagon রিপোর্ট থেকেও এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। Pentagon রিপোর্টে উল্লিখিত মার্কিন বিদেশনীতির উদ্দেশ্যগুলি নিচে দেওয়া হল। যথা:—

- যেখানেই মার্কিন নিরাপত্তা স্বার্থ ব্যাহত হবে সেখানেই ওয়াশিংটন যথাসম্ভব কূটনীতি ব্যবহার করবে কিন্তু যদি প্রয়োজন পড়ে তবে সামরিক শক্তিও ব্যবহার করবে।
- নতুন বিপদ, চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগের বিষয়ে আমেরিকা তৎপর থাকবে। স্বাতন্ত্রবাদ নীতি যেরকম কোনোভাবেই মার্কিন নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে পারবে না সেরকম 'সংরক্ষণ' নীতিও (protection-ism) আমেরিকাকে সাফল্য দিতে পারবে না। তাই আমেরিকাকে বিশ্ব রাজনীতিতে নিযুক্ত থাকতে হবে (engagement)।
- অত্যাবশক জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বাহিনী পাঠাবে।
- গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অত্যাবশক বা অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে যথাযথ খরচ সাপেক্ষ (cost-benefit) বিশ্লেষণ করবে।
- আঞ্চলিক জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য আমেরিকা প্রতিরক্ষা সামর্থ বজায় রাখবে এবং বিভিন্ন অবস্থায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি আমেরিকার স্বার্থরক্ষার্থে চালু রাখবে।

১.৪ ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে চ্যালেঞ্জসমূহ

উপরোক্ত ১৯৯২ সালের Pentagon রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তিনজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির বিদেশনীতির মূল্যয়ন প্রয়োজন—প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। বিদেশনীতির ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান—দলমত নির্বিশেষে পূর্বে আলোচিত Pentagon নির্ধারিত বিদেশনীতির লক্ষ্যগুলি মাথায় রেখে আমেরিকার বিদেশনীতি পরিচালনা করে তবে কিয়দংশে দৃষ্টিভঙ্গি বা গুরুত্ব আরোপের তারতম্য দেখা যায়। অবশ্যই পরিস্থিতি অনুযায়ী। দেখা যায় সাবেকিভাবে ডেমোক্রাটরা মানবাধিকারের উন্নতি ও রক্ষা বা গণতন্ত্রের উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু সময় ও সুযোগ বিশেষে ডেমোক্রেটরা রিপাবলিকানদের মত মার্কিন সামরিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিছপা হয়নি বিশেষত যেখানে মার্কিন জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মার্কিন সেনা পাঠান। ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ায় বুশ প্রশাসন কর্তৃক নিয়োজিত মার্কিনবাহিনী ক্লিন্টনের সময় মোগাডিসুতে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আঞ্চলিক সমরনায়কদের সঙ্গে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল দুর্ধষ সমর নায়ক Mohammed Farah Idid-কে গ্রেপ্তার করা। তবে এই সোমালিয়ার সঙ্কটে আমেরিকার সামরিক অভিযান শুধু যে বিপর্যয় ডেকে আনে তা নয়, এর সঙ্গে বহু মার্কিন সৈন্য নিহত হয় সোমালীদের হাতে এবং ৭৩ জন আহত হয়। এর পরপরই মার্কিন সৈন্য সোমালিয়া থেকে প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৯৪ সালে ক্লিন্টন হাইতীর রক্তাক্ত গৃহ যুদ্ধ নিরসনের জন্য মার্কিন সেনাবাহিনী পাঠন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতি Jean Bertrad Aristide-এর নেতৃত্বে প্রকৃত নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় পুনর্বহাল করা যদিও Aristide কিন্তু বামপন্থী ও আমেরিকা বিরোধী ছিল। ১৯৯৫ সালে ক্লিন্টন ইউরোপের বলকান অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য মার্কিন সেনা পাঠান। এই অঞ্চলে পাঁচ বছর ব্যাপী গৃহযুদ্ধ চলছিল যুগোস্লাভিয়ায়। প্রাথমিকভাবে যদিও এক বছরের জন্য মার্কিন সেনা পাঠানো হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মার্কিন সেনা প্রায় ৯ বছরের জন্য সেখানে নিয়োজিত ছিল। সুদান ও আফগানিস্তানের ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ ছাড়াও ১৯৯১ সালে কসভো-সারবিয়া সংঘর্ষে প্রেসিডেন্ট

ক্লিনটন মার্কিন সেনা নিয়োগ করেন। এই সামরিক অভিযান North Atlantic Treaty Organization (NATO)-এর অন্তর্গত ছিল। তবে যদিও আমেরিকা বাহ্যিকভাবে হলেও মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তবুও ১৯৯৪ সালে রওয়ান্ডার গৃহযুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এই বীভৎস গৃহযুদ্ধের ফলে যে গণহত্যা সংঘটিত হয় তাতে এক মিলিয়নের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়। পরবর্তীকালে ক্লিন্টন অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনি এই সঙ্কটের গভীরতা এবং প্রকৃতি কোনোটাই বুঝতে পারেননি।

তবে ক্লিন্টন প্রশাসনের একটি বড় সাফল্য আসে ১৯৯৩ সালে মুক্ত বাণিজ্য স্থাপনের জন্য North American Free Trade Agreement (NAFTA) স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। যদিও এই উত্তর আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে মুক্ত বাণিজ্যের উদ্যোগ পূর্ববর্তী রিপাবলিকান প্রশাসন গ্রহণ করেছিল এবং ১৯৯২ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী প্রার্থী বিল ক্লিন্টন সর্বান্তকরণে এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই NAFTA-র ফলে আমেরিকার প্রভূত সুবিধা হবে তাই কিছু ক্ষমতাশালী রক্ষণশীল লবির বিরোধীতা সত্ত্বেও তিনি NAFTA-কে বাস্তবায়নের পথ থেকে পিছিয়ে আসেননি। এই রক্ষণশীল লবির নেতৃত্বে ছিলেন যে ব্যক্তি তাঁর নাম Ross Perrot।

ক্লিন্টন তাঁর রাষ্ট্রপতি শাসনকাল শেষে স্বীকার করেন যে তাঁর প্রশাসনের সবথেকে সফল কৃতিত্ব হল ইজরায়েল ও Palestine Liberation Organization (PLO)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত Oslo Pact। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পেছনে ক্লিন্টনের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই দুই পক্ষে—ইজরায়েলে ও পালেস্তাইনের মধ্যে আলোচনার প্রাতিষ্ঠানিকরণ করেছিল Oslo Pact। তবে Oslo Pact-এর প্রতিশ্রুতি কোনোভাবেই পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে রক্ষা হয়নি এবং বুশ বা ওবামা কেউ আমেরিকার বিদেশনীতিকে ইজরায়েল তোষণনীতি থেকে মুক্ত করতে পারেননি। ক্লিন্টন দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে এই প্যালেস্তিনীয় সমস্যা মেটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু আরব-ইজরায়েলী সমস্যার জটিলতা তাকে সফল হতে দেয়নি। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৯২ সালে Pentagon রিপোর্টে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির জোরালো অভিব্যক্তি ঘটে রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের শাসনকালে। প্রচলিতভাবে রিপাবলিকানরা কিয়দংশে যুদ্ধবাজ (howkish) হয় এবং বিশেষ করে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে মার্কিন জাতীয় স্বার্থ জড়িত। এই ধারণা বুশ প্রশাসনের বৈদেশিক নীতিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। এর মূল ধারণা ছিল এমন এক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিবর্তন যার মাধ্যমে সমস্ত রাষ্ট্র ও সংগঠন আমেরিকার নেতত্বের অধীনে চলে আসে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য মার্কিন জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমেরিকান বিদেশনীতির উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সমগ্র রাষ্ট্রগুলির পর্যাপ্ত সমর্থন ও সহযোগিতা যেটা আমেরিকাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার বা মারণ অস্ত্রের (Weapons of Mass Destruction-WMD) বৃদ্ধি থেকে উদ্ভূত বিপদ মোকাবিলা করতে সক্ষম করবে। আমেরিকা এটিও উপলব্ধি করে যে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য অপর বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি যেমন রাশিয়া ও চীনের সমর্থনও গুরুত্বপূর্ণ।

বুশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আমেরিকা-রাশিয়া সম্পর্কে প্রভূত উন্নতি হয় বিশেষত ৯/১১ সন্ত্রাসবাদী হানার পরবর্তীকালে। আমেরিকার উপর জঙ্গী হানার প্রেক্ষিতে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এই সন্ত্রাসবাদী হানার কেবল কড়া নিন্দাই করেননি, তিনি ওয়াশিংটনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস মোকাবিলার জন্য সমস্ত রকম সাহায্যের কথা বলেন। বুশ ও পুতিনের ব্যক্তিগত রসায়ন অনেকাংশে দুই পূর্বতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্কের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই একই লক্ষ্যে চীন ও ভারতকে আমেরিকা কাছে

টানতে চায় বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে। উদাহরণস্বরূপ WTO-তে চীনের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও বেজিংয়ের সন্ত্রাসবাদবিরোধী অবস্থানের বুশ প্রভৃত প্রশংসা করেন। ভারতের ক্ষেত্রে বুশ প্রশাসনের সময়কাল থেকে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয় ভারত-মার্কিন সম্পর্কে। বিশ্বের এই দুই বৃহৎ গণতন্ত্র যারা দুজনেই সন্ত্রাসবাদের বলি তারা এই সমস্যা মোকাবিলায় একযোগে কাজ করার জন্য নীতি নির্ধারণে ব্রতী হয়।

বুশ প্রশাসনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্বতন শত্রুতা যাতে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় সেই ব্যাপারে আমেরিকা যত্নশীল। আমেরিকা উপলব্ধি করে যে তার অভিপ্রেত বিশ্ব ব্যবস্থায় সে যতগুলি রাষ্ট্রকে নিজের পক্ষে টানতে পারবে ততই তার সুবিধে কিন্তু কিছু রাষ্ট্র কিছুতেই আমেরিকার পক্ষে আসতে চাইবে না। তাদের আভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতা এবং ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থান আমেরিকার পক্ষ নেওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আমেরিকার বিদেশনীতির আরেকটি কৌশল হল যে আমেরিকা যদি অসহযোগিতা বা বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তাহলে আমেরিকা একমুহূর্ত দেরী না করে 'go it alone' (একলা চল রে) নীতি অবলম্বন করবে। এর কারণ আমেরিকা বিশ্বাস করে বিশ্বের নিরাপত্তা আমেরিকার সামরিক ক্ষমতরা উপর নির্ভরশীল। বুশ প্রশাসন খোলাখুলিভাবে মনে করে আমরিকার নিরাপত্তা স্বার্থ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে গিয়ে প্রাধান্য পাবে। এর ফলে সমালোচকরা এটিকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

১.৫ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে যে বিধ্বংসী হামলা World Trade Centre-এর উপর হয় এবং তা এই বিশাল twin towers দুটিকে কার্যত গুঁড়িয়ে দেয়। একটি ছিনতাই করা বিমান দিয়ে নিউ ইয়র্কের WTC-র উপর হামলা চালানো হয়। Penagon-ও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। এই দুটি হামলায় মোটের উপর ৩০০০ মানুষ নিহত হয়। বুশ প্রশাসন সেই সময়ে মাত্র ৮ মাস কার্যকাল পূর্ণ করেছিল এবং এই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর নীতি গ্রহণ করেছিল আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কারণ আফগানিস্তান তালিবান গোষ্ঠী আলকায়দার প্রতিষ্ঠাতা ওসামা-বিন-লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছিল আর এই আল কায়দাই এই বিধ্বংসী হামলা ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আমেরিকার উপর সংঘটিত করেছিল। আমেরিকার ইউরোপীয় ও অন্যান্য জোটসঙ্গী আমেরিকার আফগানিস্তান অভিযানে যুক্ত হয়। এর ফলস্বরূপ তালিবানরা পর্যুদস্ত হয় এবং আমেরিকা হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বে নিজের পছন্দসই সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তালিবানদের বিরুদ্ধে আমেরিকার অভিযানের মধ্যে দিয়েই শুরু হয় 'War on terror' (সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) যেটিকে আবার আমেরিকানরা ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রকারান্তর বলে অভিহিত করে। রাষ্ট্রপতি বুশ ঘোষণা করেন যে এটি একটি মতাদর্শগত যুদ্ধ এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যার লক্ষ্য স্বাধীনতা ধ্বংস করা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বুশ প্রতিশ্রুতি দেন যে এই নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে আমেরিকা সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। এই নতুন যুদ্ধের উদ্দেশ্য শত্রুকে পর্যুদস্ত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ও স্বাধীনতার আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়া।

এই সেপ্টেম্বর ৯/১১-এর হামলা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইসলামিক বিশ্বে যে উগ্রপন্থা এবং সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দেয় তার একটি কারণ অবশ্যই পশ্চিমী দুনিয়ার বিশেষত আমেরিকার সর্বব্যাপী একাধিপত্য। এই একাধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে পরাকৌশলী, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে। ইসলামিক দুনিয়া বিশেষত আরব দুনিয়া ভীষণভাবে আমেরিকার এই একাধিপত্যকে তিক্ততার

দৃষ্টিতে দেখে। এর ফলে ইসলামিক দুনিয়ায় জন্ম নিয়েছে চরমপন্থা ও উগ্রবাদের নানাবিধ আকার। যদিও বুশপ্রশাসন সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ করার কৌশল অবলম্বন করেছিল। কিন্তু বহুক্ষেত্রে ইসলামিক দুনিয়া সেটিকে ইসলাম ও ইসলামিক মূল্যবোধের উপর আঘাত বলে গণ্য করে। এই ধারণা স্পষ্ট রূপ পায় যখন বুশ আফগানিস্তানকে আক্রমণ করার পর আবার ইরাক আক্রমণ করে। এই আক্রণের মূল লক্ষ্য ছিল সাদ্দাম হুসেন কারণ তাঁর সঙ্গে আলকায়দার যোগ দেখেছিল আমেরিকা।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইরাক এখন মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। সৌদি আরবের পরে ইরাকে দ্বিতীয় বৃহৎ খনিজ তৈলের ভাণ্ডার আছে। আশিরদশক থেকে দেখা যায় ইরাকের প্রতি আমেরিকার কূটনীতি অনেক রকম কৌশল অবলম্বন করেছে। এই সময় সাদ্দাম হুসেনের শাসনের অধীনে ছিল ইরাক। তার শাসনকালের খতিয়ান টানলে দেখা যায় যে তিনি এক কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা চালাতেন এবং তাঁর সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। শিয়াদের প্রতি তাঁর মানবাধিকার লঙ্ঘন (সাদ্দাম নিজে সুন্নি ছিলেন), তাঁর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের প্রতি আগ্রাসন যেমন ইরানের প্রতি (আশির দশক) এবং তার কুয়েত আক্রমণ ও অধিগ্রহণ, সব মিলিয়ে তাঁকে আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি একটি ব্যাপক ভীতি সঞ্চারক হিসেবে প্রতিভাত করেছিল। মনে রাখতে হবে যে আশির দশকে সাদ্দামকে মদত যুগিয়েছিল আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় জোটসঙ্গীগণ কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল সেই সময়কার ইরান। এর কারণ ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পরে ইরানের এক ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। ফলস্বরূপ দেখা যায় ১৯৮০-৮৮ সাল পর্যন্ত যে ইরান-ইরাক যুদ্ধ চলেছিল, সেই যুদ্ধে আমেরিকা ইরানের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ইরাকের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তবে ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত আক্রমণ পরিস্থিতি বদলে দেয়। কুয়েতও খনিজ তেলের সম্ভারে পরিপূর্ণ একটি দেশ। ইরাকের কুয়েত আক্রমণের ফলস্বরূপ ১৯৯১ সালের Gulf War সংঘটিত হয়। আমেরিকা তার ইউরোপীয় জোটসঙ্গীদের সাথে রাষ্ট্রপুঞ্জের সমর্থনে সামরিক আক্রমণ চালায় ইরাকের উপর। এ আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল কুয়েতের মাটি থেকে ইরাককে উৎখাত করা। রাষ্টপুঞ্জ, আমেরিকার চাপেই ইরাকের রাসায়নিক ও জৈবিক মারণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিরোধের ব্যবস্থা করে এবং অবশেষে ইরাকে পারমাণবিক অস্ত্র পরিকল্পনার পূর্ণরূপে পরিসমাপ্তি ঘটায়।

জর্জ বুশ রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েই ইরাক এবং তার সঙ্গে ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে 'Axis of Evil' হিসেবে চিহ্নিত করলেন ও সাদ্দাম হুসেনকে তাঁর লক্ষ্যবস্তু করলেন কারণ সাদ্দামকে তিনি মনে করতেন ৯/১১ সন্ত্রাসবাদীদের মদতদাতা। বুশ ইরাক আক্রমণ করলেন ব্রিটেন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জোটসঙ্গীদের নিয়ে (যদিও ফ্রান্স ও জার্মানি বিরোধীতা করেছিল)। যে ছুতোয় ইরাক আক্রমণ করা হল তা অভিনব। সাদ্দাম নাকি Weapons of Mss Destruction (WMDs)-এর বিশাল সম্ভার মজুত করেছে এই অজুহাতে আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জের পরীক্ষকরা এইরকম কোনো অভিযোগ সমর্থন করেনি। ইরাকের পক্ষে এই যুদ্ধ বিভীষিকাময় হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। তবে আমেরিকা তার উদ্দেশ্য সাধন করতে পেরেছিল। সাদ্দাম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আমেরিকা সফল হয়েছিল। আফগানিস্তানের মত আমেরিকা অনুগামী এক সরকার ইরাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইরাক সম্পূর্ণ রূপে আমেরিকার অধীনে চলে যায়। বুশের উত্তরাধিকারী বারাক ওবামা ক্ষমতায় এলে তবে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে কোনো প্রকার WMD ইরাকে এখনও পাওয়া যায়নি। আসলে তাদের মতে আমেরিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইরাকের তেল ভাণ্ডার এবং সমস্ত তেল ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ অঞ্চলে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করা। আমেরিকার আরও একটি লক্ষ্য ছিল সৌদি আরবের তেলের দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

হ্রাস করা এবং ইরাককে সেই কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাওয়া যেখান থেকে তেলের দাম বিশ্বের বাজারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ইরাক। তবে মোটের উপর ইরাক, ইরান এবং সিরিয়া আমেরিকার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের নজির স্বরূপ হয় এবং আজ এই অঞ্চলটি ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিচরণভূমি হয়ে দেখা দিয়েছে।

বুশের পরবর্তীকালে যখন ওবামা রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেন তখন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রভুত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেন। যখন ওবামা সেনেটর (Senator) ছিলেন তখনও তিনি ইরাক যুদ্ধকে 'dumb war' বলে অভিহিত করেছিলেন। যখন ওবামা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লড়ছিলেন তখনও তিনি ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। যখন ওবামা White House-এ পদার্পণ করলেন তখন তিনি এক স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি এক বিনম্র আমেরিকার ধারণা পোষণ করেন যেটি খুব গভীরভাবে Core interest-এর প্রতি মনোনিবেশ না করে বেশি মাত্রায় আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতে প্রলেপ দেবে। এর কারণ বিশ্বব্যাপী মন্দা (২০০৮ সাল থেকে শুরু) আমেরিকার অর্থনীতিকে বেসামাল করে দেয়। ওবামা যদিও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলেছিলেন কিন্তু তিনি যে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় তালিবানদের উপর কঠোর আঘাত হানবেন আফগানিস্তানে যে কথা বলতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। তবে মোটের উপর তিনি নিজেকে সন্তুষ্টিবিধায়ক ও শান্তি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে প্রতিভাত করার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের প্রথম দিন থেকে ওবামা ঘোষণা করেছেন তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়, কখনও বা ওয়াশিংটনে, কখনও বা প্রাগে আবার কখনও কাইরোতে যে এমন এক রূপান্তরিত বিশ্ব ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে—'a revolutionary world' যেখানে আমেরিকা 'improbable, sometimes impossible things' করতে পারবে। কিন্তু সমালোচকদের মতে আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ত আমেরিকাকে তার বৈদেশিক নীতিতে 'interven tionist policy' (হস্তক্ষেপ নীতি) অনুসরণ করতে সক্ষম করবে না। ওবামাকে অবশ্য আন্তরিক লেগেছে যখন উনি ইরানের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করবেন বলেন যার ভিত্তি হবে 'mutual respect'। অন্যান্য প্রতিযোগী বা বিরোধী রাষ্ট্রের প্রতি তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলেন তবে তাদেরও যথাযথভাবে প্রতিদান দিতে হবে। যুক্তি, নগ্ন ক্ষমতার বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হবে এবং নয়া-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দেওয়া হবে। এটিকে বিশ্বস্তরে আশা ও পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে বলা যেতে পারে।

তবে বাস্তব কিন্তু অন্য পথে চলেছে। ওবামা নিজের প্রতিশ্রুতি মত ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে ইরাক শীঘ্রই আল-কায়দা জঙ্গী গোষ্ঠীর স্বাধীন বিচরণভূমি হয়ে উঠে। এই জঙ্গীগোষ্ঠী হাজার হাজার নিষ্পাপ মানুষের প্রাণ সংহার করেছে যে মুহূর্তে আমেরিকা তার সৈন্য প্রত্যাহার করেছে। তবে জানুয়ারি ২০১১ থেকে 'আরব বসন্তের' (Arab Spring) হাত ধরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। টিউনিশিয়া থেকে জর্ডন, বলতে গেলে সমগ্র আরব দুনিয়া এই 'আরব বসন্ত' দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই 'আরব বসন্তের' লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং এই বিপ্লবের ফলে আরব দুনিয়ার বহু কর্তৃত্বপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা ক্ষমতাচ্যুত হয় যেমন ইজিপ্টে হয়েছে। তবে আরব দুনিয়ার এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে গেছে এবং বহু ক্ষেত্রে ধার্মিক ও জাতিগত উন্মাদনারও জন্ম দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। আশা এখন ভীতিতে পরিণত হয়েছে এবং পরিবর্তন আতঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে এই অঞ্চলে ওবামা তাঁর পূর্বসূরীদের মতই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। এই নয়া চ্যালেঞ্জ এমন এক অঞ্চলে উদ্ভুত হয়েছে যেখানে আমেরিকার নিরাপত্তা বিষয়ক উদ্বেগ চূড়ান্ত। ওবামার সামনে এখন প্রশ্ন যে সিরিয়ার রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করবে কিনা। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ বর্বরতার সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং এই গৃহযুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্রও ব্যবহার হয়েছে যা

মানুষের এমনকি শিশুদেরও মৃত্যু ডেকে এনেছে। ওবামাও দ্বিধান্বিত এবং মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযান নিয়ে বিড়ম্বনায় ভুগছেন।

আরব দুনিয়ায় গত তিন বছর ধরে যেভাবে ঘটনার গতি প্রকৃতি এগোচ্ছে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার ভূমিকা একদিকে যেমন প্রশংসা পেয়েছে অপরদিকে সেরকম সমালোচনার ঝড়ও তুলেছে। ওবামার সমালোচকরা তাকে ভীরু ও দুর্বল বলে অভিযোগ করেছেন। এমনকি নব্বই-দশকের বলকান সঙ্কটের সময়েও রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন যখন এই সঙ্কটে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকেন, তাঁকেও ঐ ধরনের অভিযোগ শুনতে হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে এক অগ্রজ স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্তা অভিযোগ করেন যে 'We simply don't have the leverage, we dont have the influence (or) the inclination to use military force.' ওবামাকে আরও সমালোচনা শুনতে হয় যখন ইজিপ্টের গণতান্ত্রিক সরকারকে অপসারণের জন্য সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তখন। ওবামা কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার দরুণ মানবতাবাদী সমালোচকেরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগও করেছেন এবং তাঁরা চেয়েছিলেন সিরিয়ায় আমেরিকা যেন যুদ্ধ বন্ধ করতে উদোগ নেয়।

তবে ওবামার স্বপক্ষের সমর্থনকারীরা আবার ওবামার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। কারণ তাঁরা মনে করছেন, যে আমেরিকা বিরোধী ভাবাবেগ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন এবং যে অর্থনৈতিক সঙ্কটময় বাজেটের মধ্যে তাকে কাজ করতে হচ্ছে, তদুপরি যেভাবে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন স্বদেশে, এসবের মধ্যে থেকে তিনি তাঁর সবথেকে ভাল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাছাড়া স্বদেশেও বিরুদ্ধ জনমত গড়ে উঠছে।এই সব অমীমাংসিত বিবাদে জড়িয়ে পড়ার জেরে আমেরিকানদের অর্থ ও প্রাণ দুইই বিপন্ন হচ্ছে বলে এমন একটা জনমত গড়ে উঠছে যেখানে এই উপলব্ধি দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার ইচ্ছা জোর করে বিশ্বের সমস্ত রকম সমস্যায় আরোপ করা যাবে না।

তবে ওবামা নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে কার্যভার সামলাতে শুরু করেননি। তিনি যেরকম ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন ইরাক থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের, সেইরকম কিন্তু আফগানিস্তানের বেলায় করেননি। আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে তিনি কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন কারণ আফগানিস্তান ছিল আল-কায়দার জন্মস্থান। ওবামা আফগানিস্তানে মার্কিন সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং হামিদ কারজাইয়ের সরকারকে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। পাকিস্তানের সঙ্গেও ওবামা বিশেষত গোড়ার দিকে সুসম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী হন। পাকিস্তান আমেরিকার দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী এবং পাকিস্তানের কাছেই আছে আফগান সমস্যার চাবিকাঠি। সময় যতই যাচ্ছে ততই তালিবানী জঙ্গীপনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে আমেরিকা ও তার ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সৈন্য নিযুক্ত করেছে। তবে এখন একটি উপলব্ধি আমেরিকার প্রশাসনিক মহলে জোরালো হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকেও সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। পাকিস্তানকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করা যাচ্ছিল না এবং এটি প্রমাণিত হয়েছিল আমেরিকার SEAL অপারেশনের সময়। এই SEAL অপারেশনের চূড়ান্ত রূপ ছিল ওসামা বিন লাদেনের নিধন ২০১১ সালের মে মাসে। পাকিস্তান বরাবর পাকিস্তানের মাটিতে ওসামার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এসেছে এবং তার মৃত্যুর পরও জানিয়েছে যে পাকিস্তান জানতই না ওসামার গোপান ডেরা কোথায় ছিল। ওবামার রাষ্ট্রপতি কার্যকালের প্রথম পর্যায় শেষ হওয়ার কিছু আগে তিনি ঘোষণা করেন যে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করবেন। কিছু অল্প সংখ্যক সৈন্য প্রতিকী হিসেবে আফগানিস্তানে নিয়োজিত থাকবে। জনমতের চাপে কিছু ইউরোপীয় রাষ্ট্র যেমন ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ও অন্যান্য রাষ্ট্রও একই অভিমত পোষণ করেছে। সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে

যাতে আফগানিস্তান আবার জঙ্গীগোষ্ঠীর সুরক্ষিত আশ্রয় স্থল না হয়ে ওঠে এবং তালিবান জঙ্গী গোষ্ঠী আবার না আফগানিস্তান অধিগ্রহণ করে নেয় সেইজন্য দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আফগানিস্তানের সঙ্গে (যার মাধ্যমে আশরফ ঘানীকে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে) NATO-র। ৩০ সেপ্টেবর ২০১৪ আমেরিকা ও আফগানিস্তানের Bilateral Security Agreement স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে আমেরিকার ৯৮০০ সৈন্য আফগানিস্তানে অবস্থান করবে ২০১৫ সালে এবং অর্ধেক হবে পরবর্তী সালে এবং ২০১৬ শেষের দিকে সামান্য প্রতীকী অবস্থান থাকবে মার্কিন সৈন্যদের। NATO-আফগান চুক্তি অনুযায়ী ৪০০০ থেকে ৫০০০ সৈন্য অবস্থান করবে ২০১৪ সালের পরবর্তীকালে। তাহলে মোটরে উপর আফগানিস্তানে বিদেশী সৈন্যসংখ্যা হবে ১৪৮০০। আমেরিকা-আফগান চুক্তির স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল আমেরিকার উদ্যোগে ৩৫০০ আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণের অনুমোদন। আরও একটি উদ্দেশ্য হল তালিবান দ্বারা আফগানিস্তানের পুর্নঅধিগ্রহণ নিরোধ করা। তবে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সাধনের ফলাফল ভবিষ্যৎ বলে দেবে।

আরও একটি ঘটনা আমেরিকার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে এবং তা হল ২০১৪ সালের ইউক্রেন সমস্যা। সমসার সূত্রপাত এথনিক ইউক্রেনবাসীদের সঙ্গে রুশ-ভাষীদের বিরোধ। এথনিক ইউক্রেনবাসীরা আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে এবং রাশিয়ান ভাষী ইউক্রেনবাসীরা চায় রাশিয়ার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক। সুতরাং ইউক্রেন সমস্যার মূল কারণ হল বিভাজিত আনুগত্য এথনিক ইউক্রেনবাসীদের সঙ্গে রুশ-ভাষী ইউক্রেনবাসীদের। এমনকি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রুশ-ভাষী ক্রাইমিয়ার উপদ্বীপবর্তী মানুষজন রাশিয়ায় সংযুক্তিকরণের পক্ষে বিপুল ভোট দেয়। এর ফলে রাশিয়া ক্রাইমিয়া অধিগ্রহণ করে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে। ফলস্বরূপ রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং আমেরিকা রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। রুশ-ভাষী পূর্ব ইউক্রেনবাসীরাও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে এবং এর ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ইউক্রেনে।

এই ইউক্রেন সঙ্কট থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে সাবেকীভাবে যে অঞ্চলকে রাশিয়া নিজের প্রভাবের বৃত্তের মধ্যে ভেবে এসেছে সেখানে পশ্চিমী দখলদারী সে বরদাস্ত করবে না। বিশ্বের গণমাধ্যমগুলি এটিকে আরেক ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হিসেবে আলোচনা করতে শুরু করেছে। আমেরিকা ও EU কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কোনোভাবেই রাশিয়ার ইউক্রেন নীতি পাল্টাতে পারেনি এবং অচলাবস্থা চলছেই।

১.৬ আমেরিকার বর্তমান অবস্থান

একবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার বিদেশীতিতে বৈপরীত্যের ছবি ধরা পড়ে। একদিকে যেমন আমরিকা তার বিশ্বব্যাপী স্বার্থরক্ষার প্রতি যত্নবান এবং তার ফলে মার্কিন একাধিপত্য বজায় রাখার প্রতি সচেষ্ট অপরদিকে স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও বহু কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থাকে আমেরিকা মদত দেয়, বহু দেশে আমেরিকা তার সামরিক উপস্থিতি বজায় রাখছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়ে সমর্থন জানালেও নিজের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে আমেরিকা অনেক সময় রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করছে। যে অনুদান আমেরিকা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দেয় তার পরিমাণ ইউরোপীয় দেশগুলির অনুদানের পরিমাপে খুবই স্বল্প। পরিবেশগত বিষয়ের ক্ষেত্রেও আমেরিকা খুবই তৎপর হলেও Kyoto Protocal-কে আমেরিকা অনুসমর্থন (ratify) করেনি। আমেরিকা তার প্রতিরক্ষা বাজেটে বিশাল বরাদ্দ ধার্য করে এবং

মার্কিন সামরিক/প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যেকোনো মুহূর্তে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে আমেরিকার উপর পারমাণবিক হামলা হলে আমেরিকা তার যথোপযুক্ত প্রতিরোধ করতে পারবে। আমেরিকা IMF এবং World Bank-এ তার কর্তৃত্বের জায়গা ধরে রেখেছে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকা আজও একটি 'বৃহৎশক্তির' মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে।

তবে বর্তমানে বহু বিশেষজ্ঞ তাদের এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একটি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। আমেরিকা এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঋণগ্রস্ত রাষ্ট্র এবং ২০৫০ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি মার্কিন অর্থনতিকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমেরিকার শক্তির অন্যান্য সীমাবদ্ধতা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ইরান, বিশেষত ইরানের পারমাণবিক ক্রিয়াকলাপ এবং উত্তর কোরিয়া আমেরিকার গুরুতর মাথা ব্যথার কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে একবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যই চীন। চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের প্রতি আমেরিকার বিদেশনীতিতে সন্ত্রম ও নিয়ন্ত্রণের নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে আমেরিকার বাজারের উপর চীনের নির্ভরশীলতা দুই শক্তির মধ্যে কোনোরকম সংঘাতকে ভবিষ্যতে প্রতিরোধ করবে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে বর্তমান বিশ্বে আমেরিকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী একক 'বৃহৎশক্তি' নয়। ঠাণ্ডা-যুদ্ধোত্তর কালে নব্বই-এর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক 'বৃহৎশক্তি' ছিল। বর্তমান বিশ্বে সামরিকভাবে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা একটি প্রভূত শক্তিধর দেশ সেটা অনস্বীকার্য। তবে সমসাময়িক বিশ্বের জটিলতা এবং আমেরিকার নানাবিধ আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে আমেরিকার শক্তিকে একবিংশ শতাব্দীতে হ্রাস করেছে।

১.৭ সারাংশ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পরবর্তীকালে একমেরু পৃথিবীতে আমেরিকা একমাত্র 'বৃহৎ শক্তি' হিসেবে উদ্ভূত হয়। নব্বই-এর দশক ধরে বৃহৎ অর্থনীতি ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী নিয়ে আমেরিকা বিশ্বরাজনীতিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ঠাণ্ডা-যুদ্ধোত্তর সময়কালে আমেরিকার বিদেশনীতি তিনজন রাষ্ট্রপতি শাসনকালে নির্বাহিত হয়। তাঁরা হলেন—বিল ক্লিন্টন, জর্জ বুশ ও বর্তমান সময়ে বারাক ওবামা। শুরুর দিন থেকেই আমেরিকার বিদেশনীতির পরিকল্পকগণ মার্কিন আধিপত্য বিস্তারের প্রতি নজর দিয়েছিলেন এবং এই তিন রাষ্ট্রপতিগণের বৈদেশিক নীতিও এই বিশাল পরিকল্পনার থেকে পৃথক ছিল না। তবে অনেকে মনে করেছিলেন যে ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্ব অনেক বেশি শান্ত ও নিরাপদ হবে কিন্তু দেখা গেল একদম বিপরীত অবস্থা। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের অবসানের পর বহু জটিলতা ও অসুবিধা দেখা দিল। নৃকুলগত সংঘর্ষ, সন্ত্রাসবাদ ও পরিবেশগত সঙ্কট এবং অন্যান্য অদৃষ্টপূর্ব সমস্যাগুলি আমেরিকার বৈদেশিক নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা যেমন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, আরব-বসন্ত এবং ইজরায়েল-প্যালেস্তাইনের অমীমাংসিত সমস্যা প্রমাণ করে আমেরিকার বৈদেশিক নীতির সীমাবদ্ধতা। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান, ইউক্রেন ও চীনের উত্থান, ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘর্ষ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলায় আমেরিকার ব্যর্থতা একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছে সমসাময়িক বিশ্বে আমেরিকার স্থায়ী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে।

১.৮ প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী—

১. একমেরু বিশ্বে আমেরিকার ক্ষমতার প্রকৃতি আলোচনা করুন।

২. বিল ক্লিনটন রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন আমেরিকার বিদেশনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. কেন আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে? সেটা কি সফল হয়েছে? আপনার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী—

১. সমসাময়িক বিশ্বে আমেরিকার অবস্থান আলোচনা করুন।

২. আপনি কি মনে করেন ওবামার রাষ্ট্রপতি কার্যকালে আমেরিকার বিদেশনীতি ব্যর্থ হয়েছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী—

১. মার্কিন বিদেশনীতির চারটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন।

২. টীকা লিখুন—NAFTA

৩. পুরো কথা লিখুন—WMD; PLO; NATO.

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. James F. Hoge, Gideon Rose, *American Foreign Policy: Cases and Choices,* Council of Foreign Relation, 2003
2. Ivan Eland, *The Empire has no Clothes: US Foreign Policy Exposed,* 2004.
3. F. Cameron, *US Foreign After Cold War,* Routledge
4. Bruce W. Jentleson, American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century
5. Seymore Hersh, *The Price of Power*
6. Purusottam Bhattacharya and Anindyojoti Majumder, ed., *Antarjatik Samparker Ruprekha, Setu,* 2007 (in Bengali)

একক ২ ☐ সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপ

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ ঐক্যের প্রথম প্রয়াস
২.৪ রোম চুক্তি ও EEC-র প্রতিষ্ঠা
২.৫ EEC-র প্রকৃতি
২.৬ EEC-র সম্প্রসারণ
২.৭ EU-এর বিশ্বব্যাপী ক্রিয়াত্মক ভূমিকা
২.৮ EU-এর সম্মুখে চ্যালেঞ্জসমূহ
২.৯ সারাংশ
২.১০ প্রশ্নাবলী
২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের ঐক্যের প্রয়াস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।
- রোমচুক্তি ও EEC-র প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতি ও সম্প্রসারণ বিষয়ে সাধারণ ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।
- EU-এর বিশ্বব্যাপী ক্রিয়াত্মক ভূমিকা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সহায়তা করা।
- EU-এর বর্তমান চ্যালেঞ্জসমূহের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।

২.২ ভূমিকা

বিশ্বরাজনীতিতে ইউরোপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই অধ্যায়টিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপের বিশ্বরাজনীতিতে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে পুনরুত্থান বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে এইভাবে—ঐক্যের প্রথম প্রয়াস, রোমচুক্তি ও EEC-র প্রতিষ্ঠা, EEC-র প্রকৃতি, EEC-র সম্প্রসারণ, ই.ইউ-এর বিশ্বব্যাপী ভূমিকা, বর্তমানে ই.ইউ-র চ্যালেঞ্জসমূহ এবং অবশেষে সারাংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ইউরোপের পুনরুত্থান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেকার সময়েও ইউরোপ কিন্তু

বিশ্বরাজনীতির স্নায়ুকেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হত এর কারণ ছিল ইউরোপের কয়েকটি বৃহৎ-শক্তি—যথা গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া ও কিয়দংশে ইতালিও এই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে কার্যত শ্মশানে পরিণত করেছিল—যেমন জার্মানি ফ্রান্স এবং ইতালিকে। এই সময় দুটি অ-ইউরোপীয় শক্তির উত্থান ঘটে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই দুটি বৃহৎ শক্তিধর দেশ তাদের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদে এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেবল ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্রের 'বৃহৎ শক্তির' মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ছয় বছর ব্যাপী বিধ্বংসী যুদ্ধ সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হল এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের প্রধান সমস্যাগুলির আবরণ উন্মোচন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিয়ন্ত্রণহীন আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের সমস্যা। সুতরাং যদি বলা যায় বিংশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ আদতে ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণহীন জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি, তাহলে কোনো ভুল হবে না।

২.৩ ঐক্যের প্রথম প্রয়াস

উপরে আলোচিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে মনে রেখে ইউরোপের ঐক্যের দিকে প্রথম প্রয়াসের মূল্যায়ন করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইউরোপে মূলতঃ যে চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে তার মূল ধারণা ছিল দীর্ঘদিনের পুরনো এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দূর করে সহমতের মাধ্যমে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং তা করতে গিয়ে অবশ্যই যুদ্ধ পরবর্তীকালের বাস্তবতাকে মনে রাখা। ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপ আমেরিকার নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ও পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে। এই বিভাজনের ফলে কার্যত সংহতির প্রয়াস ও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের উত্থানের সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঐক্যের প্রয়াস পশ্চিম ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৪৮ সালে ইউরোপীয় সহযোগিতা পরিষদ (Organization for European Economic Cooperation–OEEC) গড়ে ওঠার মধ্যে দিয়েই পশ্চিম ইউরোপের সংহতির প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়। OEEC -র প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) অনুযায়ী প্রদত্ত মার্কিন সাহায্যের সঠিক বন্টনের জন্য একটি সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। এই প্রক্রিয়া রূপায়ণের মাধ্যমে OEEC ইউরোপে বৃহত্তর সংহতি সাধনের ভিত্তি স্থাপন করে। পশ্চিম অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (European Economic Communiy) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই OEEC-এর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু ইউরোপের এই আন্তঃসরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর জায়গায় আরও radical সংহতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। এই মতবাদের সমর্থনে যে দেশগুলি ছিল সেগুলি হল ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস এবং ইতালি। এরা মনে করল যে শিল্প, বাণিজ্য, শক্তি, পরিবহণ প্রভৃতির মতো কিছু বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কয়েকটি সংস্থা গড়ে তোলাই যথেষ্ট নয়। সর্বাপেক্ষা জরুরী এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যেটি তার এলাকাভুক্ত দেশগুলির মতৈক্যের বিষয়গুলি সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করতে পারবে এবং এর সদস্য-রাষ্ট্রগুলি তাদের স্বীয় এলাকায় এগুলির রূপায়ণ করতে বাধ্য থাকবে।

১৯৫১ সালে European Coal & Steel Community (ECSC)-র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই চিন্তাধারার প্রথম সফল বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জার্মান সমস্যার সমাধান খোঁজার উদ্দেশ্যেই ECSC স্থাপনের মূল পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

মূলতঃ ফরাসি-জার্মান দ্বন্দ্বই ছিল আধুনিক ইউরোপের সমস্যার প্রধান কারণ। এই দুটি দেশের মধ্যে শত্রুতা দূর করে তবেই একটি শান্তিপূর্ণ, ঐক্যবদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী ইউরোপ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালের মে মাসে ঘোষিত শুম্যান পরিকল্পনা (এই পরিকল্পনার প্রধান রূপকার ফরাসি বিদেশমন্ত্রীর নামাঙ্কিত যিনি ফারসি রাজনীতিজ্ঞ Jean Monnet-এর তত্ত্বাবধানে এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন) অনুযায়ী ফ্রান্স ও জার্মানিকে তাদের কয়লা এবং ইস্পাতের উৎপাদন একটি উচ্চ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অন্য দেশগুলি আগ্রহ বোধ করে কারণ তাহলে তারাও এই প্রয়াসে সামিল হতে পারে। বেলজিয়াম, হল্যান্ড লুক্সেমবার্গ এবং ইতালি এই প্রকল্পে যোগ দেয়। ব্রিটেন এই প্রয়াসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে কারণ ব্রিটেন মনে করে এই পরিকল্পনা জাতীয় সার্বভৌমিকতায় হস্তক্ষেপ করছে ও ব্রিটিশ জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

ECSC যেটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপরোক্ত ছয়টি সদস্য দেশের মধ্যে কয়লা, কোককয়লা, ইস্পাত এবং লৌহপিণ্ড এবং উপজাত লৌহের বাণিজ্যের পথে সব বাধা দূর করা। ECSC- উচ্চতর কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে প্রভূত অধিজাতীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এই সংস্থার হাতে কয়লা এবং ইস্পাতের মূল্য নির্ধারণের অধিকার এবং চুক্তির নিয়মভঙ্গকারীর উপর জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রযুক্তির উন্নতির কারণে বেকার হয়ে পড়া শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও তাদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক সাহায্য বরাদ্দ করে এই সংস্থা। কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদনের উপর লেভি আরোপ করে এই অনুদানের অর্থ সংগ্রহ করা নির্ধারণ করে।

২.৪ রোম চুক্তি ও EEC-র প্রতিষ্ঠা

ইউরোপের বিভিন্ন মহলে একটি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের ধারণা বহুকাল ধরেই চলে আসছিল। ECSC-র একটি সফল পরীক্ষণ এই বিষয়টকে নিয়ে উৎসাহ সৃষ্টি করে। সেই লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালের ২০ মে বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গের সরকারগুলি (BENELUX Governments) ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালির সরকারে কাছে স্মারকলিপি পেশ করে একটি ইউরোপীয় সাধারণ বাজার গঠনের অনুরোধ জানায়।

১৯৫৫ সালের ২ জুন ইতালির মেসিনায় ছয়টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মিলিত হন এই প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে এবং এই বিষয়ের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করতে একটি আন্তঃসরকারি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৫ সালের বসন্তে ঐ কমিটি তার রিপোর্ট পেশ করে। এর উপর ভিত্তি করেই ১৯৫৭ সালের ২৫ মার্চ European Economic Community (EEC) এবং European Atomic Energy Agency (EURATOM) গঠন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ইতালির রোমে।

পরে এই ছয়টি দেশ চুক্তিগুলি অনুমোদনও করে। ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই সংস্থাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে।

EEC-র অঙ্গীকার ছিল ইউরোপীয় জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলা। EEC-র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত রোমচুক্তির ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে কতগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। একটি অভিন্ন সত্তার ধারণার ভিত্তিতে EEC সকল অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রচেষ্টাসমূহকে তার আওতাভুক্ত করবে। এর উদ্দেশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থরক্ষা ছাপিয়ে একটি সাধারণ স্বার্থের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা। ২৩৭ নং ধারায় বলা আছে যে EEC-র উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সমূহের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে অন্য দেশও এই গোষ্ঠীতে যোগদান করতে পারে। রোমচুক্তির ২নং ধারায় EEC-র বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। ২নং ধারা অনুযায়ী:

> 'গোষ্ঠীর প্রধান কাজ হবে একটি সাধারণ বাজার প্রতিষ্ঠা এবং সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রগতিমূলক সমন্বয়ের মাধ্যমে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ঐক্যবদ্ধ বিকাশ ঘটানো, ক্রমাগত এবং ভারসাম্যযুক্ত সম্প্রসারণ, স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নয়ন এবং সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা।'

গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-রাষ্ট্রগুলি একটি শুল্ক ইউনিয়ন (Customs Union) প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি দেয় । শুল্ক ইউনিয়ন হল এমন একটি ব্যবস্থা যার দ্বারা অংশগ্রহণকারী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক এবং অন্যান্য নিষেধগুলি দুর করতে এবং তৃতীয় কোনও দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন করতে এবং সাধারণ বাহ্যিক শুল্ক আরোপ করতে সম্মত হয়। ব্যক্তি, সেবাকার্য এবং পুঁজির স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করতে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি এবং আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেও তারা সম্মত হয়। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সংযোগ আছে এমন সব আর্থিক গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে EEC চুক্তি ছিল মূলত একটি কাঠামো। এর দ্বারা প্রণীত নীতির ভিত্তিতে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব ছিল যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে নীতিনির্ধারণ করা। EEC প্রণীত বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে থেকে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে বিস্তৃত করতে রাজি হয়।

২.৫ EEC-র প্রকৃতি

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেছে যে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ছিল—প্রথাগত আন্তঃসরকারি সহযোগিতাকে ছাপিয়ে গিয়ে এক নতুন পদক্ষেপ। এই দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটে কতগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে যারা প্রচুর পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও সাধারণ কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। EEC-র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা যায়।

ইউরোপীয়ান গোষ্ঠীর একাদম শীর্ষে আছে European Council। এই European Council গঠিত হয় সদস্য—রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্বদের নিয়ে বিশেষতঃ সরকারের প্রধানরাই এই Council-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। এই European Council প্রতি ৬ মাসে মিলিত হয়ে পরের ৬ মাসের শীর্ষ বৈঠকের বিষয়সূচি নির্ধারণ করে। European Council-এর বৈঠকে ইউরোপীয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট, সদস্য-রাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রী ও একজন কমিশনের সদস্য উপস্থিত থাকেন। Council একটি রাজনৈতিক স্তরে নীতি নির্ধারণ ও যে বিষয়ে Council ও European Union-এর মতবিরোধ দেখা দেয় সেগুলির নিষ্পত্তির সভাস্থল।

Council ব্যতীত EEC-র মধ্যে আছে চারটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান—মন্ত্রী পরিষদ, কমিশন, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

এবং আদালত। এছাড়াও আছে একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি এবং হিসাব পরীক্ষকদের একটি সভা। কমিশন, Council এবং পার্লামেন্টের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গোষ্ঠীর সাধারণ নীতি প্রণীত হয়। অর্থনীতি ও সামাজিক কমিটি এই প্রক্রিয়ায় মূলতঃ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে। গোষ্ঠীর সমগ্র প্রক্রিয়াই আদালতের এলাকাভুক্ত। হিসাব পরীক্ষকদের সভার কাজ হল গোষ্ঠীর বাজেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গোষ্ঠীর নীতিনির্ধারণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া—একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং অপর দিকে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে এই প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক।

Council of European Union (মন্ত্রী পরিষদ) গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই মন্ত্রী পরিষদরে মধ্য দিয়ে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে এবং এগুলিকে একটি সাধারণ গোষ্ঠীগত স্বার্থে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়। পরিষদে সকল সদস্য-রাষ্ট্রের একজন করে মন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব থাকে। আলোচনার বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মন্ত্রী তাঁদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মূলতঃ বিদেশ মন্ত্রীরাই বেশিরভাগ সম্মেলনে যোগ দেন। তবে কৃষি, অর্থ, পরিবহণ, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি দপ্তরের মন্ত্রীগণও এইসব বিষয়ের আলোচনায় নিজেদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। যদিও রোম চুক্তিতে মন্ত্রিপরিষদের দায়িত্ব নির্বাহের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারা ব্যতীত আর কিছুর উল্লেখ নেই তবে ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠাতর নীতির বদলে ঐক্যমতের নীতিটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ ঐ বছর সংখ্যা গরিষ্ঠতার নীতির ভিত্তিতে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত ফরাসি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয় এই অজুহাতে ফ্রান্স নয় মাসের জন্য EEC-এর সকল প্রতিষ্ঠান বয়কট করে। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যদিও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলিতে ঐক্যমতের নীতিটিই প্রচলিত আছে। পরিষদে প্রতি ছয় মাস অন্তর সদস্য দেশগুলির একজন করে পর্যায়ক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। যে সদস্য-রাষ্ট্র থেকে সভাপতি নির্বাচিত হন, পরিষদের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্র সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

European Commission (কমিশন) একটি মৌলিক সংস্থা। ECSC-এর উচ্চ কর্তৃপক্ষের আদলেই এই সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছে। কিছু বিশ্লেষকের মতে ইউরোপীয় কমিশনকে ভবিষ্যতের একটি একক অধিজাতিক সম্প্রদায়ের প্রাথমিক পর্যায় বা ভ্রূণাবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই সংস্থা হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন প্রণয়নের উদ্যোক্তা ও সমন্বয়সাধনকারী। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনসমূহের প্রয়োগ বা রূপায়ণের পাশাপাশি কমিশন এই সংস্থার পরিচালনা ও নীতি-সংক্রান্ত নিয়মিত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করে, বিভিন্ন অর্থ সাহায্যের কর্মসূচিগুলির তদারক করে। উপরন্তু কতগুলি সুনির্দিষ্ট এলাকায় বিশেষতঃ প্রতিযোগিতা নীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে গোষ্ঠীর যে সম্প্রসারণ ঘটে তার ফলে সদস্য সংখ্যা হয় ২৮। কমিশনের সদস্যদের বলা হয় কমিশনার। তাঁরা সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা নিযুক্ত হন। রোম চুক্তি অনুযায়ী কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের দেশের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নিযুক্ত হন না, সাধারণ যোগ্যতার নিরিখে তাদের নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্ত হওয়ার পর, অবশ্যই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর, কমিশনের সদস্যগণ নিজেদের জাতীয় সরকার ব্যতিরেকেই সাধারণ গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করবেন আশা করা হয়। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি কমিশনারদের নিযুক্ত করলেও সংস্থা হিসাবে কমিশন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল। কেবল পার্লামেন্টই কমিশনকে বাতিল করে দিতে পারে।

কমিশনকে একজন সভাপতি নেতৃত্ব দেন যিনি পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। প্রত্যেক কমিশন সদস্য বিশেষ দায়িত্বভার প্রাপ্ত হন গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু দায়িত্বের এই বিভাজন সত্ত্বেও কমিশন

একটি 'College' হিসাবে কাজ করে এবং এর সকল কাজের জন্য যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

European Parliament (ইউরোপীয় পার্লামেন্ট) একমাত্র ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৯ সালের আগে এর সদস্যগণ নির্ধারিত 'কোটা' (quota) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জাতীয় আইনসভা দ্বারা মনোনীত হতেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ভোটদাতাদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হন। জনসংখ্যার পরিমাপ অনুযায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি MEP-এর (পার্লামেন্টের সদস্যগণ) সংখ্যা নির্ধারিত হয়। স্ট্রাসবার্গে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট অবস্থিত। তবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা খুবই সীমিত। পার্লামেন্টের ভূমিকা মূলতঃ পরামর্শদান এবং তত্ত্বাবধানমূলক। তবে কিছু নতুন চুক্তির মাধ্যমে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেটিকে বলে "co decision'। পার্লামেন্টের অধিকার আছে প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে পরামর্শদান করার ও সংশোধনী প্রস্তাব আনার। পার্লামেন্ট এখন গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান অঙ্গ। পার্লামেন্ট অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবের আকারে পার্লামেন্ট তার যে-সব অভিমত জানায় সেগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পার্লামেন্ট ইউরোপীয় গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বেশ কিছু ক্ষেত্রকে বিশেষত উন্নতিশীল দেশগুলির সাথে সম্পর্কের বিষয়টিকে প্রভাবিত করে।

Court of Justice (আদালত) লুক্সেমবার্গে অবস্থিত। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত প্রদানের অধিকারী। যে ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী নয় সেখানে আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত একটি কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগীয় সংস্থা হিসেবে কোনও গোষ্ঠীর গঠনকারী একক এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত মতামত জানায়। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একটি শক্তিশালী সংস্থা যার প্রধান কাজ হল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থগুলির মধ্যে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করা এবং গৃহীত আইনগুলির ব্যাখ্যা কেবল এই আদালতই দিতে পারে।

আদালতের বিচারপতির সংখ্যা ২৮। সদস্য-রাষ্ট্রের থেকে সাধারণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে এরা ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপীয় আদালতের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে অনেকে এই ক্ষমতার উৎস মূলে রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন। আদালতের প্রধান কাজ হল ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলির সঠিক রূপায়ণ নিশ্চিত করা। আদালতের সিদ্ধান্ত মানা বাধ্যতামূলক এবং এর বিরুদ্ধে আপীল করার কোনও ব্যবস্থা নেই। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইনগুলিকে সমানভাবে রূপায়িত করার বিষয়টিকে নিশ্চিত করে ইউরোপীয় সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে চলেছে এই আদালত।

ইউরোপীয় আদালত রোম চুক্তিতে একটি নয়া আইনগত ব্যবস্থার আখ্যা দিয়েছে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পাশাপাশি এর আছে স্বাধীন অস্তিত্ব এবং এদের উপর এর কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ আইনগত প্রভাব আছে। সাধারণভাবে জাতীয় আইনগুলির তুলনায় গোষ্ঠীর আইন অধিক প্রাধান্য লাভ করে। এইভাবে এই গোষ্ঠীর সদস্যভুক্ত দেশগুলির জাতীয় সার্বভৌমিকতা নিঃসন্দেহ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে যার পরিমাণ জাতীয় রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির তুলনায় অনেক বেশি। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আলোচনা করলে এর সত্যতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়। আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকল সংস্থার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। তবে সাধারণভাবে মন্ত্রীপরিষদ এবং কমিশনের মধ্যে আলাপ-আলোচনাই এই প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তরে জাতীয় এবং গোষ্ঠীগত উপাদানগুলি জড়িত থাকে। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় কমিশনের গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার সাথে প্রচুর পরামর্শ করার প্রয়োজন আছে। এর মূল লক্ষ্য হল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে একটি ব্যাপক মতৈক্য গড়ে তোলা। এই প্রস্তাবগুলিকে ইউরোপীয়

পার্লামেন্ট এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটিতে পেশ করা হয় তাদের অভিমতের জন্য।

আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় সদস্য-রাষ্ট্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করলেও EEC-র প্রেক্ষাপটে তারা তাদের সম্মিলিত ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে এবং এই গোষ্ঠীকে সমবেত প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে মনে করে। এর উদাহরণ হল Customs Union-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ এবং বেলজিয়াম নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্ত ধরনের কর ও শুল্ক বিলোপ করে। ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর কলেবর বৃদ্ধি করার পর (১৯৭৩) নয়টি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সব বাধা দূর হয়। EU বর্তমানে একটি Cusotms Union-ও বটে এবং এর পরিধির মধ্যে সর্বপ্রকার পণ্য অবাধে চলাচল করতে পারে। ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বাইরের কোনও দেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যের উপর গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সর্বত্র একই হারে শুল্ক আরোপ করা হয়। আবার গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কৃষিপণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের আমদানির উপর লেভি আরোপ করে গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ বাজারটিকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

EU-এর ভূমিকার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গোষ্ঠীভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবাধ যাতায়াত নিশ্চিত করা। যে কোনও সদস্য-রাষ্ট্রের নাগরিক গোষ্ঠীভুক্ত অপর রাষ্ট্রে যাতায়াত করতে পারে বা চাকরি করতে পারে। কোনও দেশই কর্মসংস্থান নীতিতে জাতিগত বৈষম্য ব্যবস্থা আরোপ করতে পারে না। স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত পেশাদার বৃত্তিজীবীদের অবাধ গমনাগমনের ক্ষেত্রে সীমিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পুঁজির স্বাধীন চলাচলের জন্য রোমচুক্তি কিছু নির্দেশিকা প্রদান করেছে। তবে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক সঙ্কটে পুঁজির চলাচল সঙ্কুচিত করতে পারে এবং এই বিষয়ে তারা রোমচুক্তির সুবিধা নিয়ে থাকে। তবে চুক্তিধারা লঙ্ঘন করলেই কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে।

ইউরোপী গোষ্ঠীর একীকরণ প্রক্রিয়ার মূল বিষয় হল কতকগুলি সাধারণ নীতি প্রণয়ন। EEC চুক্তিতেই একটি সাধারণ কষিনীতি এবং সাধারণ বহির্বাণিজ্য নীতির কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে এর ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলি সামাজিক নীতি, যানবাহন নীতি, অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে সাহায্য দান, শক্তি, পরিবেশ, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ কর্মপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন করে। এই সাধারণ নীতিগুলির প্রধান লক্ষ্যসমূহ আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা সংক্রান্ত মূল নীতিটির সাথে সম্পর্কিত ছিল। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের সমস্যাগুলি ছিল চরিত্রগত দিক দিয়ে বহুজাতিক এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ব্যতীত এগুলির সমাধান ছিল অসম্ভব।

২.৬ EEC-র সম্প্রসারণ

রোমচুক্তির প্রস্তাবনায় ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাগণের উদ্দেশ্য ছিল যে মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে এই সংগঠন তার যাত্রা শুরু করলেও তাদের প্রধান লক্ষ্য হবে পশ্চিম, উত্তর, মধ্য ও চূড়ান্ত পর্বে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে এর আওতাভুক্ত করা। প্রথম সম্প্রসারণ হয় ১৯৭৩ সালে যখন ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যান্ড EEC-তে যোগদান করে। ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় সম্প্রসারণে গ্রিস, ১৯৮৬ সালে স্পেন ও পর্তুগাল এবং ১৯৯৫ সালে সুইডেন, অস্ট্রিয়া এবং ফিনল্যান্ড এই সংস্থায় যোগ দেয়। ২০০৪ সালে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের দশটি দেশ, ২০০৭ সালে

রোমানিয়া এবং বুলগেরিয়া ও সবশেষ ২০১৪ ক্রোয়েশিয়া EU-র অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এই সম্প্রসারণ গত পাঁচ দশকের সংহতি আন্দোলনের কতকগুলি বাস্তব দিকের প্রতিফলনস্বরূপ। অধিজাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবের কারণে ব্রিটেন ও স্ক্যানডিনেভীয় দেশগুলি প্রথমদিকে এই সংস্থা থেকে দূরে ছিল। পরবর্তীকালে তাদের এই সংস্থায় যোগ দেওয়ার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করা। পরবর্তীকালে তারা এও বুঝতে পারে যে এই সংস্থা কোন প্রকট অধিজাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য সমন্বিত নয়। ১৯৭০ এবং '৮০ দশকের গোড়ার দিকে গ্রিস, স্পেন এবং পর্তুগাল একনায়কতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয় বলে তারা ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় প্রধানত নিরপেক্ষতার কারণবশত সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া এই সংস্থায় যোগ দেয়নি। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি এবং ইউরোপীয় সংস্থার সাফল্য এই দেশগুলির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়।

১৯৮৯ সালে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটে এবং এর পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের অধুনা দেশগুলি গণতন্ত্র এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার কাজে নিযুক্ত হয়। এর ফলে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শীঘ্রই ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান দেশগুলি বিশেষত সদ্য ঐক্যবদ্ধ জার্মানি উপলব্ধি করে যে ইউনিয়নের যে দুটি প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য প্রয়োজনীয়—(১) গণতন্ত্র (২) মুক্ত অর্থনীতি, দুটিই মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের এই দেশগুলি পূরণ করেছে। ইউনিয়নের দৃষ্টিতে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের এ কমিউনিস্ট শাসনোত্তর দেশগুলি এই লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে এবং নীতিগতভাবে তাদের সদস্যপদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসের নিস শীর্ষ সম্মেলনে ইউনিয়ন তার প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো পরিবর্তন সংক্রান্ত ঐক্যমত্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় যার ফলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের দশটি দেশের ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তি ঘটে। এই দশটি দেশ পূর্ব ও মধ্য ইউরোপীয় এবং এরা ২০০৪ সালে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়। ২০০৭ এবং ২০১৪ সালে আরও তিনটি দেশ অন্তর্ভুক্ত হয়।

২.৭ E.U-এর বিশ্বব্যাপী ক্রিয়াত্মক ভূমিকা

রোমচুক্তি ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার একটি ফরমুলা যোগান দেয় কারণ এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বহু রাজনৈতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে বিরোধ ছিল। তবুও রাজনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মূল ভাবনায় স্থান করে নিয়েছিল। এই রাজনৈতিক সহযোগিতার মূল উপাদান অবশ্যই নিহিত ছিল বৈদেশিক নীতির মধ্যে। এর উদ্দেশ্য ছিল যে বিশ্বরাজনীতিতে আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে এই ইউরোপীয় সংগঠন একক কণ্ঠে স্ব-অবস্থান ব্যক্ত করবে। এই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আন্তঃদেশীয় সমন্বয় অনুভব করার ক্ষেত্রে কতকগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটমান ব্যাপারগুলি কারক হিসেবে কাজ করে। পূর্ব-পশ্চিম দাঁতাঁত, চীন ও জাপানের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৎপরতা বৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ইত্যাদি ঘটনাগুলি বিশেষ ভাবে এই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বৈদেশিক নীতির সমন্বয়ের প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করে। ১৯৭০ সাল নাগাদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে রোমচুক্তির বাইরে গিয়ে আন্তঃদেশীয় সমন্বয় সাধন করতে সচেষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়াটি ১৯৭০ সালে ইউরোপীয় রাজনৈতিক সহযোগিতা (European Political Co-operation-EPC) শিরোনামে বাস্তবায়িত হয়।

১৯৯১ সালের ম্যাস্ট্রিক্ট চুক্তি অভিন্ন বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট পদক্ষেপ। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গঠন করার উদ্দেশ্যে এই চুক্তি গৃহীত হয়। চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিন্ন বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতি (Common Foreign and Security Policy–FSP) কে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভিযাত্রায় সর্বপ্রথম একটি বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর মৌলিক নীতির উদ্দেশ্যগুলি ছিল বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত মৌলিক স্বার্থসমূহের রক্ষাসাধন, বিশেষ করে অভিন্ন আত্মরক্ষা ও অভিন্ন প্রতিরক্ষা নীতির বিষয়টি মনে রেখে ইউনিয়নের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করা, শান্তি বজায় রাখা ও গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা ও আইন ও মানবাধিকারের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

CFSP কে বাস্তবায়িত করতে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল অভিন্ন অবস্থান ও যৌথ আচরণ, সমন্বিত ভোটদান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সম্মেলনে যৌথ অবস্থান, যৌথ প্রতিনিধিত্ব, তদন্তার্থে যৌথ বৃত্তি এবং কূটনৈতিক ও কম্যুনিটির দলিলসমূহের একত্রীকরণ। ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে প্রায় সত্তরটির মত অভিন্ন অবস্থান ১৯৯৩ সাল থেকে আজ অবধি গ্রহণ করা হয়েছে যেমন বলকান থেকে শুরু করে পূর্ব তিমর, পরমাণু অস্ত্রের হ্রাস থেকে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে। আর একবার যৌথ পন্থা গৃহীত হলে সদস্য দেশগুলিকে অভিন্ন অবস্থানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেই হবে। এছাড়াও এই অবস্থানকে ইউ-র নির্বাচিত সভাপতি রাষ্ট্রপুঞ্জসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বা সভায় স্বপক্ষ সমর্থন করে পেশ করবেন। সাম্প্রতিক কালে CFPS কাঠামোর মধ্যেই একটি অভিন্ন ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নীতি (Common European Security and Defence–CESDP) বিবর্তনের নিমিত্ত সচেষ্ট হয়েছে 'ইউ'-র সদস্য রাষ্ট্রগুলি। তবে সাফল্য সেই তুলনায় কমই এসেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভাতে বৃদ্ধির যে নানা রকমের চালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তার ফলে ইউকে দুধরণের ভূমিকার উদ্ভব করতে হয়েছে। ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে যে নজিরটি প্রথমেই সামনে আসে তা হল বাণিজ্য, উন্নয়ন ও পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে অভিন্ন স্বার্থ পরিলক্ষিত হয় বলে 'ইউ'-এর সদস্য দেশগুলি একযোগে কাজ করবার কথা ভাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার (WTO) তত্ত্বাবধানে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ইউ তার বাণিজ্য নীতির আওতায় সংঘবদ্ধভাবে বক্তব্য রেখেছে। একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলির সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতা বা বিশ্বজনীন পরিবেশ সংক্রান্ত সংরক্ষণতন্ত্র গঠন করবার লক্ষ্যে যে সমস্ত আলোচনা সংঘঠিত হয়েছে সেখানেও ই.ইউ তার পূর্বোক্ত আচরণ থেকে সরে আসেনি। তাৎপযপূর্ণভাবে এই সব বিষয়গুলির ক্ষেত্রে 'ই.ইউ'-এর ঐক্যসাধন অনেকাংশে গভীরতা পেয়েছে।

এর বিপরীতে আবার দেখা যাচ্ছে যে পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তা বিষয়ক অভিন্ন নীতি প্রণয়নে ইউনিয়ন এখনও সেরকম সাফল্য পায়নি। নব্বই দশকের যুগোস্লাভিয়ার গৃহযুদ্ধ বা ২০০৩ সালের ইরাকের যুদ্ধের সময় ই.ইউ সেরকমভাবে সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ব্যর্থতার সমর্থনে এই যুক্তি দেখানো হয়েছে যে ই.ইউ-এর অসফলতার জন্য আশানুরূপ সুসংহত নীতির অবতারণা যত না প্রয়োজনীয় বৈদেশিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তার থেকেও এই ব্যর্থতা মূলতঃ সংবদ্ধ জাতীয় স্বার্থের অভাবই দায়ী। এছাড়াও ফলপ্রসূ দক্ষতার অভাবও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ই.ইউ-এর ভূমিকা নিম্নমানের করেছে।

যাই হোক বর্তমান 'ই.ইউ'-এর ভূমিকা দেখে এটা বলা যেতে পারে যে ব্যবসা-বাণিজ্য, মেধাভিত্তিক সম্প্রীতির অধিকার, বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য বিষয়ে 'ই.ইউ' তার প্রভাবশালী ভূমিকা বজায় রাখবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে। কিন্তু পররাষ্ট্র ও নিরাপত্তার বিষয়ে 'ই.ইউ'-এর অল্প সময়ের মধ্যে দিগন্তকারী

সাফল্য পাওয়ার আশা ক্ষীণ। 'ই. ইউ'-এর আন্তর্জাতিক ভূমিকা, তার বৈদেশিক ও নিরাপত্তা নীতির সমন্বয় সাধন করে এবং তার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থান মাথায় রেখে, এটি একটি কঠিন কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২.৮ E.U-এর সম্মুখে চালেঞ্জসমূহ

বিগত ছয় দশকের ইউরোপীয় সংহতি আন্দোলন পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক রূপান্তর, রাজনৈতিক সহযোগিতা, প্রচলিত ও অপ্রচলিত নিরাপত্তা বিষয়ক সমস্যার নিরসন করবার প্রয়াসে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুধু তাই না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে উপস্থিত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এই যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উদাহরণ স্বরূপ অর্থনৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অভিন্ন বাজার (যেটি ১৯৯২ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রবর্তিত হয়) এবং অভিন্ন মুদ্রা (যেটি ১৯৯৯ সালে প্রবর্তিত হয়) এবং তার সঙ্গে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রে CFSP'র উদ্ভব এবং সর্বোপরি সংহতি আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান বলা যেতে পারে ইউরোপীয় মহাশক্তিধর দেশগুলির মধ্যে বহুকালব্যাপী দ্বন্দ্বের নিরসন ও পারস্পরিক বিশ্বাস ও স্বগোত্রীয় জাতিভাবের উদয়। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে জাতীয় সার্বভৌমত্বের সীমা ও এই বিষয়ের সচেতনতার মানবৃদ্ধি হয়েছে. কিন্তু একটি বিষয় স্বচ্ছ যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় সত্তা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। ফলে ই.ইউ-এর প্রতিষ্ঠাতারা যে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে তাঁরা ভেবেছিলেন ইউরোপীয় জাতি-রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় সত্তা ভুলে গিয়ে এক European Federation গড়ে তুলবে অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা মনে হয় অদূর ভবিষ্যতেও সফল হবে না। তাই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব হল জাতীয় সত্তাসমূহকে যতদূর সম্ভব অক্ষত রেখেই সংহতির প্রক্রিয়া সচল রাখা। তবে এই কথা সত্যি যে ইউ-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে সংহতির ব্যাপ্তি ও গভীরতাকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য রয়েছে।

এখন ইউরোপীয় সংহতি প্রক্রিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। কঠোর সমালোচকেরা পর্যন্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্জিত সাফল্যের প্রশংসা না করে পারেন না। প্রতিষ্ঠাতাদের ধার্য-অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সঠিক রূপায়ন বা এই লক্ষ্য অর্জনের পথে সংহতি আন্দোলনকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশেষ করে যখন ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট বিশাল ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ইউনিয়নের আকারও বৃহৎ হয়েছে। ৬ থেকে সদস্য সংখ্যা ২৮ হয়েছে এবং ইউনিয়ন এখন একটি সমভাবাপন্ন সংগঠন বলা যাবে না। এর ফলস্বরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন ইউরোপীয় এই সংঘ সংখ্যার সঙ্গে গভীরতার মিলন স্থাপনে উভয় সংকটের সম্মুখীন। বর্তমান বিশ্বে যে মন্দা চলছে এবং যে অর্থনৈতিক সঙ্কট আয়ারল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগাল ও ইতালিতে দেখা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরোর দুর্বলতা বিশ্ববাজারে যেভাবে ধরা পড়েছে তাতে ইউরো জোনের সঙ্কট বিশ্বের সামনে প্রকট হয়েছে। এর সঙ্গে বেকারত্ব বৃদ্ধি ও অর্থনীতির স্থবিরতা আরও নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে ইউরোজোনকে ফেলে দিয়েছে। এই সঙ্কট থেকে কিভাবে 'ই.ইউ' মুক্ত হবে সেটাই চূড়ান্তভাবে ঠিক করবে 'ই.ইউ'-এর ভবিষ্যৎ।

২.৯ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি ক্ষমতার পরিমাপে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে বিশেষত ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালির মত রাষ্ট্রগুলি। ফলস্বরূপ একটি ইউরোপীয় সংহতির আন্দোলন শুরু হয় জঁ মোনে (Jean Monnet) ও রবার্ট শ্যুম্যানের মত দূরদর্শী ব্যক্তিদের ঐকান্তিক ইচ্ছায়। বহু তর্কবিতর্কের পরে অবশেষে ১৯৫৮ সালে EEC-র প্রতিষ্ঠা হয় যেটির উদ্দেশ্য ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলির জাতীয় সত্তাসমূহকে অক্ষত রেখে কম্যুনিটির প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ স্বাধীনভাবে চালিয়ে যাওয়া।

এই সংগঠনের মধ্যে আছে চারটি মুখ্য প্রতিষ্ঠান—মন্ত্রিপরিষদ, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং আদালত। রোম চুক্তি অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলি কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে EU প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে। সদস্য রাষ্ট্রগুলি বাধ্য এই সিদ্ধান্তগুলি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে। মুখ্য প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গ হিসেবে ই.ইউ গড়ে তুলেছে এক অভিন্ন বাজার। এই বাজারের মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তি, সেবাকার্য এবং পুঁজির স্বাভাবিক চলাচল। এছাড়াও ই.ইউ-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিছু নির্ধারিত বিষয়ের উপর যেগুলিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলি সহমত পোষণ করে।

ই.ইউ-এর সংহতির প্রয়াসে নতুন যুগ শুরু হয় ১৯৮৯ সালের ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর সময়কালে। কম্যুনিটির সাফল্য অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে আকর্ষিত করতে লাগল বিশেষত সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের (Soviet bloc) অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলিকে। এর ফলে গোড়ার দিকের ৬ সদস্য সংখ্যা থেকে বর্তমানে ই.ইউ-এর সদস্য সংখ্যা ২৮ হয়েছে। আরও কিছু রাষ্ট্র ই.ইউ-এর সদস্যপদ লাভের আশায় অপেক্ষামান। কিন্তু কম্যুনিটি সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ই.ইউ নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বিশেষত সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সমন্বয়ে সাধনের ক্ষেত্রে। বর্তমান বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ই.ইউ-এর সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এবং ভবিষ্যতের ইউরোপীয় সংহতি ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

২.১০ প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী:

১. যে পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর একীকরণ প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়েছিল তা আলোচনা করুন।

২. ইউরোপীয় গোষ্ঠীর (EU) প্রকৃতি ও মুখ্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী:

১. ই.উ-এর সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা করুন।

২. ই.উ-এর সামনে মুখ্য চ্যালেঞ্জগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:

১. রোম চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।

২. EEC-এর প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

২.১১ গ্রন্থপঞ্জী

1. Desmond Dinan, *Ever Closer Union: An Introduction to European Integration,* Palgrave Macmillan.
2. Richard Vaughan, *Post-War Integration in Europe.*
3. Stephen George and Ian Bache, *Politics in the European Union,* Oxford University Press.
4. Rajendra K Jain, ed. The *European Union in a Changing World,* Radiant Publishers.
5. Juliet Lodge, ed, *European Union: The Community in Search of a Future,* Macmillan.
6. Purusottam Bhattacharya and Anindyojoti Majumder, ed., *Antarjatik Samparker Ruprekha, Setu,* 2007 (in Bengali)

একক ৩ ☐ সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ভূমিকা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ ঠাণ্ডাযুদ্ধকালীন চীনের বিদেশনীতি
৩.৪ ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে চীনের ভূমিকা
৩.৫ সারাংশ
৩.৬ প্রশ্নাবলী
৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- সাবেক রাজতান্ত্রিক চীন থেকে গণসাধারণতন্ত্রী চীনে রূপান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করা।
- গণ সাধারণতন্ত্রী চীনে মাও সে তুং-এর সময়কালে চীনের বিদেশনীতি বিষয়ে জ্ঞানলাভে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন চীনের বিদেশনীতি বিষয়ে ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- মাও-এর সময়কাল ও তাঁর উত্তরসূরীদের নেতৃত্বে বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।
- চীনের সাথে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ে ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

৩.২ ভূমিকা

১লা অক্টোবর ১৯৪৯ সালে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের পরে মাও জে-দঙ-এর নেতৃত্বে গণসাধারণত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়। মূলত চীন ছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজংবশের অধীনে। ১৯১৯ সালে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের (Sun Yat-Sen) নেতৃত্বে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চীনে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। ১৯১২ সালে সান ইয়াৎ সেনকে রাষ্ট্রপতি করে চীনে সাধারণতন্ত্রের একটি অস্থায়ী সরকার নানকিং-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে চাপের মুখে তিনি উয়াং শি-কাই (Yuar Shi-Kai)-এর হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে পদত্যাগ করেন। সানি-ইয়াৎ-সেন পদত্যাগ করে জাতীয় সরকার (গুয়োমিনডাং সরকার) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে উয়ানের মৃত্যুর পর সমরনায়করা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এর ফলে দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই

অবস্থায় ১৯১৯ সালে ডা: সান-ইয়াৎ-সেন ক্যান্টনে গুয়োমিনডাং দল (Guomindang Party)-এর শাসন কায়েম করেন এবং একে চীনের প্রকৃতি জাতীয় সরকার বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা ও চীনের ওপর জাপানের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া চীনকে হতাশাগ্রস্ত করে দেয়। এর ফলস্বরূপ ১৯১৯ সালের ৪ঠা-মে-র আন্দোলন সংঘটিত হয় এবং এই বিপ্লবে চীনের জনসাধারণ বিশেষত বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ বিপুলভাবে অংশগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার সাফল্য চীনের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকদের প্রভাবিত করে। এর ভিত্তিতে চীনের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্ট যুব লীগ সংস্থাসমূহ গড়ে ওঠে। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই সাংহাই শহরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস আহূত হয়। এই কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর মাও জে-দঙ-কে হুনান প্রদেশের পার্টি-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এই সময় থেকেই চীনের রাজনীতিতে মাও-এর ভূমিকা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সান-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয় ১৯২৫ সালে এবং এরপর গুয়োমিনডাং-এর নেতৃত্বে তাঁর উত্তরসূরী চিয়াংকাই-শেকের উপর ন্যস্ত হয়। শীঘ্রই চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ বাধে। চিয়াং কাই-শেক শুরু করেন কমিউনিস্টদের ওপর দমন পীড়ন ও আক্রমণ তবুও এই সময় মাও-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক এই বিদ্রোহগুলি নিষ্ঠুরভাবে দমন করেন। প্রথম কমিউনিস্ট সৈন্যবাহিনী 'লাল ফৌজ' (Red Army) গঠিত হয় ও বিভিন্ন সময় অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৩০ সালের এইরকম এক অভ্যুত্থানের পর চিয়াং কমিউনিস্টদের নির্মূল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন এই আক্রমণ সামলাতে। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত দেখা যায় মাও জে-দঙ-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি এবং 'লাল ফৌজ' ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ১৯৩৫ সালে মাও জে-দঙ কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালে মাও জাপ-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেন, তা চিয়াং মেনে নেন না। অবশেষে চিয়াং জাপানের আগ্রাসন প্রতিহত করতে অপারগ হয়ে 'লাল ফৌজ'-এর ব্যবহার স্বীকার করে নেন। ১৯৩৭ সালে জাপান চীনের উপর বিশালভাবে আক্রমণ করে এবং বহু শহর দখল করে নেয়। জনসাধারণের চাপে চিয়াং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই চিয়াং কমিউনিস্ট পার্টি ও লাল ফৌজের প্রধান্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে আবার দমন পীড়ন শুরু করলেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির কাছে জাপনের আত্মসমর্পণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয় এবং তার সঙ্গে জাপানের ক্ষমতাও খর্ব হয়। এর ফলে চীন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু শীঘ্রই ১৯৪৫ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টি ও গুয়োমিনডাং-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। অবশেষে লাল ফৌজের হাতে গুয়োমিনডাং বাহিনী পরাজিত হয় ও প্রায় ৫ লক্ষাধিক সৈন্য বন্দী হয়। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে লালফৌজ পিকিং (বেইজিং) অধিকার করে ও ধীরে ধীরে গুয়োমিনডাং-এর রাজধানী নানকিং সহ চীনের সিংহভাগ অধিকার করে নেয়। অবশেষে ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর মাও 'গণ-সাধারণতন্ত্রী চীন' (People's Republic of China) প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। চিয়াং-কাই-শেক কোনো বিকল্প না পেয়ে নিরুপায় হয়ে মার্কিন সপ্তম নৌ-বহর পরিবৃত হয়ে ফরমোজা (Taiwan)-এ আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

মাও ১৯৪৯ সাল থেকে চীনের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। প্রথম পর্যায়ে চীনের বৈদেশিক নীতি ১৯৪৯ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে মাও-এর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত ছিল। এই

অধ্যায়ে তাই মাও-এর সময়কালের বিদেশনীতি ও তার পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। সুবিধার্থে অধ্যায়টিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন চীনের বিদেশনীতি ও ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে চীনের ভূমিকা আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যেও মাও-এর সময়কার ও তাঁর উত্তরসূরীদের নেতৃত্বে চীনের বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৩ ঠাণ্ডাযুদ্ধকালীন চীনের বিদেশনীতি

মাও-জে-দঙ-এর নেতৃত্বে রক্তাক্ত সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনের উত্থান বিশ্বরাজনীতিতে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই সময় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চীনের প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি বিশেষত দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে চীনকে যে অবমাননার সম্মুখীন হতে হয়, তার ফলে চীনের বিদেশনীতি ভীষণভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। সেই সময় আমেরিকাকে চীন প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৫০ সালে আমেরিকার কোরিয়া আক্রমণ চীনের উষ্মার কারণ হয়। চীন এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই সমাজতান্ত্রিক দেশটি চীনের সামাজিক বিপ্লবের সময় সাহায্য করেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৬২ সালটি ছিল দুই দেশের সম্পর্কের তিক্ততম বছর। ১৯৬২ সালে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে কিউবাকে ঘিরে যে পারমাণবিক যুদ্ধের মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং তাতে রাশিয়ার ভূমিকা ও আমেরিকাকে লক্ষ্য করে কিউবায় মিসাইল স্থাপন করা চীন সমর্থন করেনি। এই ১৯৬২ সালেই দুই দেশ উসুরী নদীর সীমানায় এক রক্তাক্ত সংঘর্ষেও জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে রাশিয়া ও চীন একে অপরের থেকে দূরে চলে যায়।। ১৯৬৪ সালে চীন Cop Nor মরুভূমিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে নিজের উদ্ভবের কথা ঘোষণা করে। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেকস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে কারণ সেখানকার সরকার গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করার চেষ্টা করে ও কমিউনিজমের বিরোধিতা করে। চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সামরিক অভিযান সমর্থন করেনি। এর জন্য চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরত্ব আরও বেড়ে যায়।

এই সময় বিশ্ব রাজনীতির ঘটনাচক্র চীন ও আমেরিকার মধ্যে বরফ গলাতে সাহায্য করে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চীন রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যের মর্যাদা পায়নি। তাইওয়ান বা প্রজাতন্ত্রী চীন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চীনের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে গেছে। আমেরিকার প্রতিরোধের ফলে চীন কিছুতেই সদস্যপদ লাভ করতে পারছিল না। ১লা জানুয়ারি ১৯৭১ সালে গণসাধারণতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রপুঞ্জে তথা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। অন্তরালে সক্রিয় ছিল চীন সম্বন্ধে আমেরিকার কৌশল বদল। দুই দেশ-এর পরে দৌত্যের নিদর্শন হিসেবে 'Ping Pong' খেলার দল পাঠায়। এই 'Ping Pong Diplomacy' -র অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় মার্কিন-চীন দ্যতাঁত। ১৯৭২ সাল থেকে নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়। কিসিঞ্জারের দৌত্যের ফলে মার্কিন প্রেসেডেন্ট নিক্সনের চীন সফর পাকা হয় এবং ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিক্সন-মাও সাক্ষাৎকার হয় চীনে। বৈঠকের শেষে যুক্ত ইস্তাহারে উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অঙ্গীকার করা হয়।

চীন এর মধ্য দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ভারসাম্য স্থাপন করতে চেয়েছিল এবং আমেরিকা রাশিয়াকে চাপে রাখার জন্য চীনের কাছাকাছি এসেছিল। এছাড়াও আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে চীন-সোভিয়েত বিরোধকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। চীনের কাছেও তার আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা তাকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী করে। ১৯৬৬-১৯৬৯ চীনের 'Great Leap Forward' কর্মসূচি ও 'Cultural Revolution'-এর বিপর্যয়ের পর চীন অনুভব করল নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে আখেরে লাভ হবে না।

চীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে নানা ধরনের বিদেশনীতির কৌশল অবলম্বন করে। নির্জোট আন্দোলনের (NAM) প্রতি প্রথমে চীন সন্দিহান হলেও পরে নির্জোট আন্দোলনের ১৯৫৫ সালের বানদুং সম্মেলনে যোগদান করে। কিন্তু পরবর্তীকালে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আফ্রিকান দেশগুলি যেমন বুরুনডি, ঘানা এবং কেন্দ্রীয় এশীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক নিম্নগামী হয়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিও চীনের কাছকাছি আসেনি। কিউবা, চীনের সোভিয়েত ইউনিয়নের কড়া সমালোচনা সত্ত্বেও, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তার আনুগত্য বিন্দুমাত্র হ্রাস করেনি।

ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক তিক্ত হয় ১৯৬২ সালের ভারত-চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ভারত চীনের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং দুই দেশ অবশেষে সংঘাত থেকে নিরস্ত হলেও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি। চীনের পাকিস্তান নীতি ও পাকিস্তানের গুপ্ত পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন ও যোগানের মূল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চীনের ভূমিকা, ভারতের চীনের প্রতি মনোভাব প্রভাবিত করে। ভারতের সঙ্গে চীনের সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা আজও মেটেনি। ১৯৫০ সালে চীনের তিব্বত আগ্রাসন ও দলাই লামার ভারত পলায়ন ভারত-চীন সম্পর্কে তিক্ততা বাড়ায়। ১৯৬৫ সাল ভারত-পাক যুদ্ধ ও ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় চীন ভারত বিরোধিতায় গিয়ে পাকিস্তানকে সমর্থন জানায় ও পরবর্তীকালে মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি জানাতেও অস্বীকার করে। ১৯৭৪ সালে ভারতের পারমাণবিক শক্তি হিসেবে উত্থান চীনকে ভারতের প্রতি মনোভাব বদলাতে প্রভাবিত করে তবে দুদেশের সম্পর্ক লক্ষণীয় ভাবে উন্নতি হয়নি।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের বিদেশনীতি বহু দেশই চীনের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস বলে চিহ্নিত করে। ভিয়েতনাম নিয়ে চীনের ভূমিকা ও ভিয়েতনামের সঙ্গে সীমানা সংক্রান্ত যুদ্ধ নিয়েও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ভিয়েতনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের মদতে কাম্বোডিয়ার উপর অধিকার ছাড়তে নারাজ ছিল। চীন তাই ভিয়েতনামের সঙ্গে শান্তিপুর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি।

মাও-এর নেতৃত্বে চীন যে বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করেছিল সেটির সঠিক গতিপ্রকৃতি বা নীতি অনুধাবন করা কঠিন। চীন তৃতীয় বিশ্ব ও নির্জোট আন্দেলনের নেতৃত্বের স্থান অধিগ্রহণ করতে সচেষ্ট হলেও খুব সাফল্য আসেনি। বরং নিজেকে অনেক ক্ষেত্রেই চীন বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হলেও চীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে বহুলাংশে। পশ্চিমী দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের হেতু চীন তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের বাহক হিসেবে চিহ্নিত করার ফলে চীনের সঙ্গে সেই দেশের সম্পর্ক মধুর ছিল না। সুতরাং মাও-এর সময়কালে চীন আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখে যা চীনকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনদিক থেকেই লাভবান করেনি।

মাও পরবর্তীকালে দেঙ শিয়াও পিং নেতৃত্বে আসেন এবং তিনি বহুক্ষেত্রে মাও নীতির পরিবর্তন সাধন করেন। যদিও তিনি কোনোদিন কোনো রাষ্ট্রীয় পদ গ্রহণ করেননি কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে

আসীন হন। মার্চ ১৯৭৮ সালে তিনি CPPCC National Commitee-র চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর সময়কাল থেকেই চীনের বিদেশনীতি অনেক বাস্তবসম্মত হয়। তিনি উপলব্ধি করেন বিশ্বরাজনীতিতে চীন যদি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে তাহলে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতিসাধন অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি চীনের অর্থনীতিকে নতুন রূপ দিলেন যার মাধ্যমে পশ্চিমী দুনিয়া তথা আমেরিকার ও রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক লেনদেনের সুবিধা হয়। তিনি Socialist Market Economy (SME) প্রচলন করেন যার ফলে একদা চীনের 'Closed Economy' মডেলের পরিবর্তে মুক্ত বাজারনীতি চালু হয় যদিও কমিউনিস্ট পার্টির নজরদারি সর্বস্তরে বহাল থাকে। ফলস্বরূপ বহু বিদেশী পুঁজির গন্তব্য হয় চীন। দেখা যায় এই সময় চীনের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোটামুটিভাবে আশির দশক থেকে দেখা যায় অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম চীন বিশ্বরাজনীতিতে পূর্ববর্তী সময়ের নিরিখে অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ১৯৭৯ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণ চীনকে আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ করে দেয়। চীন এই আক্রমণের কড়া সমালোচনাও করে। তবে আমেরিকার তাইওয়ানকে অস্ত্র সরবাহকে ঘিরে মনোমালিন্য শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে। ১৯৮২ সালে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে ব্রেজনেভ উদ্যোগী হন এবং দুই দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ও কূটনৈতিক আদানপ্রদানও শুরু হয় বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৬ সালেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই বছরই সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে প্রায় ৬০০০ সেনা প্রত্যাহার করার প্রস্তাব রাখে। সব থেকে লক্ষণীয় বিষয়টি হল সাংহাইতে দীর্ঘকাল পর সোভিয়েত ইউনিয়নের কনস্যুলেট জেনারেলের দপ্তর খোলার অনুমতি পায়। দুই দেশের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনাও হয়। তবে ১৯৮৯ সালে চীন সোভিয়েত সম্পর্ক নতুন মাত্রা পায়। সোভিয়েত ঐ বছর আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ইঙ্গিতই শুধু দেয়নি, কাম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামী সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণাও করে। ফলে চীন-সোভিয়েত সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকত্বের দিকে অগ্রসর হয়। তবে সম্পর্কের এই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল অপর একটি কারণের ফলে। ১৯৮৬ সাল থেকে গর্বাচভ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি হন এবং তিনি তার বৈদেশিক নীতিতে নতুন চিন্তাধারা আনয়ন করেন। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতি অনেকাংশে নমনীয় হয়। উনি ব্যক্তিগতভাবে চীন সফরে যান ১৯৮৯ সালের মে মাসে। ওনার এই সফরের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন-সোভিয়েত সীমান্ত থেকে ৫,০০,০০ সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে সম্পর্কের আরও উন্নতি হয়।

পাশাপাশি আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করার দিকে চীন মনোনিবেশ করে। দেখা যায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও সামরিক বিষয়ে সহযোগিতার প্রচেষ্টা আরও উন্নত করার ইঙ্গিত। এর ফলে বহু বাণিজ্যিক ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে। উল্লেখযোগ্য চুক্তিগুলির মধ্যে একটি পাঁচ বছরকালীন বাণিজ্যিক চুক্তি যেটি দুই দেশের বয়নশিল্পের আমদানি-রপ্তানিতে উন্নতি সাধন করবে। এছাড়া বিভিন্ন মার্কিন তেল কোম্পানীগুলির সঙ্গে চীনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে এই কোম্পানিগুলি চীনে তেলের অনুসন্ধান করতে সাহায্য করতে পারবে। ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতি রেগন চীন সফরের সময় অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য চীনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সময়ে সামরিক সহযোগিতাও দুই দেশের মধ্যে অন্য মাত্রা পায়। আমেরিকা চীনকে TOW (anti-tank) HAWK (aircraft missiles) বিক্রি করতে রাজি হয়। তবে তাইওয়ানকে মার্কিন সামরিক সাহায্য বা NPT নিয়ে মার্কিন সেনেটের বিলম্ব দুই দেশের মধ্যে খানিক অস্বস্তির কারণ ছিল। ১৯৮৮ সালে Tiananmen Square-এ গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা

চীন সরকারের আক্রমণাত্মক ভূমিকাকে আমেরিকা তীব্রভাবে সমালোচনা করে। ফলস্বরূপ আমেরিকা চীনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং ভয় দেখায় যে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংগঠনগুলি থেকে কোনোরকম সাহায্য চীন পাবে না। এই তিক্ত সম্পর্ক বেশ কিছুদিন চলে। অবশেষে ১৯৯০ সালে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা উন্নতি দেখা যায় যখন চীনা বিদেশমন্ত্রীকে আমেরিকা সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। দুইপক্ষ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে। ১৯৯০ সালে আমেরিকা এই সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে, ফলত দেখা যায় আমেরিকার ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের চীন আমেরিকার প্রস্তাব সমর্থন করে।

ঠিক এই সময় বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু ততদিনে চীন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর সময় আমেরিকাও চীনকে সমীহ করে চলে কারণ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চীন এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।

৩.৪ ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে চীনের ভূমিকা

ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর কালে চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ লক্ষনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮-৫৯ সালের মাও-এর 'Great Leap Forward' চীনের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সফল হয়নি বরং কৃষি ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি করে। এর ফলে ১৯৬০-৬২ সালের মধ্যে G.D.P সূচক নিম্নগামী হয়। ১৯৬৭-৬৮ আবার মাও-এর 'Great Proletarian Cultural Revolution' বহুক্ষেত্রে উৎপাদনের হার কমিয়ে দেয়। এরপর কিছুদিনের জন্য ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে চীনের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। তবে ১৯৭৮-এর পর থেকে দেঙ শিয়াও পিং-এর SME মডেল প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে চীনের অর্থনীতিতে বড় মাপের সাফল্য আসতে শুরু করে। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে চীনের অর্থনীতি মোটামুটিভাবে একটা ভালো সূচক ধরে রাখতে পেরেছে। ২০১০-১১ সালে চীনের GDP ছিল ১০.৪% , ২০১১-১২ সালে ৯.৩৪%, ২০১২-১৩ সালে ৭.৭% ও ২০১৩-১৪ সালে ৭.৭%। চীনের অর্থনৈতিক সাফল্য বহুলাংশে ঠাণ্ডা বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার বিষয়ে সহায়ক হয়েছে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে বিশ্বে একমাত্র বৃহৎশক্তি (Super Power) হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিভাত হলেও চীন কিন্তু রাশিয়া ও আমেরিকা—এই দুই রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারসাম্য নীতি বজায় রেখে সম্পর্ক বজায় রাখছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে থেকেই চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দুপক্ষই করে এসেছে সেটা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট। বহু উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয় এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে। কোসিগিন থেকে গর্বাচভ পর্যন্ত রাষ্ট্রনেতারা চীন সফরে এসেছেন এবং চীনের সঙ্গে বহু দ্বিপাক্ষিক বিষয়ক বিবাদ মেটানোর চেষ্টাও করেছেন। ১৯৯১ সালে দুই দেশের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর পরবর্তী সময়ে ১৯৯৪ সালে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে আসেন এবং অনেকগুলি বাণিজ্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন। ১৯৯৫ সালে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী কোজিরেভ চীনে আসেন। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ১৯৯৬ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলেৎসিন চীন সফরে আসেন এবং এই সফরকালে ১৪টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৬ সালেই আবার দেখা যায় চীনের প্রধানমন্ত্রী লি পেং (Li Peng) রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। সুতরাং পূর্ববর্তী সম্পর্কের তিক্ততা অনেকটাই কমিয়ে আনতে সচেষ্ট হয় এই দুই দেশ। ২০০০ সালে এই সুসম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পুতিন, রাশিয়ায় তৎকালীন

রাষ্ট্রপতি, চীন সফরকালে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০০১ সাল থেকে রাশিয়াকে চীনের সর্ববৃহৎ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ হিসেবে দেখা যায়। ২০০১ সালে দুই রাষ্ট্র 'Treaty of Good Neighourliness and Friendly Cooperatio' চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর দুই দেশ মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার প্রধান্য প্রতিহত করার লক্ষ্যে ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টায় কাজাখিস্তান, কিরখিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের সঙ্গে মিলিত হয়ে ২০০১ সালে Shanghai Cooperation Oganizatioin (SCO) গঠন করে।

অপরদিকে আমেরিকার সঙ্গেও সম্পর্ক সহযোগিতাপূর্ণ রাখার সবরকম চেষ্টা করে যায় চীন। যদিও চীনের তাইওয়ান ও 'One China Policy' বা তাইওয়ান নিয়ে মার্কিন অবস্থান আজও দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে কাঁটার মত বিরাজ করছে, তবুও দুই দেশ সুসম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি যত্নবান। ১৯৮৪ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রেগনের চীন সফরের পর থেকেই সম্পর্ক ভালর দিকে অগ্রসর হলেও তিয়েনমেন স্কোয়ারের বর্বরোচিত হত্যালীলা চীন-মার্কিন সম্পর্ককে পুনরায় তিক্ত করে। ১৯৯০ সালে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হলে আমেরিকা চীনের ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ১৯৯২ সালে চীন Non Proliferation Treaty (NPT) অনুসমর্থন করে এবং এর পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্যিক লেনদেন বহুলাংশে বাড়ে। ২০১৪ সালের নিরিখে আমেরিকার অর্থনীতিতে চীনের রপ্তানির পরিসংখ্যান $124 billion ও আমদানি $466 billion ছিল।

২০০১ সালে মার্কিন সমর্থনে চীন World Trade Oganization (WTO)-তে সদস্যপদ লাভ করে। ২০০৯ সালে বারাক ওবামা চীন সফরকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীনের বর্ধিত ভূমিকা স্বীকার করেন।

জাপানের সঙ্গে চীন সম্পর্ক ভাল করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক পর্যায় বহু পদক্ষেপ নেয়। এর ফলস্বরূপ দেখা যায় যে, ১৯৯২ সালে জাপানের সম্রাট আকিহিতো চীন সফরে আসেন। ১৯৯৩ সালে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের উপর যে আগ্রাসন চালায় তার জন্য চীনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এর পরবর্তী সময়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয় ও লক্ষণীয় বিষয় হল ২০০৮ সালের নিরিখে জাপান আমেরিকার পর চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার।

বলা যেতে পারে, ভারতের সাথে চীনের মিশ্র ধরনের সম্পর্ক বর্তমান। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দুই দেশের মধ্যে বিবাদ থাকলেও উভয়েই সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। সীমান্ত নিয়ে বিবাদ, অরুণাচল প্রদেশ, চীনের পাকিস্তান নীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভারত-চীন সম্পর্কে মাঝে মাঝেই জটিলতা তৈরি হয়। কিন্তু জটিলতা থাকা সত্ত্বেও SCO-তে ভারতের উপস্থিতি চীন মেনে নিচ্ছে মধ্য এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার্থে ও মার্কিন উপস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও BIRCS, এই দুটি আন্তর্জাতিক সংগঠনেও চীন ও ভারত একসঙ্গে রাশিয়াকে পাশে নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১২ সালে লিবিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব যখন নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করা হয় তখন রাশিয়া, চীন ও ভারত ভোটদান থেকে বিরত থাকে। তবে চীন SAARC সংগঠনেও নিজের অন্তর্ভুক্তিকরণের আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ চীনের সপক্ষে জোর সওয়াল করলেও ভারতের প্রতিরোধের জোরে চীন SAARC-এ তার অভিপ্রেত বাসনাপূরণ করতে পারিনি।

যেটা দৃশ্যমান হচ্ছে সেটা হল চীন বিশ্ব রাজনীতিতে একটি নেতৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চাইছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে টক্কর দেওয়ার জন্য ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুকৌশলী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন

করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিজের উপস্থিতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে চীন ASEAN অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আদানপ্রদানের প্রতি উৎসাহী। এই লক্ষ্যে চীন ASEAN-এর শুধু 'Observer State'-ই নয়, চীন ASEAN+3, EAS, চীন ও ASEAN সম্মিলিত - 10+1 বৈঠক ও Asean Regional Forum (ARF)-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অন্যদিকে 'South China Sea' নিয়ে চীনের তীব্র বিরোধ বর্তমান। 'Spratly Islands'-এর প্রায় পুরোটাই চীন দাবি করে নিজের অংশ হিসেবে। ১৯৭৫ সালে চীন ভিয়েতনামের থেকে 'Paracel Islands' ছিনিয়ে নেয় এবং আজ পর্যন্ত তা অধিগ্রহণ করে রেখেছে। প্রাকৃতিক তেল ও গ্যাসের সম্পদের ভাণ্ডার 'South China Sea'-কে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। এর ফলে আমেরিকা তার সামরিক উপস্থিতি Asia-Pacific অঞ্চলে বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যে এই অঞ্চল আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রবণ অঞ্চল হিসেবে প্রকাশ পাবে তা প্রশ্নাতীত।

পরিশেষে বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীনের বর্ধিত ভূমিকার ফলে ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বৃহৎ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বহুমেরু বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেও আমেরিকাকে ঠেকাতে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করতে উৎসাহী চীন। সেইজন্য BRICS, SCO, রাষ্ট্রপুঞ্জ, G-20, জলবায়ু সম্মেলনের মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে চীন। দেঙ শিয়াও পিং চীনকে একটি অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম রাষ্ট্র হিসাবে মর্যাদা দান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমেরিকাও আজ স্বীকার করেছে চীনের এই উত্থান। এখন চীন তার এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিশ্বের দরবারে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ও বৃহৎ শক্তিরূপে তার উত্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট।

৩.৫ সারাংশ

১লা অক্টোবর ১৯৪৯ সালে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের পর মাও জে-দঙ-এর নেতৃত্বে গণসাধরণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়। মাও ১৯৪৯ সাল থেকে চীনের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন। তাঁর নির্দিষ্ট পথেই চীনের বিদেশনীতি পরিচালিত হয়। তবে যেহেতু এই সময়টা ছিল আন্তর্জাতিক স্তরে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় তাই অনেক হিসাব নিকাশ করে চীনকে চলতে হয়েছে। প্রথম দিকে চীন রাশিয়ার অনুগামী হয়ে থাকলেও ১৯৬২ সালে উসুরী নদীর সীমানায় দুই দেশের সংঘর্ষের পরে চীন আমেরিকার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করে।

মাও পরবর্তীকালে দেঙ শিয়াও পিং যখন নেতৃত্বে আসেন তখন তিনি মাও নীতির বহুল পরিবর্তন করেন এবং চীনের অর্থনীতির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এর ফলে আশির দশক থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও আমেরিকার সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্ক বজায় ছিল। ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে চীনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বহুমেরু বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও আমেরিকাকে ঠেকাতে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করতে উৎসাহী চীন। সেইমত BRICS, SCO রাষ্ট্রপুঞ্জ, G-20, জলবায়ু সম্মেলনের মত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে চীন। চীন সর্বপ্রকারে বৃহৎ শক্তি রূপে নিজের উত্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী:

১. ঠাণ্ডা-যুদ্ধকালীন বিশ্বে চীনের বিদেশ নীতির পর্যালোচনা করুন।

২. ঠাণ্ডা-যুদ্ধোত্তর বিশ্বে চীনের বিদেশ নীতিতে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়?

৩. মাও-জে-দঙ-এর সময়কালে চীনের বিদেশনীতির স্বরূপ আলোচনা করুন।

৪. মাও পরবর্তীকালে চীনের বিদেশনীতির পর্যালোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী:

১. ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন চীন তার বিদেশনীতিতে কতদূর সফল হয়েছিল?

২. ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে চীনের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:

১. টীকা লিখুন— গুয়োমিনডাং দল।

২. চীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাথে সম্পর্কস্থাপন করতে বিদেশনীতির কোন কৌশল অবলম্বন করছে?

৩. গ্রন্থপঞ্জী

1. Lampton David M., *'The Making of Chinese Foreign and Security Policy in he Era or Reform,* 1978-2000', Stanford University Press, 2001.
2. Nau Henry R. & Ollapally Deepa M., *'Worldviews of Aspiring Powers: Demestic Foreign Policy Debates in China, Indian, Iran, Japan and Russia'*, Oxford University Press, 2012.
3. Sharif Shuja, 'Pragmatism in Chinese Foreign Policy', *Contemporary Review,* Vol. 289, No. 1684, Spring 2007.
4. Venkat Ramman, G., 'India in China's Foreign Policy', *China: An Internatoinal Journal,* Vol. 9, No. 2, September 2011.
5. Mosca Matthew W., *'From Frontier Poicy to Foreign Policy: The Question of India and the Transformation of Geopolitics in Qing China'*, Standford Univeristy Press, 2013
6. Lantegine Marc, *'Chinese Foreign Policy: An Introeuction'*, Routledge, New York, 2013.

একক ৪ ☐ সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়া

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতি
৪.৪ ইয়েলেৎসিনের অধীনে রাশিয়ার বিদেশনীতি
৪.৫ পুতিন ও সমসাময়িক বিশ্বে রাশিয়া
৪.৬ সারাংশ
৪.৭ প্রশ্নাবলী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার ভূমিকা পর্যালোচনায় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় সোভিয়েত বিদেশনীতি অনুধাবনে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ করা।
- ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর কালে ইয়েলেৎসিন ও পুতিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার পরিবর্তিত বিদেশনীতির বিশ্লেষণ করা।

৪.২ ভূমিকা

১৯৯১ সালে ২৫শে ডিসেম্বর পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বর্তমান রাশিয়ান ফেডারেশনের উদ্ভব হয়। ১৯৯১ সালকে অনেকেই শীতল যুদ্ধের (Cold War) অবসানের সময়কাল বলে চিহ্নিত করেন। এই শীতল যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের ভূমিকা নিয়ে সব মহলেই জল্পনা শুরু হয়। একমেরুভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাশিয়াকে নিজের অবস্থান ধরে রাখবার জন্য নানা কৌশল ও বিদেশনীতির নয়া আঙ্গিক নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হয়। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার প্রাধান্য ও চীনের উত্থান রাশিয়াকে নতুনভাবে তার প্রকৌশলী নীতি নির্ধারণ করতে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি নতুনভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে যেমন G-20, Shanghai Co-operation Organization (SCO), BRICs, Commonwealth of Independent States (CIS) ইত্যাদি। সেগুলিতে রাশিয়ায় ভূমিকা অনুধাবনযোগ্য। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়ার উপলব্ধিকর উপস্থিতি দৃশ্যমান। এছাড়া রাশিয়ার নিকট প্রতিবেশী, একদা সোভিয়েত ইউনিয়নের

অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতি রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি বর্তমান বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইউক্রেনের প্রতি রাশিয়ার কড়া মনোভাব এবং মালয়েশিয়ান বিমানের দুর্ঘটনা (২০১৪) বিশ্ব রাজনীতিতে ঝড় তোলে। এছাড়া যেহেতু বর্তমান রাশিয়া পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরী, সেহেতু তার পূর্বতন বিদেশনীতি, চুক্তিসমূহ, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও তার বাধ্যবাধকতা কিয়দংশে নিজের বলে গ্রহণ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমদিকে রাশিয়ার বিদেশনীতিতে সংশয় ছিল তবে তা ধীরে ধীরে দূর হয় এবং এক ক্রমবর্ধমান পরিণত বিদেশনীতি হিসেবে প্রতিভাত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই আমেরিকার সঙ্গে টক্কর লাগছে যাকে মাঝে মাঝেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেই রাশিয়ার ভূমিকা পর্যালোচনা করা তাই প্রয়োজন। এই এককে ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন সোভিয়েত বিদেশনীতি ও ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর কালীন রাশিয়ার বিদেশনীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ইয়েলৎসিন ও পুতিনের বিদেশনীতির অবস্থানও বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৩ ঠাণ্ডাযুদ্ধ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতি

সাম্প্রতিককালের রাশিয়ার বিদেশনীতি পর্যালোচনা করার প্রারম্ভে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময়কার বিদেশনীতিও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দেখা যায় একদা মিত্র-শক্তির অংশ আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িয়ে পড়ে এক বিশ্ব আধিপত্যের লড়াইয়ে যা ইতিহাসে ঠাণ্ডা লড়াই বা ঠাণ্ডা যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত।

ঠাণ্ডা যুদ্ধে অদ্ভুতভাবে দেখা যায় বিশ্বরাজনীতির দ্বিমেরুকরণ। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের 'প্রভাবের বৃত্ত' (Sphere of influence) আয়ত্তে রাখবার জন্যে একে অপরকে টক্কর দিতে সচেষ্ট হয়। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি যেমন পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া আমেরিকার প্রভাবের বৃত্তের অন্তর্গত ছিল ও পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি যেমন রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড ইত্যাদি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবের বৃত্তের মধ্যে ছিল। কমিউনিস্ট প্রসার রুখতে আমেরিকা 'Truman Doctrine' ও 'Marshall Plan'-এর মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিকে নিজের প্রভাবের বৃত্তের মধ্যে টানতে সচেষ্ট হয়। রাশিয়া প্রত্যুত্তরে সূচনা করে 'Molotov Plan'। এরপর ১৯৪৮ বার্লিন সংকটের (Barlin Blockade) ফলে দু'দেশের সম্পর্ক তিক্ততর হয় এবং তা চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৪৯ সালে আমেরিকার নেতৃত্বে North Atlantic Treaty Organization (NATO) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

দুই শক্তির দ্বন্দ্ব ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা ছড়িয়ে পড়েছিল এশীয় দেশগুলির মধ্যেও। ১৯৫০ সালের কোরিয়ার যুদ্ধ, ইন্দোচিনের রাজনৈতিক চাপান-উতর বিশেষ করে ভিয়েতনামকে ঘিরে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও তাইওয়ান বিরোধ এবং আমেরিকার তাইওয়ান নীতি, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা ও 'Suez Crisis' সব কিছুই দুই শক্তির সম্পর্কে তিক্ততা বাড়িয়ে দেয়। বহু সামরিক বা নিরাপত্তা চুক্তি দুই ক্ষমতাশালী দেশের নেতৃত্বে স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ANZUS (১৯৫১), South East Asian Treaty Oganizatioin (SEATO, ১৯৬৪), Middle East Defence Oganizatioin (MEDO, ১৯৫৫), Baghdad Pact (১৯৫৫) ইত্যাদি। সবগুলিই হয় আমেরিকার উদ্যোগে। রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫৫ সালে Warsaw Pact স্বাক্ষরিত হয়। তবে ঠাণ্ডাযুদ্ধ তীব্রতর হয় ১৯৬২ সালে। কিউবাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত অবস্থা যেটি ইতিহাসে 'Cuban Missile Crisis' হিসেবে পরিচিত। সৌভাগ্যবশত পৃথিবী রক্ষা পায়

একটি পারমাণবিক যুদ্ধের হাত থেকে এবং দুই শক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় দাঁতাত (Detente) বা একটি পারস্পরিক সমঝোতার প্রয়াস। মোটামুটি ১৯৬২-১৯৭৯ এই সময়কাল অবধি চলে এই দাঁতাত যদিও মাঝে মাঝে উত্তেজনা ছড়ায় চেকস্লোভাকিয়া (১৯৬৭), ভারত-পাক যুদ্ধ (১৯৬৫-৬৬) এবং মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইজরায়েলী যুদ্ধ ঘিরে। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণের ফলে শুরু হয় নয়া-ঠাণ্ডা যুদ্ধ। দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটে অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক এবং নামিবিয়াতে সোভিয়েত কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে। এই নয়া-ঠাণ্ডা যুদ্ধে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রনাল্ড রেগ্যানের Strategic Defence Initiative (SDI) বা Star Wars নতুন মাত্রা যোগ করে এবং দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের সম্পর্কের উত্তেজনার পারদও বাড়িয়ে দেয়। রনাল্ড রেগ্যান সোভিয়েত রাশিয়াকে 'Evil Empire' বলে অভিহিত করেন। তবে গর্বাচভের 'New Thinking' কিছুটা সম্পর্কের তিক্ততা উপশম করতে সক্ষম হয়। মিখাইল গর্বাচভ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় উদার অর্থনীতির ধারণা প্রযুক্ত করার সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কার সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হন। তাঁর প্রবর্তিত 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রোয়িকা' নীতি অনেকাংশে ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণকে স্তিমিত করে। গর্বাচভের বিদেশনীতিতে যে নয়া চিন্তাধারা দেখা দিয়েছিল তার ফলস্বরূপ দেখা গেল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের উপর তার আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত করায় সচেষ্ট হল। চীনের সঙ্গেও সুসম্পর্ক স্থাপনে যত্নবান হল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিণতির দিকে গেল। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে Reykjavik Summit সবথেকে উল্লেখযোগ্য যেখানে রেগন ও গর্বাচভ বিশ্বরাজনীতি ও দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৮৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়কালে Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) চুক্তিতে গর্বাচভ স্বাক্ষর করেন। ১৯৯১ সালে Moscow Summit আয়োজিত হয় এবং এই বৈঠকে Strategic Arms Reductioni Talks (START) স্বাক্ষরিত হয় দুই দেশের মধ্যে।

তারপর অবশ্য নাটকীয় ভাবে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বরিস ইয়েলেৎসিন অপসারিত করেন গর্বাচভকে। কিন্তু এই ঘটনার গতিপ্রকৃতির সাথে সাথে জটিল হতে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আঞ্চলিক রাজনীতি। ক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের অখণ্ডতা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে ও বিভক্তিকরণের দিকে এগিয়ে যায়। আরমেনিয়া, আজারবাইজান, এস্টোনিয়া, বাল্টিক অঞ্চল, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া বেলারুশসহ, কেন্দ্রীয় এশিয় প্রজাতন্ত্রসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরও আকারের দিক থেকে রাশিয়ান ফেডারেশন পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার গুরুত্ব আজও বিরাজমান।

৪.৪ ইয়েলেৎসিনের অধীনে রাশিয়ার বিদেশনীতি

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরবর্তী সময়ে প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন বরিস ইয়েলেৎসিন। তার সময়কার বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে বিশ্বরাজনীতিতে রাশিয়া বেশ কিছুটা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ছায়া বহু অংশে রাশিয়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার বৃহৎ শক্তির তকমায় জোর ধাক্কা লাগে এবং একমেরু বিশ্বে রাশিয়ার অবস্থান কি হবে এবং তার সঙ্গে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যা কিভাবে মিটবে এইগুলিই অগ্রাধিকার পেয়েছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর রাশিয়ার বিদেশনীতিতে।

প্রথম পদক্ষেপে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী Andrey Kozyrev, ১৯৯২ সালে ঘোষণা করেন যে ইয়েলেৎসিনের পূর্বসুরী গর্বাচভের 'New Thinking' থেকে বেশ কিছুটা সরে আসবে রাশিয়া এবং নতুন আঙ্গিকে ভাববে। 'সমাজতান্ত্রিক' (Socialist) নীতির জায়গায় গণতান্ত্রিক (democratic) নীতি দ্বারা বিদেশনীতি পরিচালিত হবে, নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করবে জাতীয় স্বার্থ এবং রাশিয়ার বিদেশনীতি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মত সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বারা আর পরিচালিত হবে না। সেই মর্মে রাশিয়া পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতা বাড়াতে তৎপর হয়েছিল। ইয়েলেৎসিন আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'rapproachement' ছাপিয়ে 'Partnership' তৈরি করাতে আগ্রহী ছিলেন। রাশিয়ার ক্ষয়িষ্ণু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে এই 'Atlanlicist' পক্ষপাত জরুরী হয়ে পড়েছিল তাই পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে আপোষের সম্পর্ক গড়ে তুলতে রাশিয়া বাধ্য হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে তাই রাশিয়া 'Pro-western' বিদেশনীতি কার্যকর করে। ১৯৯২ সালে ইয়েলেৎসিন ও বুশ (Sr) 'Charter of Russian–American Partnership and Friednship' স্বাক্ষর করেন যার মূল লক্ষ্য ছিল 'indivisibility of the security of North America and Europe' এবং একটি যৌথ অঙ্গীকার গৃহীত হয় যার উদ্দেশ্য 'democracy, the supremacy of law... and support for human rights.' কিন্তু বিদেশনীতির অস্বচ্ছতা ও সঠিক দিক নির্দেশের অভাব কার্যত রাশিয়ার বিদেশনীতিকে চাপের মুখে ফেলে দেয়। তার সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, অর্থনৈতিক সংস্কারের কুপ্রভাব এবং আমেরিকার সাহায্যের অপ্রতুলতা রাশিয়াকে ঘরের মধ্যেই সমালোচনার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ফলে ১৯৯২ সালে Kozyrev 'Supreme Soviet' বা রাশিয়ার সংসদে উপস্থাপন করেন কিন্তু তা সংসদ দ্বারা গৃহীত হয়নি। আরও একটি খসড়া Ministry of Foreign Affairs প্রস্তুত করে কিন্তু সেটিও সমালোচিত হয়। অবশেষে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে Interdepartmental Foreign Policy Commission, যেটি 'Security Council' গঠন করে, সেটি যে বিদেশনীতির ধারণা তুলে ধরে সংসদ তাতে সম্মতি দেয়। এই নীতিগুলির মধ্যে বাজার-অর্থনতি প্রতিষ্ঠাকল্পে ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভ, স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে কমনওয়েলথ-এর একাত্মতা বিধান, মধ্য ইউরোপ সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বৃহৎশক্তি হিসাবে রাশিয়ার ভূমিকা লংক্ষণীয় ছিল।

সবথেকে বেশি রাশিয়া নজর দেয় CIS দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উপর। এই CIS দেশগুলির পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের 'Southern Periphery' ছিল। এই রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাথে রাশিয়া তার এই দক্ষিণাঞ্চলের উপর আধিপত্য হারায় এবং এর সঙ্গে রাশিয়া এই রাষ্ট্রগুলির জলপথ, বন্দর ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপরও অধিকার হারায়। তাই ১৯৯৩ সালের প্রবর্তিত রাশিয়ার বিদেশনীতির ক্ষেত্রে, CIS-এর অভ্যন্তরে 'Unfiled Military Strategic Space'-কে শক্তিশালী করা যেমন হয়ে গেল মুখ্য সেরকম এই অঞ্চলে রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থরক্ষা করাও জরুরী হয়ে দেখা দিল।

তবুও রাশিয়ার বিদেশনীতি রূপায়ণের মধ্যে কোনো সঙ্গতি বা নির্দিষ্ট কোনো নীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম পর্যায়, নব্বই দশকের গোড়ার দিকে, পশ্চিমী শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে আপোষের পথে হাঁটে রাশিয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ রাশিয়ার বিদেশনীতি অধিকতর জাতীয়তাবাদী হিসাবে প্রতিভাত হয়। বসনিয়া ও সার্বিয়ানদের মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভূমিকা পশ্চিমী দেশগুলির পরিপন্থী ছিল। তবুও শেষ পর্যন্ত ইয়েলেৎসিন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে ও পশ্চিম দেশগুলি কর্তৃক NATO হামলার ফলে শান্তি প্রক্রিয়ায় সম্মতি দেন। ১৯৯৫-৯৬ মধ্যকার সময়কালে আবার এই জাতীয়তাবাদী নীতি বিসর্জন দিয়ে রাশিয়া পশ্চিমী শক্তিধর দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও ইতিবাচক সম্পর্কের উপর জোর দেয়।

১৯৯৫-৯৬ সলের মধ্যকার সময়কালে রাশিয়া বিভিন্ন শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতার উপর জোর দেয়। G-7, Oganizaion for Security and Cooperation in Europe (OSCE), রাষ্ট্রপুঞ্জ ও NATO-এর সাথে সহযোগিতা কার্যকরী করার প্রয়াস চালায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও NATO-র সম্প্রসারণের বিষয়টি রাশিয়াকে অস্বস্তিতে ফেলে। রাশিয়া এই সময় 'real partnership in all directions' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, চীন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে। একথাও ইয়েলেৎসিনের বক্তব্য থেকে অনেক ক্ষেত্রে পরিষ্কার হয় যে CIS এবং পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে রাশিয়ার বিদেশনীতি 'Balance of Interest' বা স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রেখে চলবে।

রাশিয়ার বিদেশনীতিতে নতুন দিক নির্দেশের আরেক অধ্যায় শুরু হয় ১৯৯৬ সালে ইয়েলেৎসিনের পুনর্নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। পূর্বতন বিদেশ মন্ত্রী Kozyrev ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Pavel Grachev-এর জায়গায় Yevgeny Primakov এবং জেনারেল Alexander Lebed-কে বিদেশমন্ত্রী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ রাশিয়ার বিদেশনীতিকে বাস্তবসম্মত করে তোলে। তবে জেনারেল Lebed-এর উচ্চাশা ও সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কার ফলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। Primakov ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিদেশমন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৯৮ সালে উনি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও Primakov-এর বিদেশনীতি পরিচালনা করতে অসুবিধা হয় কারণ ইয়েলেৎসিনের প্রশাসনে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। তবুও ইয়েলেৎসিন সরকার একটি জাতীয় নিরাপত্তা-সংক্রান্ত খসড়া ঘোষণা করেন যার মূল্য উপপাদ্য বিষয় ছিল আমেরিকার সঙ্গে কৌশলগত এবং সামরিক সমতার ভাবনা পরিত্যাগ করা, পারমাণবিক অস্ত্রাগার হ্রাসকরণ ও CIS-এর মধ্যে যৌথ নিরাপত্তার ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু এই সময়ে ১৯৯৯ সালে Kosovo যুদ্ধ ও NATO-র সামরিক হানা রাশিয়ার সাথে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্ক তিক্ত করে। ১৯৯৪ সাল থেকে চেচেনিয়া নিয়ে রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাব এবং রাশিয়ার Grozny আক্রমণ বিশ্ব রাজনীতিতে সমালোচিত হয় এবং কড়া প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটায়। অবশেষে আন্তর্জাতিক বিশেষত মার্কিন চাপের ফলে ইয়েলেৎসিনের সরকার যুদ্ধবিরতি 'cease fire' ঘোষণা করে চেচেনিয়ার সঙ্গে ১৯৯৬ সালে। ইয়েলেৎসিন সরকার রাশিয়ার নড়বড়ে বেহাল অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েও নাজেহাল হয়ে পড়ে। ১৯৯৫ সালে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের প্রয়াসে ইয়েলেৎসিন আরেক দফা বেসরকারিকরণ আরম্ভ করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল রাশিয়ার অথনীতিতে নগদ সঞ্চালন (Cash infusion)। এর ফলে কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারি সম্পত্তির আধিকারিক হয়ে গেলেন। এদেরকে 'Oligarchs' বলা হত এবং এই 'Oligarchy' ভীষণ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। সবদিক থেকে বিপর্যস্ত ইয়েলেৎসিন সরকার রাশিয়ার পূর্বসুরী সোভিয়েত ইউনিয়নের মত বৃহৎশক্তির ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়নি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে উত্তরণও সঠিকভাবে হয়নি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতেও ইয়েলেৎসিন ব্যর্থ হয়। অবশেষে হঠাৎই ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে ইয়েলেৎসিন নিজের পদত্যাগ ঘোষণা করেন। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে Vladimir Putin রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হন।

৪.৫ পুতিন ও সমসাময়িক বিশ্ব রাশিয়া

ইয়েলেৎসিনের উত্তরসুরী হিসেবে ২০০০ সাল থেকে ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন।

তিনি ২০০০-২০০৪, ২০০৪-০৮ সাল এবং ২০১০ থেকে এখনও (২০১৬) পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের স্বাক্ষর রেখেছেন। মাঝে শুধু ২০০৯-১০, এই স্বল্প সময়ের জন্য মেভেদের রাষ্ট্রপতি ও পুতিন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

পুতিন তাঁর বিদেশনীতি সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা তাঁর 'Foreign Policy Concept of the Russian Federation' (FPCRF) মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। ২০০০ সালের ২৮ জুন প্রেসিডেন্সিয়াল আদেশে FPCRF গৃহীত হয়। এর মূল বক্তব্য ছিল যে একপাক্ষিক (আমেরিকার) বিশিষ্ট কৌশল পৃথিবীতে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে তাই রাশিয়া সর্বান্তকরণে চেষ্টা চালাবে বহু মেরু বিশিষ্ট বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে। ইয়েলিৎসিনের সময়ের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে পুতিনের শাসনকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়া তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হয়। পুতিন সুদৃঢ়ভাবে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের রাশ ধরেন। আভ্যন্তরীণভাবে রাশিয়ার ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য পুতিন বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন।

ইয়েলিৎসিনের অবসর গ্রহণের পর পরই যেহেতু পুতিন রাষ্ট্রপতিপদে আসীন হন সেইহেতু তিনি রাশিয়ার নব্য বাজার নীতির সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। ১৯৯৯ সালেই রাশিয়ার GDP 6.4% ছুঁতে পেরেছে। পুতিন ২০০০ সালে শুরু করেন দ্বিতীয় প্রজন্মের (Second generation) বাজার সংস্কারনীতি। তার অভিনব কর ব্যবস্থার সংস্কার, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি শিল্প বিষয়ক ও কৃষিজমি বিষয়ক নীতি অনেকাংশে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। এর সঙ্গে চড়া দামে খনিজ তেলের দাম বিশ্ববাজারে উর্ধমুখী হলে রাশিয়ার আয়ও ২০০০ সালের পর থেকে বৃদ্ধি পায়। বাস্তবে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অস্ত্র বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বিক্রয়ের মাধ্যমেই রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু ২০০৩-০৪ সাল নাগাদ পুতিন সংস্কারের চাকার গতি বিপরীতমুখী করেন। এর নেতিবাচক প্রভাব কিছুটা হলেও রাশিয়ার অর্থনীতিতে পড়ে। তিনি আবার 'renationaltionalization' নীতি প্রবর্তন করেন এবং বৃহৎ তেল কোম্পানিগুলি যেমন Yukos Oil Company-কে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনেন। ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার অর্থনীতি একটা মর্যাদাপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা রাশিয়ার অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৩ সালে রাশিয়ার GDP 1.3% দাঁড়িয়েছিল। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার সঙ্গে ক্রাইমিয়ার সংযুক্তিকরণ হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একপ্রস্থ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয় রাশিয়া। এর প্রভাব রাশিয়ার অর্থনীতির উপর ভীষণভাবে পড়েছে। এই সঙ্কটকে পুতিন তাকে অসুবিধেতে ফেলার উদ্দেশ্যে পশ্চিমী শক্তিদের একটা চক্রান্ত হিসাবে দেখাতে চাইছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ২০০০ সাল থেকে রাশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। ২০০১ সালে আমেরিকায় ৯/১১ নাশকতামূলক আক্রমণ ও তার পরবর্তীকালে আমেরিকা ঘোষিত 'War on Terror' এবং আফগানিস্তান ও ইরাকের উপর আক্রমণ একটি মুখ্য ঘটনা বিশ্বরাজনীতিতে। ২০০১ সালে মধ্য এশিয়ার জোট শক্তির সামরিক ঘাঁটি করতে আমেরিকার প্রচেষ্টাকে রাশিয়া বাধা দেয়নি। কিন্তু আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করতে উদ্যত হলে রাশিয়া তার বিরোধিতা করে এবং ইরাকের উপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বলে, পরবর্তীকালে অবশ্য দেখা যায় সত্যিই আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিচ্ছে। ২৬ মে, ২০০২ রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে 'Stratetgic Offensive Reduction Treaty (SORT) বা 'Moscow Treaty' স্বাক্ষরিত হয়। সারবিয়া থেকে কসোভোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় রাশিয়ার সমর্থন ছিল না। এই নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির মনোমালিন্য হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় NATO সম্প্রসারণের বিষয়টি। মধ্য এশিয়ার বিশাল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার পশ্চিমী দেশগুলিকে বিশেষত

আমেরিকাকে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। এই উদ্দেশ্য আমেরিকার সক্রিয় ভূমিকার ফলে NATO ধীরে ধীরে মধ্যএশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য 'Partnership For Peace (PFP) Programme' শুরু করেছে। 'Individual Partnership Actions Plans (IPAPs)' শুরু হয়েছে জর্জিয়া, আজারবাইজান ও কাজাকস্তানের সঙ্গে। রাশিয়া তাই চিন্তিত তার মধ্য এশিয় প্রতিবেশীদের নিয়ে। মাঝে মাঝে সংঘাতেও জড়িয়ে পড়ছে তাদের সঙ্গে যেমন ২০০৮ সালে সংঘটিত হয় রাশিয়া-জর্জিয়া যুদ্ধ দক্ষিণ ওসেতিয়াকে ঘিরে। আবার ২০১৪ সালে ইউক্রেনের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত বিশ্ব রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্রাইমিয়া ছিল রাশিয়ারই অন্তর্গত। ১৯৫৪ সালে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই ইউক্রেনের অংশ হিসেবে ক্রামিয়াকে রাখা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে স্বাধীন ইউক্রেনের অংশ হিসেবে 'Autonomous Republic of Crimea' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ই মার্চ ২০১৪ সালে বহু বিতর্কিত ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাশিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে ক্রাইমিয়া সংযুক্ত হয়। আমেরিকা ও পশ্চিমী শক্তিধর দেশগুলি ক্রাইমিয়ার এই ঘটনাটি সাধারণভাবে নিতে পারেনি। আর তাই রাশিয়ার উপর নেমে এসেছে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা।

চেচেনিয়া নিয়ে তো রাশিয়ার প্রতি বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলি বিরূপ ছিল আগে থেকেই। আর এখন ক্রাইমিয়া পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কে অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

২০১১ সলের উত্তর আফ্রিকার 'Jasmine revolution'-এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে লিবিয়া, সিরিয়া ও ইয়েমেনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্রিয় হয়। আমেরিকা লিবিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি পরিগ্রহণের হেতু এক প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পাশ করাতে গেলে রাশিয়া, চীন, ভারত ও আরও কয়েকটি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকে। রাশিয়ার উদ্যোগে অনেকগুলি নতুন বহুপাক্ষিক ফোরাম বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে যেমন SCO, NATO-Russia Council, BRICS, Collective Security Treaty Oganization (CSTO), Commenwelath of Independent States (CIS), G-8, G-20, APEC, রাষ্ট্রপুঞ্জের মত সংগঠনগুলি।

অতি সম্প্রতি রাশিয়ার ইউক্রেনের প্রতি মনোভাব ও কার্যকলাপ এবং মালয়েশিয়ার বিমানের মাঝ আকাশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পশ্চিমী দুনিয়া স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ পুতিনকে কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ২০১৪ সালের G-20 সম্মেলনে পুতিনকে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়তে হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপ্রধানেরা খোলাখুলি পুতিনের সমালোচনা করেছেন। ক্রাইমিয়ার রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তিকরণ সৃষ্টি করেছে রাশিয়ার অর্থনীতিতে ব্যাপক সঙ্কটের। এমতাবস্থায় রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিধর দেশগুলির বিশেষত আমেরিকার সম্পর্ক কোন পর্যায়ে যায় তা সময়ই বলে দেবে।

তবে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক সত্ত্বেও রাশিয়া কোনো উগ্রনীতি গ্রহণ করেনি। বরং পুতিন ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন ভারত সফরে আসেন তখন রাশিয়া-ভারতের মিত্রতা যে মজবুত ভিতের উপর গড়ে উঠেছে তা তিনি স্বীকার করেন। ইরানের পারমাণবিক শক্তি নিয়ে যে কর্মসূচি তাতে রাশিয়ার ইন্ধন আমেরিকা কোনোদিনই ভালভাবে নেয়নি। রাশিয়ার ইরানের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনকে ঘিরে যদিও আমেরিকার সঙ্গে তীব্র বিরোধ তবুও কখনো রাশিয়া সংঘাতের পথে হাঁটেনি। তাই বার বার যে ব্যাপার পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা হল যে রাশিয়া বিশ্বে নিজের একটা সম্মানজনক স্থান ধরে রাখার প্রয়াসে কোনোভাবেই আমেরিকা বা পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কে যেতে চাইছে না। বরং মার্কিন কর্তৃত্ববাদ প্রতিহতকরণের লক্ষ্যে চীন এবং ভারতকে সঙ্গে নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাল্টা ভারসাম্য সৃষ্টি করতে উদ্যোগী।

৪.৬ সারাংশ

১৯৯১ সালে ২৫শে ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, বর্তমান রাশিয়ান ফেডারেশনের জন্ম হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান বলে চিহ্নিত এই সময়ে আমেরিকা 'বৃহৎ শক্তি' হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এই একমেরুকৃত বিশ্বে রাশিয়ার প্রাথমিকভাবে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হলেও ধীরে ধীরে রাশিয়া আবার তার উপস্থিতি অনুভব করাতে সক্ষম হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে রাশিয়ার বিদেশনীতি বহুলাংশে ঠাণ্ডা যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমেরিকা ও রাশিয়া, দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্র, বিশ্ব দখলের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। তবে গর্বাচভের রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি হিসাবে শাসনকালে, তাঁর 'New thinking' এই উত্তেজনামূলক সম্পর্কের কিছুটা উপশম করে। পরে নাটকীয়ভাবে গর্বাচভের অপসারণ ও ইয়েলেৎসিনের ক্ষমতায় আসা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের নয়া হিসাব নিকাশের সূচনা করে। ইতিমধ্যে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়। পতনের পরবর্তী সময়ে প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন ইয়েলেৎসিন। তাঁর সময়ে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি দিগ্‌ভ্রান্ত ও খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে তাঁর উত্তরসূরী রাষ্ট্রপতি পুতিনের সময় রাশিয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছে। একদিকে যেমন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনে বা ফোরামে, রাশিয়া নিজের উপস্থিতি অনুভব করাতে বাধ্য করছে, অপরদিকে তেমন আমেরিকার একাধিপত্য মোকাবিলায় চীন ও ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছে। তবে ইউক্রেন নিয়ে পুতিনের নীতি বা ক্রাইমিয়ার রাশিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক তিক্ত করেছে। অনেকেই এর মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত বলে মনে করছেন।

৪.৭ প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী:

১. ঠাণ্ডা-যুদ্ধকালীন বিশ্বে রাশিয়ার বিদেশনীতি পর্যালোচনা করুন।

২. পুতিন ও রাশিয়ার ভূমিকা সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষিতে আলোচনা করুন।

৩. বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার ভূমিকা আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী:

১. ইয়েলেৎসিনের সময়কার রাশিয়ার বিদেশনীতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২. ঠাণ্ডা-যুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:

১. ঠাণ্ডাযুদ্ধের সময় দুই শক্তিজোটের নেতৃত্বে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বা নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার উল্লেখ করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Nalbandov Robert *'Not by Bread Alone: Russian Foreign Policy under Putin'*, Potomac Books, 2016.
2. Oliker Olga, Crane Keith, Schwartz Lower H., Yusupov Catherine, *'Russian Foreign Policy: Sources and Implicationis'* Rand, 2009.
3. Emmanuelle Armandon, *'Popular Assessments of Ukraine's Relations with Russia and the European Union under Yanukovych', Demokratizatsiay,* Vol. 21, No. 2, Spring 2013.
4. Mankooff Jeffrey, *'Russian Foreign Policy: The Return of Great Power'*, Rowman and Litlefield publishing Group, Inc, Maryland, 2009.
5. Sergunin Alexander (ed.,), *'Explaning Russian Foreign Policy Behavior: Teory and Practice'*, ibidem Press, Germany, 2016.
6. Kordonsky Simon, *'Socio-Economic Foundations of the Russian Post-Soviet Regime: The Resource-Based Economy and Estate-Based Social Structure of contemporary Russia'*, ibidem Press, Germany, April 2016.

পর্যায়—৩

বিদেশনীতি

একক ১ ❑ বিদেশনীতি অনুধাবনের জন্য ধারণাগত কাঠামো

একক ২ ❑ বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ

একক ৩ ❑ বিদেশনীতির দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ—জনমত, আইনসভা রাজনৈতিক দলসমূহ, স্বার্থগোষ্ঠী সমূহ এবং আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

একক ৪ ❑ বিদেশনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

একক ১ ☐ বিদেশনীতি অনুধাবনের জন্য ধারণাগত কাঠামো

গঠন

১.১ লক্ষ্য সমূহ
১.২ প্রাক্‌কথন ও ভূমিকা
১.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিদেশনীতি বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা
১.৪ বিদেশনীতি অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন ধারণাগত কাঠামো
১.৪.১ কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে উৎসারিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ
১.৪.১.১ বাস্তববাদ
১.৪.১.২ নব্য উদারনীতিক প্রাতিষ্ঠানিকবাদ
১.৪.১.৩ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ
১.৪.২ প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ
১.৪.২.১ মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ
১.৪.২.২ সম্ভাবনার তত্ত্ব
১.৪.২.৩ আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি
১.৪.২.৪ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
১.৪.৩ সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রোথিত দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ
১.৪.৪ ব্যাখ্যামূলক একক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে প্রোথিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ।
১.৫ বিদেশনীতির ধারণা কাঠামোগুলির অন্যান্য রূপসমূহ
১.৬ বিভিন্ন ধারণা কাঠামো সমূহের সংশ্লেষ সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ
১.৭ সারসংক্ষেপ
১.৮ অনুশীলন
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী
১.১০ অন্যান্য গ্রন্থ উৎসসমূহ

১.১ লক্ষ্য সমূহ

এই একক পাঠের প্রধান লক্ষ্য সমূহ হল নিম্নরূপ—

- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে একটি শাখার বড় উপক্ষেত্র হিসেবে বিদেশনীতির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে সাহায্য করা।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিদেশনীতির বর্তমান মর্যাদা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
- সাম্প্রতিক আলোচনার আলোকে বিদেশনীতির সংজ্ঞা সমূহ এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত করা।

- বিদেশনীতির বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগত কাঠামো সমূহ সম্পর্কে অবহিত করা এবং একটি প্রয়োগযোগ্য কাঠামো প্রদান করা।
- কাঠামোগত বা সংস্থানবাদী প্রেক্ষিত থেকে উৎসারিত দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ সম্পর্কে অবহিত করা।
- প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রেক্ষিতের মধ্যে প্রোথিত বিদেশনীতির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবহিত করা।
- সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিতের মধ্য থেকে উঠে আসা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- বিভিন্ন কুশীলবের আচরণ ব্যাখার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ সম্পর্কে অবহিত করা।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিভিন্ন তত্ত্বের তাত্ত্বিক সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে সচেতন করা।
- অধি-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতগুলির সংশ্লেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে যে অন্তর্নিহিত সমস্যা ও সম্ভাবনা রয়েছে তা দেখানো।

১.২ প্রাক্‌কথন ও ভূমিকা

বিদেশনীতি হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাধারণ ক্ষেত্রের একটি উপক্ষেত্র যা কেবল রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিক, আমলা এবং এলিটদের নিয়েই আলোচনা করে না, সাধারণ জনগণকে নিয়েও আলোচনা করে। কেননা, ঐ সাধারণ মানুষের ভাগ্যও প্রায়শই নির্ধারিত হয় ক্ষমতার বদ্ধ অলিন্দে নীতি-নির্ধারকদের গোপন কার্যকলাপের মাধ্যমে। সেই কারণেই, কীভাবে, কোন কোন বাধার প্রতিক্রিয়া ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে বিদেশনীতি সমূহ রচিত হয়—এই বিষয়গুলি যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র-ছাত্রীদের জানা জরুরী, ঠিক তেমনি বিদেশনীতি গঠনের প্রধান প্রধান নিয়ামকগুলি কী কিংবা কী ধরণের রাজনীতি এই নীতি গঠনে জড়িত সে বিষয়টিও তাদের পক্ষে জানা জরুরী। এই কেকে আমরা প্রথমেই বিদেশনীতির আলোচনায় বিভিন্ন বিদ্যমান ধারণা-কাঠামো সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব যাতে বিদেশনীতি কী—সে বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। এভাবে অগ্রসর হলে, আমরা বিদেশনীতির ধারণাটি সবচাইতে ব্যাপক এবং সুপ্রযুক্ত ধারণা-কাঠামোটি পেতে পারি, যা আমাদের আলোচনা-বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক। এর জন্য, প্রথমেই আমরা স্পষ্ট করে নিতে চাই যে, কেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অথবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিদেশনীতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং কেনই বা বিদেশনীতি-বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ক্ষেত্র।

১.৩ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিদেশনীতি বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা

এই এককে আমরা বিদেশনীতির ধারণাটি কী তা বোঝার চেষ্টা করব। তারপর, বিদেশনীতিকে বোঝার জন্য যে সমস্ত প্রচলিত ধারণা-কাঠামোগুলি রয়েছে তা অনুধাবনে সচেষ্ট হব। এর উদ্দেশ্য হল এই যে, প্রচলিত ধারণা-কাঠামো সমূহ সম্পর্কে অবহিত হলে তবেই আমরা আমাদের আলোচনা বিশ্লেষণের জন্য সবচাইতে ব্যাপক ও সুপ্রযুক্ত ধারণাগত কাঠামোটি পেতে পারি। তবে, প্রথমেই এটি স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অথবা এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিদেশনীতির ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কী না এবং বিদেশনীতির বিশ্লেষণে উপযুক্ত বিষয় দু'টিতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরিধি দখল করে আছে কী না। কারণ,১৯৭৫ সালে

প্রকাশিত বিশালাকার আট খণ্ডের *Handbook of Political Science*-এ ওয়াল্টার কার্লসনেস (Walter Carlsnaes) দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন Barnard C Cohen ও Scott A. Harris-এর বিদেশনীতির উপর লিখিত অধ্যায়টির প্রতি, যেটি 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি' যে খণ্ডে রয়েছে সে খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করে তাকে 'নীতি সমূহ ও নীতি নির্ধারণ' এই শিরোনামাঙ্কিত খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি, খুব বেশি দিন নয়, এই ২০০২ সালেও কার্লসনেস তাঁর লেখায় স্বীকার করেছেন যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি সম্ভাবনাময় আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে বিদেশনীতি যে প্রশ্নাতীতভাবেই কোন নীতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের নয়, বরং আন্তর্জাতিক সম্পর্কেরই একটি অবিচ্ছেদ্য আলোচনার শাস্ত্র বিদেশনীতি বিশ্লেষকদের এই সরল আশাবাদ ও আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও এটা বলা কঠিন যে, বিদেশনীতির আলোচনা-বিশ্লেষণ বর্তমানে তর্কাতীতভাবে পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে কার্লসনেস উল্লেখ করেন যে, নয়ের দশকের অ্যাকাদেমিক জার্নালগুলির সূচীর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, বিদেশনীতির ধারণাটি বড় কোন বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্যই হয়নি। বরং বলা চলে যে, যে দ্রুততার সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন নতুন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটেছে, বিদেশনীতি পৃথক বিষয় হিসেবে কখনই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 'বিদেশনীতি'-র এই প্রান্তিকীকরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন Alexander Wendt দাবী করেন যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব সমূহকে সেই সমস্ত বিদেশনীতির তত্ত্ব সমূহ থেকে পৃথক করার প্রয়োজন, যেখানে শেষোক্ত জনেরা কেবল রাষ্ট্রগুলির আচরণ ব্যাখ্যা করার কাজেই ব্যস্ত। এবং তাঁর এই বক্তব্যের পক্ষে সওয়ালে Kenneth Waltz-কে—যিনি নব্য বাস্তববাদের বিখ্যাত প্রবক্তা—সঙ্গী করে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি বিদেশনীতি নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেই তাঁর অ্যাকাদেমিক অর্থাৎ বিদ্যাচর্চাগত গবেষণার বিষয় ক্ষেত্র হিসেবে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী (Wandt 1999:11, in Carlsnaes: 2002, 331)। এখানে বলা প্রয়োজন যে, Wendt প্রমুখের এই অস্বীকৃতি শক্তি সঞ্চয় করেছিল বিদেশনীতির গবেষকদের নিজেদের আস্থাহীনতা থেকেই। এঁদের মধ্যে একজন Brain White এই সময়টিকে বিদেশনীতি বিশ্লেষকদের কাছে পরীক্ষামূলক (testing) সময় হিসেবে বিবেচনা করে মন্তব্য করেন যে, এখনও এই বিতর্কই চলছে যে বিদেশনীতির ক্ষেত্রটি আদৌ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি উপক্ষেত্র কী না অথবা রাষ্ট্রের আচরণ বোঝা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীগুলির দ্বারা বিদেশনীতির আলোচনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিটি একটি অকার্যকর অচল পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে কী না (White, 1999:97, ibid, 331-333)। অন্য একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, 'বিদেশনীতি'-র ধারণাটি 'ধারণাগত সঙ্কটের' শিকার যা একধরণের তাত্ত্বিক জাড্যের মধ্যে আবদ্ধ (Schneider, 1997:332, ibid)।

তবু এইসব তাত্ত্বিক অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও, এমন কি বিদেশনীতি তাত্ত্বিকদের নিজস্ব আস্থাহীনতার বা আত্ম-সন্দেহের কথা মাথায় রেখেও বলা যায়, বিদেশনীতি বিশ্লেষণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক চৌহদ্দির বাইরে নির্বাসিত হয় নি। দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে 'সেজ' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হ্যান্ডবুক-এ কার্লসনেস নিজে লিখেছেন সেখানে বিদেশনীতি বিষয়ক আলোচনাটি 'Substantive Issues in International Relations' নামক পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। আবার, *Oxford Handbook of International Relations*-এ, যা এর ছয় বছর পরে প্রকাশিত, বিদেশনীতির বিষয়টি যথোচিত অ্যাকাদেমিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, একটি বিভাগ জুড়ে 'Bridging the Subfield Boundaries'-এই শিরোনামে 'আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি', 'সমরকুশলগত বিদ্যাচর্চা', 'আন্তর্জাতিক আইন'-এর সঙ্গে বিদেশনীতি ও আলোচিত হয়েছে (Christian Reus-Smit and Snial, eds., 2008)। অধিকন্তু, এখানে লেখক বিদেশনীতিকে আন্তর্জাতিক

সম্পর্কের অন্যতম প্রধান জনপ্রিয় উপ-ক্ষেত্র হিসেবে দেখিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে লেখক পাঁচটি যুক্তি দেখিয়েছেন যা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বিদেশনীতির অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান বিশেষজ্ঞদের বিস্মিত করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম যুক্তিটি হল এই যে, বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত-গ্রহণের চর্চাটির মধ্যেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে একটি অন্তর্নিহিত আকর্ষণ ও আবেদন রয়েছে যারা, বিশ্বের বর্তমান রূপ ও আকৃতি প্রদানে যে সকল অতীব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও ভূমিকা পালন করেছে, তার প্রক্রিয়াটি জানতে অত্যন্ত আগ্রহী (Stuart, 2008:576)।

আলোচনা মানানসই হয়ে উঠতে পারে সহজেই। প্রথম প্রজন্মের বিদেশনীতি গবেষকরা আবিষ্কার করেন যে, তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তুটি কোন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ বিন্দুতে অবস্থান করে। এই কারণে, কেনেথ ওয়ল্‌জ (Kenneth Waltz)-এর নব্য-বাস্তববাদী দাবিটি অর্থাৎ ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই ত্রি-স্তরীয় বিশ্লেষণের বা তার বাকপ্রতিমার (image) রয়েছে তা বিদেশনীতি চর্চার বৈধতাকে ক্ষুণ্ণ তো করেই না বরং স্টুয়ার্টের মতানুসারে, বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি হল এই যে, উপ-ক্ষেত্র হিসেবে বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের 'স্পষ্ট' আন্তরবিষয়ক প্রকৃতির জন্য অন্যান্য উপ-ক্ষেত্রগুলির থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশনীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি চারটি বিষয়ের আন্তরবিষয়ক সংশ্লেষের ফল, যেখানে প্রত্যেকটি বিষয় থেকে একটি অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে ক্ষমতার ধারণা, সমাজতত্ত্ব থেকে আমলাতন্ত্র ও কর্তৃত্বের ধারণা, জনপ্রশাসন থেকে পরিকল্পনা, নীতিরূপায়ন এবং মাধ্যম (agency)-এর ধারণা এবং উদ্দেশ্য, ব্যক্তিত্বের ধরণসমূহ আর গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত গতিবিদ্যা (group dynamics), ও তৎসম্পর্কিত ধারণা ও বোধসমূহ মনস্তত্ত্ব থেকে আহরিত। দ্বিতীয়ত, বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনার ক্ষেত্রটি স্নায়ুবিজ্ঞান (neuroscience) ও বিবর্তনমূলক জীববিদ্যার (evolutionary biology) গবেষকদের উর্বর গবেষণাক্ষেত্রে বিষয়ের আলোচনা-বিশ্লেষণের বৈশ্লেষনিক হাতিয়ারসমূহকেই ক্ষুরধার করে তোলে।

তৃতীয়ত, কেন বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিতে গবেষণাগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষকদের কাছে যথেষ্ট আবেদনমূলক ও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে; তার কারণ হিসেবে স্টুয়ার্ট বলেছেন যে, এই গবেষণাগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'মধ্য পাল্লার তত্ত্ব' (middle range theory) প্রয়াসের প্রতি ও একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণযোগ্য টুকরো টুকরো তাত্ত্বিক প্রয়াসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেগুলো বৃহৎ সাধারণীকৃত তত্ত্বসমূহ ও অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজ করে।

চতুর্থ কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিদেশনীতির আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যান্য উপক্ষেত্রের অপেক্ষা অধিকতর নমনীয়। কারণ, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অথবা বিষয় হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে ঘটে চলা পরিবর্তন সমূহের সঙ্গে বিদেশনীতির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের তিনটি স্তরকেই স্পর্শ করতে পারে। এবং যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় 'রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনার মডেলটি'-র প্রাধান্য ও প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পেতে শুরু করে, তখনও বিদেশনীতি চর্চার বিষয়টির পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি ঘটেনি। এর কারণ হল এই যে, বিদেশনীতি চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়টি-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত মাত্রাটি-সমানভাবে অবরাষ্ট্রিক, অতিরাষ্ট্রিক ও আন্তরাষ্ট্রিক স্তরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। গবেষক-বিশেষজ্ঞগণ উল্লেখিত বিষয়টির পদ্ধতি সমূহ এবং ধারণাগত পূর্বানুমানগুলিকে অ-রাষ্ট্রীয় এবং অতিরাষ্ট্রিয় এককগুলির বিশ্লেষণে কাজে লাগাতে পারেন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে তাঁদের মূল উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই।

পঞ্চমত, এটা প্রমাণিত যে, বিদেশনীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ অ্যাকাদেমিক জগত ও নীতি-গ্রহণকারী'-দের মধ্যে একটা আদর্শ সেতু বন্ধনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যান্য অনেক উপক্ষেত্রের

মত, যেগুলির জন্ম ও সৃষ্টি অ্যাকাদেমিক জগতে এবং যেগুলিকে বাস্তব বিশ্বরাজনীতির কারবারীরা ঘৃণার চোখে দেখে, সেগুলির তুলনায় বিদেশনীতি চর্চা, যার শিকড়ও রাজনৈতিক বিশ্বের মধ্যেই প্রোথিত, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য (ibid, 576-77)। এটা খুব স্বাভাবিক এই কারণে যে 'কেন রাষ্ট্রসমূহ অথবা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্রের নামে যে এককগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের কার্যপ্রণালী সেভাবেই করে যেমনটি তারা চায়?'—এই প্রশ্নটি কেবল ছাত্র ও গবেষকরাই করেন না, নীতি প্রণেতারাও মনে করে থাকেন। এবং এঁরা সকলেই এই অন্যতম দূরূহ ও জটিল প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে রত। জ্যাকবসন ও জিম্মারম্যান (Jacobson & Zimmerman:3) এর সঙ্গে এই বক্তব্যটি জুড়েছেন যে, এই প্রশ্নটি বিশেষ কতকগুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা 'চূড়ান্ত সাধারণভাবে' উঠেছে কী না; কারণ, এটি 'অ্যাকাদেমিক বিশেষজ্ঞ'-দের পক্ষে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক সমান গুরুত্বপূর্ণ 'বিদেশনীতি রূপায়নকারী'-দের কাছেও। এমন কি সাধারণ নাগরিক যারা 'রূপায়ন কারীদের আচরণ' কে প্রভাবিত করতে চায়, তাদের কাছেও এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশনীতির সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Foreign Policy)

বিদেশনীতি বিষয়ে আলোচনায় আরও একটু অগ্রসর হবার আগে বিদেশনীতি বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়া উচিত। কারণ, যদি না আমরা এই ধারণাটি পাঠকের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট করে না নিই, তাহলে এর ধারণাগত কাঠামো, নির্ধারকসমূহ, ও বিদেশনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনাই গুলিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আমরা জানি, যে কোন ক্ষুদ্র সংজ্ঞাই অগভীর ও অকার্যকর হওয়া প্রায় নিশ্চিত। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা আরনেস্ট প্রেট্রিক (Ernest Petric) প্রদত্ত ছোট্ট সংজ্ঞাটি দিয়েই শুরু করব এবং পরে অন্যান্য ব্যাপকতর সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে এর তুলনা টানার চেষ্টা করব। পেট্রিক বিদেশনীতি বলতে বুঝিয়েছেন 'রাষ্ট্রের এক ধরণের কার্যকলাপকে যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে তার লক্ষ্য ও স্বার্থ পূরণ করে' ('an activity of the state which it fulfills its aims and interests within the internatinal arena')। পেট্রিকের উদ্দেশ হল অন্যান্য লেখকদের থেকে ব্যাখ্যা সংগ্রহ করে তাঁর ঐ ক্ষুদ্র সংজ্ঞাটির পরিপূরক গড়ে তোলা. তদনুযায়ী, বিদেশনীতি হল: ১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জনসম্প্রদায় দ্বারা সূচিত একটি প্রক্রিয়া এবং প্রণালীবদ্ধ কার্যাবলী যা রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত এবং যা রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে, রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যাবলীর সাথে সঙ্গতি রাখে (Vladimir Benko)।

২) সিদ্ধান্তসমূহও কার্যাবলীর সমাহার যা প্রধানত একটি বিশেষ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের বিষয়ে আগ্রহী (Peter Calvert)।

৩) বিশেষ কতকগুলি রাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা ক্ষমতায়িত (empowered)। আধিকারিকদের পদ্ধতিনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যার দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় তারা বা তাদের উর্ধ্বতন পদাধিকারীগণ যে সমস্ত লক্ষ্য স্থিরীকৃত করেছেন তা বজায় রাখা বা তাকে পরিবর্তিত করার প্রয়াস (James N Rosenau)।

৪) একটি রাষ্ট্রের সেই ধরনের সংগঠিত কার্যকলাপ যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সেই রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের বা একক সমূহের সাপেক্ষে নিজস্ব মূল ও স্বার্থ-এর কাম্য ফল চরিতার্থ করতে চায় (Rodovan Vukadinovic)।

৫) রাষ্ট্রনায়কত্বের মাধ্যমে যাবতীয় লক্ষ্য সমূহ এবং তা অর্জনের উপায়ের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়া (Cecil V Crabb)।

৬) রাষ্ট্রের মত 'স্বাধীন একক' দ্বারা অথবা রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে ইওরোপীয় ইউনিয়নের মত 'স্বাধীন উপাদান' দ্বারা পরিচালিত আনুষ্ঠানিক বা সরকারী বৈদেশিক সম্পর্কসমূহের সমষ্টি (Christopher Hill)।

৭) অন্যান্য বর্হিদেশীয় সত্তাসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে কোন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে কোন একটি জাতীয় সরকার তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রযুক্তি কৌশল (Steve, Smith, Amelia Hadfield, Tim Dunne)

৮) একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষার লক্ষ্য সাধন করে এবং এর নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ বৃদ্ধিতে প্রয়াসী হয় (Brockhaus Encyclopaedia)।

৯) একটি সংযোগের কার্যক্রম যা রাজনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রকে যুক্ত করে এবং ব্যাপক অংশের কার্যকলাপকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বিভিন্ন শীর্ষ বৈঠকগুলি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অথবা সামাজিক সম্মেলনে কূটনীতিকদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিনিময়গুলিকেও বিবেচনার মধ্যে গ্রাহ্য করা হয় (দ্রষ্টব্য Petric, 2013:305)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত বিবিধ সংজ্ঞাগুলি ফ্র্যাঙ্কেল প্রদত্ত প্রায়শ-উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলি থেকে ব্যাপকতর। জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেলের ভাষায় বিদেশনীতি হল:' 'Foreign Policy consists of decision and actions which involve to some appreciable extent relations between one state and others' (Frankel, 1963:1)। আমরা যদি উপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলির তাৎপর্য উদ্ধার করি, তবে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিদেশনীতির মধ্যে কেবল সিদ্ধান্ত নেই, ক্রিয়াও রয়েছে। এবং এখানে ক্রিয়াকলাপের অর্থ হল, অপরাপর রাষ্ট্র সমূহের এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির কার্যকলাপকে প্রভাবিত করার অবিরাম প্রক্রিয়া অথবা তাদের বিভিন্ন ক্রিয়া উদ্যোগের প্রতি সাড়া দেওয়ার কৌশল। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র ছাড়াও বর্তমানের বিশ্বায়িত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক অরাষ্ট্রিয় একক রয়েছে যারা তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়। কিন্তু, যদিও তাদের ক্রিয়াকলাপ ব্যাপকভাবেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে, তথাপি তাদেরকে যথাযথ ভাবে বিদেশনীতি বলা যায় না। যদি, এই সকল অরাষ্ট্রিয় এককদের কার্যকলাপকে বিদেশনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে বিদেশনীতি ধারণাটিই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রগুলিকে তাদের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা ও কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব থেকেই অব্যাহতি দেওয়া হয়ে যায়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশনীতির সঙ্গে অন্যান্য কার্যকলাপের পার্থক্য সাধন চূড়ান্ত কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, বিদেশনীতি একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধারণা। এটি রাষ্ট্রের নামেই পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি সাংবিধানিক আইনী কাঠামো ও সংস্থার দ্বারাই পরিচালিত হয়। অন্যান্য সংস্থা বা একক দ্বারা বা অন্য কোন উপাদানের মাধ্যমে বিদেশনীতি প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু শেষতঃ কোন ক্ষমতায়িত সংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অনুমোদন ছাড়া বিদেশনীতি গৃহীত হতে পারে না। (Petric, 3-5)।

১.৪ বিদেশনীতি অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন ধারণাগত কাঠামো

প্রত্যাশা মতই, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশনীতির ব্যাখ্যা বা অনুধাবনের ধারণাগত কাঠামো সমূহেরও বিবর্তন হয়েছে। কার্লসনেস এ বিষয়ে সবচাইতে ব্যাপক ধারণাগত কাঠামো

উপস্থিত করেছেন সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) ও জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) প্রেক্ষিত থেকে। এবং আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের বিশ্লেষণটি উপস্থাপন করব কার্লসনেসের লেখার উপর ভিত্তি করেই। মাঝে মাঝে অবশ্য আমরা আমাদের নিজেদের বক্তব্য রাখব। কার্লসনেস দেখিয়েছেন যে, একটি অ্যাকাদেমিক ক্ষেত্রে ধারণা হিসেবে বিদেশনীতির শিকড় গভীরভাবে public policy বা সরকারী নীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রোথিত। কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, ইউরোপেও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এটি লক্ষ্য করা যায়। সদ্য গঠিত আধুনিক রাষ্ট্রের বিদেশনীতিতে স্বাধীন ভাবে কূটনীতি পরিচালনার জন্য পূর্ণ ক্ষমতার কূটনীতিকে (plenipotentiary) সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এর তাৎপর্য হল, বিদেশনীতিকে সরকারি নীতির সকল ক্ষেত্র থেকে পৃথক বিবেচনা করা হয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির তুলনায় বিদেশনীতির বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটির সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত ছিল। এই কারণেই বিদেশনীতির বিষয়টিকে জনগণের বিচার্য বিষয়ের বাইরে রাখা হত। 'গোপন কূটনীতি'-র (secret diplomacy) প্রাধান্যকারী ধারণাটি কোন দেশের বিদেশনীতির উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে অযৌক্তিক করে তুলেছিল। পূর্ণক্ষমতার কূটনীতিকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং দায়বদ্ধতার অভাবের বিষয়টি স্যার হ্যারল্ড নিকলসনের (Sir Harold Nicolson) মতামত থেকে স্পষ্ট হতে পারে। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, তাঁরা আসলে 'mere hucksters in the diplomatic market, bartering the happiness of millions with a scented smile' (Scaman, 2002:1)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি ও তার পরিণামগুলি দেখে এবং এই বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরের অভিজ্ঞতা উড্রো উইলসনের মত রাষ্ট্রনায়কদের এই প্রতীতিতে পৌঁছে দিয়েছিল যে পুরাতন কূটনীতির গোপনে সংগঠিত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দাঁড়ি টানা উচিত। সেই কারণেই উইসলসন 'খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে উপনীত উন্মুক্ত সনদ'-এর স্লোগান তুলেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে উইলসনীয় দৃষ্টিভঙ্গির করুণ ব্যর্থতা ঘটলেও এর প্রভাব কিন্তু থেকে যায়। কারণ, যুদ্ধোত্তর সময়কালে বিদেশনীতি বিশ্লেষণের বিষয়টি অ্যাকাদেমিক দিক থেকে প্রতিষ্ঠা পায় তখন উইলসনীয় ধারণাগত প্রকল্পটির দুটি প্রধান তাৎপর্য বিদেশনীতি আলোচনার উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটিকে পুষ্ট করে। এর প্রথমটি হল: বিদেশনীতির গঠন ও রূপায়নে কিভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহার করে অধিকতর দক্ষ ও দায়বদ্ধ করে তোলা যায় এবং দ্বিতীয়ত কেন এবং কিভাবে আনুষ্ঠানিক মূল্যবোধ ও স্বার্থ সমূহকে বিদেশনীতি গঠন ও রূপায়নের প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব—তাও উইলসনীয় দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল।

অবশ্য একথা বলতেই হয় যে, বিদেশনীতির ক্ষেত্রে যখন এই প্রতিষ্ঠান ও নীতিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিচ্ছিল যুদ্ধোত্তর সময়কালের অব্যবহিত পরেই, তখনই ইওরোপে একটি দ্বিতীয় এবং শক্তিশালী আলোচনার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল পূর্বল্লোখিত ধারণাটি প্রায় সরিয়ে দিয়ে। এই দ্বিতীয় ধারাটি পৃথক বিষয় হিসেবে বিদেশনীতির বিকাশে অনেক শক্তিশালী গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়। এই ধারণাটিই বাস্তববাদ বা realism হিসেবে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির সব চাইতে বিখ্যাত প্রবক্তা হলেন হানস জে মরগেনথাউ (Hans J Morganthau)। তিনি এবং অন্যান্য বাস্তববাদী তাত্ত্বিকদের যে বক্তব্য বিদেশনীতির মত উপ-ক্ষেত্র (sub-field)—টিকে সমৃদ্ধ করেছিল, সেটি হল এই যে, ক্ষমতার ধারণাটির সঙ্গে যদি স্বার্থের ধারণাকে সম্পর্কযুক্ত করে তোলা যায়, তাহলে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রগুলির আচরণের একটি সার্বিক ও চিরকালীন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি—এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আচরণবাদী (Behavioral) দৃষ্টিভঙ্গির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিষ্ঠান-মনস্ক গবেষণার উপর আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির এই গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; যেখানে গবেষণার বিষয়বস্তুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা যায়। এক্ষেত্রে, উল্লেখিত বা অনুল্লেখিত মূল্যায়ন নির্ভর ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত একেকটি অভিনব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থেকে সরে এসে বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর যাচাইযোগ্য সাধারণীকরণের দিকে গবেষণার অভিমুখটি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বিদেশনীতির এই গবেষণায় মৌলিক তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনহেতু যে অ্যাকাদেমিক আলোড়ন শুরু হয় তা একটি নতুন গবেষণা-ঐতিহ্যের সূত্রপাত ঘটায়। এই গবেষণা-ঐতিহ্যটি বিদেশনীতির তুলনামূলক আলোচনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিদেশনীতির এই তুলনামূলক আলোচনাটিতে আচরণবাদের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতই ধরা পড়ে যখন দেখা যায়, বাস্তববাদী তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যমূলক রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার পরিবর্তে এখানে সুস্পষ্ট কাজ ও আচরণ এবং ঘটনা সমূহের বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিদেশনীতি বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের প্রতি উৎসাহ ও তাদের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি পরীক্ষাযোগ্য সাধারণীকরণে পৌঁছোনোর প্রয়াসটির আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশনীতি বিশ্লেষণের প্রকৃতই একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করা তবে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, সমষ্টি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গড়ে তোলা একটি সামগ্রিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিবিদ্যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে যথেষ্ট সমস্যামূলক হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই হোক, নীতির তুলনামূলক আলোচনাটি বিদেশনীতির সেই বিশ্লেষণী ঐতিহ্যকে গ্রাস করেনি যেখানে বিদেশনীতির বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া সমূহ এবং বিদেশনীতি-আচরণকে প্রভাবিত করার মত সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে এর আলোচনার কেন্দ্রে রেখেছিল। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রক্রিয়া সমূহের গুরুত্ব আলোচনায় যে তাত্ত্বিকদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন স্নাইডার, ব্রুক ও সপাঁ (Snyder, Bruck and Sapin)। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই লেখাটি থেকেই উন্নত ধরণের গবেষণা কর্মসূচীর সৃষ্টি যার মধ্যে নিম্নলিখিত ধারাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট।

১) সি হারম্যান, আরভিং ডবলু জানিস, ফিলিপ ই টেটলক প্রমুখের লেখায় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর গতিবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ।

২) 'আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির' দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রাহাম টি আলিসনের বিখ্যাত 'কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সংকট'-এর আলোচনার জন্য সুপরিচিত।

৩) সাইবারনেটিক (cybernetic) প্রক্রিয়ার আলোকে বিদেশনীতির আলোচনা।

মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করে মাইকেল ব্রেখট-এর ইজরায়েলের উপর কাজ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্ভর উপাদানের উপর রবার্ট জারভিস এর কাজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়িয়ে যায় এমন একগুচ্ছ গবেষণা সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে, আজ অবধি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান নির্ভর গবেষণা একাদিক্রমে প্রভূত আলোচনার সূত্রপাত ঘটায়। এর ফলে, জেমস রোজনাউ কিছুটা আগেভাগেই ঘোষণা করে বসেন যে, তুলনামূলক বিদেশনীতির আলোচনা ক্ষেত্রটি একটি 'স্বাভাবিক বিজ্ঞান'-এর মর্যাদা লাভ করেছে। কারণ, এর অনেক পরেও দেখা যায় বিদেশনীতি বিশ্লেষণের মধ্যে উপ-ক্ষেত্রের পরিচিতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের প্রায়-সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। পরিণামে, একদিন যখন ভি এম হাডসন ও সি এস ভোরের মত লেখকরা 'শত পুষ্প

বিকশিত হোক' বলে আশা করছিলেন, অন্যদিকে এল নীক এবং তাঁর সহযোগী লেখকেরা 'কথোপকথনের পরিসর' উন্মুক্ত করার বিষয়টিকে 'নতুন দিগন্ত' উন্মোচনের অগ্রদূত বলে বিবেচনা করে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

একাধিক গবেষকের আশঙ্কাকে অমূলক বলে প্রমাণ করে 'বাস্তববাদ' বেশ ভালোভাবেই আচরণবাদী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও বাস্তববাদী তত্ত্বের কেন্দ্রিয় ধারণাটি—অর্থাৎ ক্ষমতার ধারণাটি ছিল একটি অপর্যবেক্ষণযোগ্য ও অপরিমাপযোগ্য উপাত্ত বা datum। বাস্তববাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যেকার বিতণ্ডাটি কার্যত ছিল পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে। এবং এর পরে বাস্তববাদের মধ্যেও পদ্ধতি বিষয়ে বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে ১৯৭৯ সালে কেনেথ ওয়ালজ-এর *Theory of International Relations* গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তর্কের ঝাঁজটিও চলে যায়। বিদেশনীতি বিশ্লেষণের অর্ধশতক জুড়ে দৃশ্যমান প্রবণতাগুলির নির্যাসটি দেখাতে গিয়ে কার্লসনেস মূলত দুটি বড় ধারা বা ঐতিহ্যের সংঘাত দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথম ধারাটির মধ্যে বিচিত্র পরস্পর বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সমাহার ঘটে যেগুলি একদিকে জ্ঞানাত্মক (congnitive) ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি আমলাতান্ত্রিক অথবা নব্য-প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি, সংকটকালীন আচরণ, গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কার্লসনেস এগুলিকে innenpolitik বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নামে চিহ্নিত করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, এই innespolitik আভ্যন্তরীণ রাজনীতিগুলিকে প্রাধান্য দেয় এবং এর মাধ্যমে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন বিচিত্র উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। এর প্রতিস্পর্ধি দৃষ্টিভঙ্গি হল বাস্তববাদ যা বিদেশনীতির নির্মাণে অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের গুরুত্ব অস্বীকার করে না, কিন্তু বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কিত উপাদান সমূহের প্রতি পদ্ধতিগত দিক থেকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কার্লসনেস ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের খাতিরে একে Realpolitik বা বাস্তব রাজনীতি আখ্যা দিয়েছেন।

কার্লসনেস এই innenpolitik ও realpolitik-কে ঘিরে তৈরি হওয়া সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। বিদেশনীতি বিশ্লেষণে প্রেক্ষাপট জনিত যে দ্বি-বিভাজন সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন, কারণ এটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্লেষণিক সীমানাকে নির্দিষ্ট করে দেয় যা বিদেশনীতির সর্বাঙ্গীন ও ব্যাপক আলোচনার পক্ষে সহায়ক নয়। এবং সেই কারণেই, বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর ও তাত্ত্বিক ভিত্তিতে এই উপর্যুক্ত দ্বিবিভাজনকে তাঁরা এড়িয়ে চলতে চান। বিদেশনীতির স্বকীয় প্রকৃতির মধ্যে প্রোথিত মাপকাঠির পরিবর্তে—যে মাপকাঠিটি আদৌ প্রশ্নাতীত নয়—কার্লসনেস সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) ও জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological) পরিপ্রেক্ষিতে থেকে বিদেশনীতির ধারণাগত কাঠামো সমূহের শ্রেণীবিভাজন করেছেন, যেহেতু এগুলি বিদেশনীতির মর্মবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত নয়। সত্তাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি এই বিতর্কটি তোলে যে সমাজবৈজ্ঞানিক ব্যাখাটিকে মুক্ত ক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গের 'বৈশিষ্ট্য অথবা মিথস্ক্রিয়ায়' পর্যবসিত করা যায় কী না অথবা তাদের সামাজিক কাঠামোর স্তরে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিকে একের উর্ধে নিয়ে আলোচনা করা যায় কী না। সংক্ষেপে, বিতর্কটি হল সামগ্রিকতা না ব্যক্তিগত প্রেক্ষিত—কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে বিদেশনীতি বিশ্লেষণে কার্যকরী করে তোলা যায় সে বিষয়ে। এর ঠিক বিপরীতে, জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রশ্ন তোলে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের সামাজিক কাঠামোগুলি বস্তুনিষ্ঠভাবে না ব্যাখ্যামূলক প্রেক্ষিত থেকে আলোচনা করা হবে সে বিষয়ে। বস্তুনিষ্ঠতা যেখানে দৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করে বাহ্যিক ব্যাখ্যা দেয়, সেখানে ব্যাখ্যামূলক পরিপ্রেক্ষিতটি (interpretative perspective) 'তাৎপর্য নির্ণয় বিদ্যা' (hermeneutics)-কে কাজে লাগিয়ে অভ্যন্তরের দিক থেকে ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করে। কার্লসনেস বিদেশনীতির আলোচনায় এই দুটি প্রেক্ষিতের ব্যবচ্ছেদবিন্দুগুলি দেখিয়েছেন একটি matrix এর মাধ্যমে।

Ontology বা সত্তাতত্ত্ব	Epistemology বা জ্ঞানতত্ত্ব	
Holism বা সমগ্রতাবাদ	Objectivism বা বস্তুনিষ্ঠতাবাদ কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিত	Interpretativism বা ব্যাখ্যানবাদ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগত প্রেক্ষিত
Individualim বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ	মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিত (Agency-based perspective)	ব্যাখ্যানমূলক একক (actor) ভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিত

উৎস : কার্লসনেস, 'বিদেশনীতি' (Carlsnaes, 'Foreign Policy')

আমরা এখন সচেষ্ট হব কার্লসনেস প্রদত্ত উপরের ম্যাট্রিক্স থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে আলোচনা করাতে।

১.৪.১ কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে উৎসারিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে প্রধান তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি হল বাস্তববাদ বা realism, নব্য উদারবাদী প্রতিষ্ঠানবাদ এবং সাংগঠনিক প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা প্রথমেই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি নিয়ে আলোচনা করব।

১.৪.১.১ বাস্তববাদ

আপনারা সকলেই পূর্বের মডিউল-এ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের বিষয়ে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। আমরা এখানে বাস্তববাদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করব না। আমরা যেটা বাস্তববাদের কেবলমাত্র 'সাক্ষ্য-চিহ্ন বহনকারী যুক্তি সমূহ' (signature argument) বোঝার চেষ্টা করব এটা বোঝানোর জন্য যে, যে কেন যেকোন কাঠামোগত প্রেক্ষিতে বাস্তববাদী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি এক গুরুত্বপূর্ণ। Navari বলেন যে, রাজনৈতিক আলোচনায় বাস্তববাদ প্রথম ব্যবহৃত এই মতবাদটি বোঝানোর জন্য যে, যেকোন বিষয়ে সর্বজনীনতার বাস মানসপটের বাইরে। রাজনৈতিক তত্ত্বে এই শব্দটি একান্তভাবেই raison d'e'tat অথবা Realpolitik-এর তাত্ত্বিকদের জন্য সংরক্ষিত। এটি এমন এক চিন্তাগোষ্ঠী-কে সূচিত করে যাঁরা মনে করেন যে, এই বিশ্বের কার্যবিধি পরিচালনায় এমন কিছু বাস্তব শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে যা আমাদের তাৎক্ষণিক বোধের বাইরে এবং যাদের প্রকাশ ঘটে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায়; কেবলমাত্র যোগ্য তাত্ত্বিকই এই ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের চারিত্র্য লক্ষণ বুঝতে পারেন এবং তাদের রাজনৈতিক ধারণা ও রাজনৈতিক কার্যের অংশ অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনায় সক্ষম হন (Navari, 1982:207)। এই কারণেই, বাস্তববাদ কাঠামোবাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে মূলত এইজন্য যে বাস্তববাদ একটি সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বিচার করে এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে থেকে এর গতিশীলতাকে বোঝার চেষ্টা করে। একই সাথে ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থার

পরিসমাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যর্থতা সত্ত্বেও দ্বিমেরু ব্যবস্থার তত্ত্বটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র যথেষ্ট কার্যকরী তত্ত্ব হিসেবে গৃহীত। অবশ্য, কেনেথ ওয়ালজের সতর্কবাণী—নব্য বাস্তববাদ কেবল ব্যবস্থাগত স্তরে সূত্রাবিষ্কার বা তত্ত্ব নির্মাণে নিয়োজিত এবং বিদেশনীতি বিশ্লেষণযোগ্য কোন বিষয়ই নয়—একটি বৌদ্ধিক বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেক গবেষকই মনে করেন যে, নব্যবাস্তববাদী প্রেক্ষিত থেকে বিদেশনীতির তত্ত্ব নির্মাণ ভালোভাবেই সম্ভব এবং কেউ কেউ মনে করেন যে, তত্ত্ব-নির্মাণের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি সত্ত্বেও নব্য বাস্তববাদ প্রায়শই বিদেশনীতি বিশ্লেষণ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। কার্যত Gideon Rose ১৯৯৮ সালে দাবী করেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, বিভিন্ন এক সমূহ সম্পর্কে মতামত, কার্যকারণগত যুক্তির ভিত্তিতে বাস্তববাদের যে তত্ত্ব সেগুলির মধ্য থেকে মোট চার ধরণের তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে। এগুলি হল: Innenpoltik বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, আক্রমণাত্মক বাস্তববাদ বা Offensive Realism, আত্মরক্ষামূলক আক্রমণাত্মক বাস্তববাদ এবং নব্য-ধ্রুপদী বাস্তববাদ বা Neo-classical Realism। বিদেশনীতির অভ্যন্তরীণ তত্ত্ব সমূহ যেখানে অভ্যন্তরীণ চল (variables)গুলির উপর গুরুত্ব দেয়, সেখানে আক্রমণাত্মক বাস্তববাদ বা Offensive Realism ব্যবস্থাগত চলগুলিকে অগ্রাধিকার দেয়। ওয়ল্‌জের নব্য-বাস্তববাদী লজিককে অনুসরণ করে বলা যায়, আক্রমণাত্মক বাস্তববাদ বা Offensive Realism-যার সবচাইতে বিখ্যাত প্রবক্তা হলেন জন মিয়ারসেইমার (John Mearsheimer)-যুক্তি দেয় যে, যেহেতু আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই সংঘাত ও আগ্রাসনকে আহ্বান করে সেহেতু রাষ্ট্রব্যবস্থা আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আত্মরক্ষামূলক বাস্তববাদের প্রবক্তাগণও একে ব্যবস্থাগত তত্ত্ব হিসেবেই দেখেন, এবং যুক্তি দেন যে, যদিও ব্যবস্থাগত চলসমূহ রাষ্ট্রের আচরণ ব্যাখ্যায় কার্যকারণের প্রভাবকে গুরুত্ব দেয়, তথাপি তারা সব ধরণের রাষ্ট্রীয় আচরণের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়। ক্ষমতার সম্পর্কিত উপাদানগুলি যে প্রভাব বিস্তার করে তা মূলত অপ্রত্যক্ষ এবং অধিকতর জটিল; কেননা ঐ রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ বোঝা সম্ভব হবে না যদি না একেবারে প্রাথমিক স্তরে অন্যান্য আন্তর্জাতিক বণ্টনের ভূমিকাকে খাটো করে কতিপয় গবেষক আক্রমণের আশঙ্কায় উৎস, স্তর এবং অভিমুখের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রযুক্তি, ভৌগোলিক নৈকট্য আক্রমণ করবার সামর্থ্য এবং অভিপ্রায়ের মত চলগুলির সাহায্যে একে ব্যাখ্যা করায় প্রয়াসী হয়েছেন। যে বিষয়টি এঁরা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল এই যে, যে সমস্ত রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকে তারা কেবলমাত্র কতগুলি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া সর্বদাই শান্ততার সঙ্গে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চায়। এই রাষ্ট্রগুলি এমনভাবে তাদের নিরাপত্তার প্রতি আশঙ্কাজনক শক্তিগুলিকে ভারসাম্যাবস্থায় আনতে উদ্যোগী হয় যাতে করে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভবপর হয়। আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক-এই উভয় বাস্তববাদীদের থেকেই দূরত্ব বজায় রেখে নব্যবাস্তববাদীরা তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্রুপদী ভিত্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এই বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, একটি জাতিরাষ্ট্রের বিদেশনীতিতে ব্যবস্থাপনা মধ্যবর্তী উপাদানগুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয়। উপর্যুক্ত চারটি তাত্ত্বিক অবস্থানকে নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে সংক্ষেপে দেখানো যেতে পারে।

ছক-২ (Table-2)

বিদেশনীতির চার ধরনের বাস্তববাদী তত্ত্ব

তত্ত্ব	আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার চিত্র বা রূপ/	বিভিন্ন এককের রূপ	কারণগত লজিক
অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তত্ত্বসমূহ	গুরুত্বপূর্ণ	প্রবলভাবে পৃথকীকৃত	অভ্যন্তরীণ উপাদান সমূহ → বিদেশনীতি
আত্মরক্ষামূলক মূলক বাস্তববাদ	মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ নৈরাজ্যের তাৎপর্য পরিবর্তনীয়	প্রবলভাবে পৃথকীকৃত	ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় অথবা অভ্যন্তরীণ→বিদেশনীতি (দু'প্রকার স্বাধীন বা নিরপেক্ষ চল সমূহ যা স্বাভাবিক)
নব্য-ধ্রুপদী বাস্তববাদ	গুরুত্বপূর্ণ: নৈরাজ্য অসচ্ছ ও ঘোলাটে	পৃথকীকৃত	ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় উদ্দীপক→ অভ্যন্তরীণ বিদেশনীতি (স্বাধীন) নির্ভরশীল চল
আক্রমণাত্মক বাস্তববাদ	অতীব গুরুত্বপূর্ণ: হবসীয় নৈরাজ্য	অপৃথকীকৃত	ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়→বিদেশনীতি

উৎস :Gideon Rose, 'Neoclassical Theories of Foreign Policy'

১.৪.১.২ নব্য উদারনীতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (Neoliberal Institutionalism)

এ'কথা সুবিদিত যে, স্তিফেন ক্রাজনার (Stephen Krasner) এবং তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ *After Hegemony* নব্য উদারনীতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় সামনের সারিতে নিয়ে আসে। একটা আশঙ্কা ছিল যে, নব্য উদারবাদীরা উদারনীতিক তত্ত্বকে বাতিল করে দেবে এই ভিত্তিতে, যে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ায় উপর দাঁড়িয়ে থেকে এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। তাঁরা এই তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তিভূমিকেই অস্বীকার করার জন্য একটি তাত্ত্বিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে মনস্থ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি রাষ্ট্রীয় আচরণের বাস্তববাদী বিশ্লেষণের তিনটি উপাদানকে উদারনীতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদে আমদানি করেছিলেন। প্রথমত, উদারনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের মূল প্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি যুক্তি দেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি কোনরকম আত্মোৎসর্গ বা আত্মবিলোপ-এর মত আদর্শবাদী প্রবণতা দ্বারা চালিত নয়। বরং তাদেরকে যুক্তিবাদী অহংবাদী বলা যেতে পারে যারা তাদের উপযোগ বৃদ্ধিতে সদা তৎপর। দ্বিতীয়ত, ক্রাজনার উদারনীতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের মধ্যে নিহিত আদর্শবাদী ও মূল্যতাত্ত্বিক ঝোঁকগুলিকে কঠোর আক্রমণ করেছেন; কারণ এখানে সঙ্গতি ও সহযোগিতাকে বিশ্বরাজনীতির চিহ্ন-লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়েছে, যদিও বাস্তবে পৃথিবী সংঘাতময়। তৃতীয়ত, ক্রাজনার 'ব্যবস্থা সম্বন্ধীয়' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যুক্তি দিয়েছেন যে, বিশ্বরাজনীতিতে দেশীয় ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যুক্তি দিয়েছেন যে, বিশ্বরাজনীতিতে দেশীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সমাজের সম্পর্ক ও অরাষ্ট্রিয় এককগুলির ভূমিকাটি গৌণ। কারণ, 'অরাষ্ট্রিয় এককগুলি রাষ্ট্রগুলির অধীন' (Hobson, 95-6)।

যদিও নব্য উদারবাদী তাত্ত্বিকগণ প্রতিষ্ঠানকে বিদেশনীতির আলোচনায় সাধারণভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গণ্য করেন না, তথাপি কার্লসনেস উল্লেখ করেছেন যে, উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানবাদের আলোচ্য বিষয়গুলি বিদেশে নীতির বিশ্লেষণে যতটা প্রাসঙ্গিক ঠিক ততটাই প্রাসঙ্গিক বাস্তববাদ ও নব্য বাস্তববাদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলি। এছাড়া, নব্য উদারনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ যেহেতু বাস্তব বাদের বিপ্রতীপে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে পরিচিত, ঠিক সেই কারণেই একে বিদেশনীতির বিশ্লেষণে একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তববাদের মতই নব্য উদারনীতিবাদের নির্গলিতার্থ একটি 'কাঠামোগত, ব্যবস্থা-সম্বন্ধীয় উপর থেকে নীচের দিকে ধাবিত দৃষ্টিভঙ্গি'-র মধ্যেই নিহিত; এবং একই সঙ্গে বাস্তববাদের মতই রাষ্ট্রগুলিকেই প্রধান একক হিসেবে এবং নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় স্বার্থবাদী স্ব-উপযোগ সিদ্ধকারী হিসেবে দেখা হয়ে থাকে। সেই কারণেই এটা জানা জরুরী যে, কোন বিশেষ আতস কাঁচের মাধ্যমে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বিদেশনীতির পর্যবেক্ষণ করে। কার্লসনেসের মতানুসারে, বাস্তববাদ ও নব্য উদারনীতিক বাস্তববাদ—এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিদেশনীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি যৌক্তিক উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত রাষ্ট্র সমূহের চেষ্টিত পছন্দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে, বাস্তববাদীদের কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ক্ষমতা-সম্পদের বণ্টনগত সমস্যাটি যেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, নব্য উদারনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদীদের কাছে সমস্যা হল নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। এমনকি যদি এই ব্যবস্থা এক অনিশ্চিত ও তার পরিণামে নিরাপত্তা জনিত উদ্বেগের জন্ম দেয়, তথাপি ক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থার আকারে তথ্যাদি ও সাধারণ নিয়মাবলীর যোগান দেয়। এর ফলে, নৈরাজ্যের মধ্যেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভবপর হয় যা কোন কোন রাষ্ট্রীয় পছন্দ-অপছন্দকে বিদেশনীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক করে তোলে। সেই কারণেই, ১৯৯৩ সালে অ্যাক্সেলরড (Axelrod) ও কোহেন (Keohen) যুক্তি দিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কতগুলি অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সহযোগিতামূলক বিদেশনীতি গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১.৪.১.৩ সাংগঠনিক প্রক্রিয়ামূলক দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ বা Organizational Process Perspective

সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলি যদিও বাস্তববাদ ও নব্য উদারনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের মত সাধারণ অর্থে ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিকতার কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি নয়, তথাপি 'কাঠামোগতভাবেই' এটি ক্রিয়াশীল থাকে। অবশ্য এর ক্রিয়াশীলতা লক্ষিত হয় অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্তরে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কাঠামোগত উপাদানটি রাষ্ট্রীয় আচরণকে বাহ্যিক দিক থেকে প্রভাবিত না করে ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে, গবেষকরা অব্যবস্থার স্তরে একটি উর্ধ্বাধঃ (top-down) অর্থাৎ ওপর থেকে নীচে নেমে আসার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রয়াসী এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে একদিকে রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠান বা মাধ্যম সমূহের আন্তঃসম্পর্কটি ও অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যেকার সম্পর্কগুলির প্রকৃতিটি উদ্ধার করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন। একই সঙ্গে, কীভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আন্তঃসম্পর্কটি রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত দাবিগুলিকে প্রাসঙ্গিক করে রাখে। গ্রাহাম টি অ্যালিসন (Graham T Allison)-এর ধ্রুপদী গ্রন্থ *Essence of Decision*-এ অব-ব্যবস্থাগত ও কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান বা মাধ্যমগুলির ভূমিকা সবচাইতে ভালভাবে বিবেচিত হয়েছে এখানে, বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য তিনটি মডেলের মধ্যে দ্বিতীয় মডেল হিসেবে একে দেখানো হয়েছে। আমাদের শেষ মডিউলে এই মডেল বিষয়ে এবং আরো দুটি মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত এটা বলাই যথেষ্ট যে, সাংস্থানিক তত্ত্বের মধ্যে এর শিকড়টি গভীর ভাবে প্রোথিত হওয়ার কারণে এই মডেলটি বিদেশনীতি সিদ্ধান্তকে যান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকতার

(instrumental rationality)-র নিরিখে না দেখে, সাংস্থানিক পরিণাম হিসেবে একে দেখানো হয়েছে যা কাম্যাবস্থাকে লক্ষ্য হিসেবে দেখে না। আরভিং জেনিংস-এর 'গোষ্ঠীচিন্তা' (Groupthink)-র ধারণাটি এই দৃষ্টিভঙ্গিরই আরেকটি প্রকারভেদ। অবশ্য আরও অনেক তাত্ত্বিক আছেন, যাঁরা এর বাইরে গিয়ে বিদেশনীতি প্রণয়নে গোষ্ঠী গতিশীলতা ও বৃহত্তর সাংস্থানিক ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়ার উপর জোর দেন।

১.৪.২ প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ:

এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিতে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের জ্ঞানাত্মক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু, এই সমালোচনা সত্ত্বেও এই আলোচনা ক্ষেত্রটির বিস্তার ও বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয় নি। এখানে, যৌক্তিক পছন্দের পূর্বানুমানে—যা বাস্তববাদ ও নব্য বাস্তববাদে রয়েছে—ব্যক্তি যে মূলগতভাবে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অভিযোজনের উপযুক্ত এবং আনুষঙ্গিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে নিজেকে বদলাতে সক্ষম ধরে নেবার-এই যে প্রবণতা বা বিশ্বাস এ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে; বরং এটা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তার বা তাদের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের উপায় এবং অন্যান্য একগুচ্ছ ব্যক্তিক ও জ্ঞানাত্মক বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে তারা পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে। এই থেকেই জন্ম নিয়েছে Psychological Cognitive Theory বা মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানাত্মক তত্ত্বের।

১.৪.২.১ মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ:

জ্ঞানতাত্ত্বিক সঙ্গতির তত্ত্বসমূহে দৃষ্টিভঙ্গি ও তার পরিবর্তনের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছিল তার থেকে উঠে আসা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একধরনের 'জ্ঞানাত্মক বিপ্লবের' জন্ম হয়েছে। ব্যক্তিকে একজন নিষ্ক্রিয় একক হিসেবে বিবেচনার পুরোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির যেখানে ব্যক্তিকে একজন নমনীয় এজেন্ট বা মাধ্যম না দেখে একজন সমস্যা সমাধানকারী হিসেবে দেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়াকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার জন্য 'সক্রিয়তা সংক্রান্ত সঙ্কেত লিপি' (operational codes), 'জ্ঞানাত্মক মানচিত্র নির্মাণ' (Congnitive Mapping) 'আরোপমূলক তত্ত্ব' (Attribution Theory) ও 'ইমেজ তত্ত্ব' (Image Theory)-এর মত নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। এই গবেষণাক্ষেত্রটি ঋদ্ধ হয়েছে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে আমেরিকান প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের অনুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে। একই সঙ্গে, ঠান্ডা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যেকার অবিশ্বাসের আবহ (Deborah ও Larsen উভয়ের রচনাতেই), এবং সোভিয়েত বিদেশনীতি প্রণয়নে নীতিকারদের ধারণা ও আচরণ সম্পর্কিত বহু আলোচনা যেমন এই গবেষণা ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেছে, একই ভাবে কার্টার প্রশাসনের জ্ঞানাত্মক বিশ্লেষণ, নীতি প্রণয়নে ঐতিহাসিক তুলনা-প্রতিতুলনায় ভূমিকা আহরিত তথ্যাদির প্রক্রিয়াকরণ, তাদের বোঝা ও তদ্‌সম্পর্কিত ধারণাও বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, বিদেশনীতি অনুসরণে নেতৃত্বের বিশ্বাস, প্রেরণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন ইত্যাদি বিষয়গুলিও আলোচিত হয় এবং প্রকৃত অর্থে সমগ্র গবেষণাক্ষেত্রটিকেই সমৃদ্ধ করে।

১.৪.২.২ সম্ভাবনার তত্ত্ব বা Prospect Theory:

বিদেশনীতির আলোচনায় জ্ঞানাত্মক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সংযুক্তি হল সম্ভাবনা

তত্ত্ব বা Prospect Theory। এই তত্ত্বানুযায়ী, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা যৌক্তিক মডেলের দাবিমত প্রত্যাশিত উপযোগের সর্বাধিক বৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে কোন নীতি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরিবর্তে একটি আদর্শ বিন্দু (reference point) থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি শুরু করে, যে বিন্দুটি পুনঃপুনঃ স্থিতাবস্থা দ্বারা সংজ্ঞাত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তাগণ যেখানে নীতি গ্রহণে ঝুঁকি রয়েছে অথচ বিদেশনীতিতে লাভ হতে পারে, সেখানে তাঁরা অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ তাঁরা লাভের সম্ভাবনা থেকে ক্ষতি এড়ানোকে অধিক গুরুত্ব দেন। এবং নীতি পছন্দের ক্ষেত্রে আদর্শ বিন্দুকে মনে রেখে লাভক্ষতির হিসেব কষেন। এছাড়াও, জ্ঞানাত্মক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি সংযুক্তি হল শিক্ষণ তত্ত্ব বা learning theory যা বিদেশনীতির আলোচনায় একটি ক্রমপ্রসরমান বিষয় হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

১.৪.২.৩ আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি (Bureaucratic Politics Approach)

কার্লসনেস তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি অ্যালিসনের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের তৃতীয় মডেল হিসেবে বিখ্যাত। আমরা বিস্তারিত ভাবে মডিডল-৪-এ এটি আলোচনা করব। উল্লেখ্য যে, মাধ্যম বা agency পরিপ্রেক্ষিত থেকে উঠে আসা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এটি একটি। তিনি মনে করেন যে, সাংস্থানিক প্রক্রিয়া মডেল-এর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক থেকে আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুক্ত করা উচিত প্রধানত এই কারণে যে, এটি আলোচনা ক্ষেত্রের কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা মাধ্যম ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অধিকতর সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। যেহেতু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তি-এককের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়, যারা বিভিন্ন পছন্দ বাছাই এর দরকষাকষিতে যুক্ত থাকে এবং যেহেতু গৃহীত নীতি সিদ্ধান্তগুলি সাংস্থানিক প্রক্রিয়াসমূহের ফসল, সেইহেতু এগুলিকে বরং 'রাজনীতির টানাপোড়েনের' লব্ধি বা resultants বলে মনে করা যেতে পারে। অবশ্য, যৌক্তিক পছন্দ মডেলের সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ এর প্রধান লক্ষ্য হল এটা দেখানো যে, লব্ধিগুলি কেন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পছন্দের থেকে পৃথক বা ভিন্ন ধরণের। কিন্তু, উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিতে পছন্দগুলিকে আদর্শ বিন্দু হিসেবে না ধরে ক্ষমতা ও দক্ষতাকে ধরা হয়। কোন ক্রিয়ার সমর্থক বা বিরোধীদেরও এই আদর্শ বিন্দুর মধ্যে বিবেচনা করা হয়। এখানে ক্ষমতা বলতে ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে বোঝান হয় না, আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতাকে বোঝান হয়; যেহেতু দরকষাকষিতে নিযুক্ত ব্যক্তি-এককরা ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণ অপেক্ষা গোষ্ঠীগত ও শ্রেণীগত (Sentional) লক্ষ্য পূরণে তাদের কার্য পরিচালনা করে। এই বক্তব্য সেই ভাবগর্ভ উক্তি—where one stands depends on where one sits-কেই মনে পড়িয়ে দেয়।

১.৪.২.৪ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা Liberal Approach:

কার্লসনেস এজেন্সী ভিত্তিক যে সমস্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতগুলির উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি হল উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিদেশনীতিতে দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ভূমিকা বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি রোজনাউ অন্যান্য প্রধান প্রধান ইউরোপীয় গবেষক এবং পিটার কাটজেনস্টাইনের হাতে একটা প্রাথমিক রূপ পায় ও পরবর্তী সময়ে ম্যাথ্যু ইবাঞ্জেলিস্তা, টমাস রিস-কাপ্পেন এবং অন্যান্য গবেষকদের রচনায় বিকাশ লাভ করে। অবশ্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি অন্তর্ভুক্ত করার কৃতিত্ব অ্যান্দ্রু মোরাভচিকের। নব্য বাস্তববাদ ও নব্য উদারবাদের প্রতি যে চ্যালেঞ্জ এই

দৃষ্টিভঙ্গিটি ছুঁড়ে দিয়েছে তা মূলত তিনটি কেন্দ্রীয় পূর্বানুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি হল:

১) এখানে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা সামাজিক এককগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কারণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে 'নীচ থেকে উপরে' (bottom up) দেখলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলির কথা প্রথমে আসে এই জন্য যে তাদের স্বার্থসমূহ কোন পূর্ব নির্ধারিত রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং এই স্বার্থগুলি পূরিত হয় যৌথ প্রয়াস ও রাজনৈতিক ক্রিয়া পরিচালনায় মধ্য দিয়ে।

২) দ্বিতীয় পূর্বানুমানটি হল এই যে, নির্যাসগত দিক থেকে, রাষ্ট্রীয় পছন্দগুলি সমাজের একটি ছোট গোষ্ঠীর (sub-section) স্বার্থ সমূহকে প্রতিফলিত করে এই অর্থে যে, এই স্বার্থগুলি রাষ্ট্রীয় আধিকারিকদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং অনুসৃত হয়।

৩) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রের আচরণ পরস্পর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমূহ দ্বারা রূপ লাভ করে। এর অর্থ হল, অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির নীতি-পছন্দগুলির থেকে এক বা একাধিক রাষ্ট্রের পছন্দানুসরণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

মোরাভসচিক দাবি করেছেন যে, পূর্বোক্ত তিনটি আলোচনা-বিশ্লেষণের ধারাই উদারনীতিবাদের কোন না কোন শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে, প্রথমটি, অর্থাৎ ধারণাগত উদারনীতিবাদ (ideational liberalism) দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ সামাজিক দাবি উত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেখানে, দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বাণিজ্যিক বিষয়টি আলোচনা করে কীভাবে দাবি দাওয়াগুলি রাষ্ট্রীয় পছন্দসমূহে পরিবর্তিত হয়। সর্বশেষটি, অর্থাৎ প্রজাতান্ত্রিক উদারনীতিবাদ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় নীতি-পছন্দগুলির অবয়বগুলির উপর আলোকপাত করে।

১.৪.৩ সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রোথিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ (Approaches rooted in a Social-Institutional Perspective)

এখানে আমরা সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করব যেগুলি সত্তাতাত্ত্বিক দিক থেকে সমগ্রবাদী কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখাবাদী (interpretational)। সামাজিক নির্মাণবাদ, যেটি এই প্রেক্ষিতের একটি বড় দৃষ্টিভঙ্গি, সাধারণ সমাজ বিজ্ঞানে একটি অধিকতর অধিতাত্ত্বিক (meta-theoretical) অবস্থান গ্রহণ করে আছে যতটা না একে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও, এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় ক্রমেই ঢুকে পড়ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নানান মতামতের সমাহারের কারণেই এর মধ্যে 'তরল ও 'গাঢ়' অর্থাৎ তুলনায় কমনীয় বা নরম এবং দৃঢ় বা শক্তিশালী রূপভঙ্গির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক নেতৃত্ব প্রদান করেছেন মূলত আলেকজানন্ডার ওয়েন্ডত ও ইমান্যুয়েল অ্যাডলার, মাইকেল বারনেট, জন রাগী, পিটার জে কাতজেনস্টাইন, টমাস রিস-কাপ্পেন, মারথা ফিনেমোর প্রমুখের মত আধুনিক নির্মাণবাদীরা। অন্য দিকে, দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক নেতৃত্বটি প্রদান করেছেন ফ্রিডরিশ ক্রাটোচভিল এবং নিকলোস ওনাফ-এর মত আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা। এঁরাই প্রথম সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন. এছাড়াও হেনরিক লারসেন, ওলে ওয়েভার এবং জেনিফার মিলিকেন-এর মত 'বাচনিক' (discursive) নির্মাণবাদীরা এবং রিচার্ড অ্যাসাল ও আর বি জে ওয়াকারের মত উত্তর আধুনিকতাবাদীরা ও সর্বোপরি, স্পাইক পিটারসন এবং জে অ্যানো টিকনারের মত নারীবাদী নির্মাণবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। কাটজেনস্টাইন সম্পাদিত *The Culture of National Security* (1959) গ্রন্থটিতে দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই সমান গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। এখানে, বিশ্ব রাজনীতিতে আদর্শ

ও আত্মপরিচিতির ভূমিকাকে ঘিরে নব্য বাস্তববাদ ও নব্য উদারনীতিবাদের সাপেক্ষে বেশ কিছু লেখক প্রশ্ন তুলেছেন এবং জাতীয় স্বার্থের ধারণাটি, যা প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাকেও সমস্যামূলক হিসেবে দেখানো হয়েছে। একটি নিবন্ধে রিচার্ড প্রাইস ও নিনা তান্নেওয়াল্ড বিদেশনীতির ব্যাখায় সামাজিক নির্মাণবাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁদের বক্তব্য হল, পারমাণবিক ও জৈবরাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার বিষয়টিকে কোন যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাবে না; বরং গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধিনিষেধমূলক আদর্শের বিকাশ এই অস্ত্রগুলিকে অগ্রহণীয় করে তুলেছে। একইভাবে, অন্য একটি নিবন্ধে মারথা ফিনেমার দেখিয়েছেন যে, বাস্তববাদী ও উদারনৈতিক তত্ত্বসমূহের সাহায্যে আধুনিক কালে বিদেশনীতি প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টি মানবিক আচরণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যেহেতু তাদের কোনও তাৎক্ষণিক ভূসমরকুশলগত এবং অর্থনৈতিক লাভ বা সুবিধা নেই হস্তক্ষেপকারী ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে। সেই কারণেই, পরিবর্তনশীল আদর্শের প্রেক্ষিতে আদর্শ অথবা নীতির পুনঃসংজ্ঞায়নকে মনে না রাখলে উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ ধরনের বিদেশনীতির প্রতিক্রিয়াকে বোঝা সম্ভবপর নয়। আবার, অন্য একটি লেখায়,অডি ক্লতজ দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে মাথায় রেখে জাতিগত সাম্যের নতুন আন্তর্জাতিক আদর্শের ভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেছেন। বাচনিক নির্মাণবাদীদের মধ্যে রলসেন 'শব্দার্থগত কাঠামো' (Framework of Meaning)-র উপর আলোকপাত করেছেন যার মধ্যে বিদেশনীতি রচিত হয় এবং কোন দেশের 'স্বার্থ ও লক্ষ্য সমূহ নির্মিত' হয়। মিলিকেন দেখিয়েছেন যে, কেমন ভাবে (নীতির) বিভিন্ন বয়ান (discourses) 'তাৎপর্যকরণের প্রণালী' (system of signification) হিসেবে সামাজিক বাস্তবতাগুলিকে নির্মাণ করে; এবং কেমন ভাবেই বা তথাকথিত সাধারণ জ্ঞান বা নীতির বাস্তব প্রয়োগসমূহ বয়ানগুলিরই ফসল। এই আলোচনার পর আমরা এমন এক পরিপ্রেক্ষিতের আলোচনায় মনোনিবেশ করব যা একই সঙ্গে ব্যক্তিবাদী ও ব্যাখ্যামূলক।

১.৪.৪ ব্যাখ্যামূলক একক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে প্রোথিত দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ (Approaches roote in a Interpretative Actor Perspective):

মার্টিন হোলিস ও স্টিভ স্মিথ যেভাবে আলোচনা করেছেন তাতে এই পরিপ্রেক্ষিতের মৌলিক এবং আরম্ভ বিন্দুটি হল এই যে, বোঝার বিষয়টি ব্যক্তিগত স্তরে অর্থসমূহের পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে শুরু হয় খানিকটা ওয়েবেরীয় 'বিষয়ীগত বোঝা'-র বা *verstehen* পদ্ধতিতে, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কীভাবে যুক্তিসজ্জায় পুনর্বিন্যাস করা হচ্ছে তা বোঝার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের বিদেশনীতি-আচরণকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কীভাবে পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ ও অনুমান করছে তাকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। এখানে, যৌথ ক্রিয়াকে ব্যক্তি ক্রিয়ার সমষ্টি হিসেবে মনে করা হয়। এহেন বক্তব্য ছাড়াও হোলিস ও স্মিথ তাঁদের তাৎপর্য নির্ণয়বিদ্যা সঞ্জাত অবস্থানের মধ্যেই একদিকে ব্যক্তিবর্গের ক্রিয়াসমূহের ব্যাখার মধ্যে পার্থক্য করেছেন সামাজিক নিয়মাবলী ও কার্যকারণগত অর্থকে মাথায় রেখে, যা একটি উর্ধ্বাধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত উপাদানকে গুরুত্ব দিয়ে যৌথ নীতি-সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয় যা নীচ থেকে উপরে বা bottom up দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। যেহেতু সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষাপটে উর্ধাধ (top down) দৃষ্টিভঙ্গিটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, সেইহেতু কার্লসনেস এখানে তাঁর আলোচনা ক্ষেত্রটিকে নীচ থেকে উপরে

বা bottom up দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত স্নাইডার, ব্রুক এবং সাপাঁ (সাপিন)-এর পথপ্রদর্শনকারী আলোচনার মধ্যে উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক পূর্ববর্তিতা খুঁজে পেয়েছেন। এবং বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর আলোকপাত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির উৎকৃষ্টতার উদাহরণ ও ব্যাখ্যা হিসেবে ফিলিপ জেলিকোউ ও কন্ডোলিসা রাইসের জার্মানির ঐক্যের উপর পরিশ্রমী গবেষণার উপর আলোকপাত করা যায়, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানি, পূর্ব জার্মানি, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের উচ্চতম বিদেশনীতি নির্ধারক এলিটদের একেবারে অন্দরমহলে নীতি-পদক্ষেপ সমূহকে উপস্থাপন করা হয়েছে তাৎপর্য নির্ণয়বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে। এর সাহায্যেই একেবারে উচ্চাসীন এলিটদের চিন্তাভাবনাকেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে।

১.৫ বিদেশনীতির ধারণা কাঠামোগুলির অন্যান্য রূপসমূহ

কার্লসনেসের বিস্তৃত তাত্ত্বিক প্রয়াসের তুলনায় সঙ্কীর্ণতর ও কিছুটা পৃথক অন্য ধরনের ধারণাকাঠামোও রয়েছে। স্টিফেন এম ম্যাট *Foreign Policy* শীর্ষক জার্নালে তাঁর প্রশংসিত বিদেশনীতির উপর সমীক্ষালব্ধ রচনায় বাস্তববাদ (Realism), উদারনীতিবাদ (Liberalism) এবং আদর্শবাদ (নির্মানবাদ)-কে তিনটি প্রধান প্যারাডাইম (Paradigm) হিসেবে বেছে নিয়ে বিদেশনীতি আচরণকে আলোচনা-বিশ্লেষণ করেছেন। জ্যাক স্নাইডার ৯/১১ উত্তর আমেরিকার বিদেশনীতির প্রেক্ষিতে প্রতিটি প্যারাডাইমকে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে। এখানে, আমরা দেখতে পাব যে, প্রতিটি প্যারাডাইমেই ৯/১১-উত্তর আমেরিকার বিদেশনীতিকে পৃথক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছে।

ছক-৩ (Table-3)

তিনটি প্যারাডাইম (paradigm) ও ৯/১১-উত্তর আমেরিকার বিদেশনীতির বিশ্লেষণ

তত্ত্বসমূহ (Theories)	বাস্তববাদ (Realism)	উদারনীতিবাদ (Liberalism)	আদর্শবাদ (Constructivism)
একেবারে কেন্দ্রীয় বিশ্বাস সমূহ (core beliefs)	আত্ম-স্বার্থ পূরণে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিযোগিতা	গণতন্ত্রের বিস্তার, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বন্ধন এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন শান্তি বৃদ্ধির সহায়ক	আন্তর্জাতিক রাজনীতি রূপ পরিগ্রহ, আলাপ-আলোচনা, সমবেত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিচিতির মধ্য দিয়ে
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান প্রধান একক সমূহ	সরকারের বৈশিষ্ট্য বা ধরণ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ আচরণ	রাষ্ট্রসমূহ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ সমূহ	নতুন নতুন ধারণার জন্মদাতা অতিরাষ্ট্রিক ক্রিয়া কার্যক্রম এবং অসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ
প্রধান প্রধান হাতিয়ার সমূহ (instruments)	সামরিক শক্তি এবং রাষ্ট্রীয় কূটনীতি	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশ্ববাণিজ্য	ধারণা ও মূল্যবোধ সমূহ

তত্ত্বের বৌদ্ধিক অন্ধ বিন্দু (blind spots)	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রগতি এবং পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেয় না অথবা বোঝাপড়া যে বৈধতা সামরিক শক্তির উৎস হতে পারে।	গণতান্ত্রিক সরকার বা regime তখনই টিকে থাকতে পারে যখন সামরিক ক্ষমতা ও নিরাপত্তা তাদের সুনিশ্চিত রাখাই সত্য বুঝতে অক্ষম	কোন কোন ক্ষমতা কাঠামো এবং সামাজিক পরিস্থিতি মূল্যবোধের পরিবর্তনে সহায়তা তা ব্যাখ্যা করে না।
		কিছু কিছু উদারনৈতিক এই রূপান্তিকালটিকে বিস্মৃত হন যে গণতন্ত্রের উত্থানের সময়ও কখনো কখনো তা সহিংস হয়ে উঠতে পারে	
৯/১১ উত্তর পৃথিবী সম্পর্কে তত্ত্ব যা ব্যাখ্যা দেয়	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন সন্ত্রাসবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল; সামরিক ক্ষমতাকে সীমায়িত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতা	সাম্প্রতিক মার্কিন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা কৌশলে ক্ষেত্রে গণতন্ত্র বিস্তার কেন এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।	মূল্যবোধ সম্পর্কে কুটতর্কের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা; অতি-রাষ্ট্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমের গুরুত্ব (সন্ত্রাসবাদী অথবা মানবাধিকারের প্রবক্তা-যে কোন ক্ষেত্রেই)
৯/১১ উত্তর পৃথিবীতে যা ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক ভারসাম্যে আনতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলির ব্যর্থতা আল-কায়দার মত অরাষ্ট্রিয় এককগুলির গুরুত্ব	কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে অন্যান্য গণতন্ত্র সমূহের সঙ্গে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে।	মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে মানবিক আদর্শের পক্ষে তীব্র সক্রিয়তা এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়-বিচারে পক্ষে প্রয়াস সত্ত্বেও।

উৎস : জ্যাক স্নাইডার, 'One World, Rival Theories

১.৬ বিভিন্ন ধারণা কাঠামো সমূহের সংশ্লেষ সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ (Problems and Possibilities of Synthesis of the Conceptual Frameworks)

এই বিভাগে, আমরা বিভিন্ন ধারণা কাঠামোগুলির একটি সংশ্লেষের প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা এবং সম্ভাবনাগুলি নিয়ে আলোচনা করব। বিদেশনীতির আলোচনায় বহু ধরণের ধারণাগত কাঠামো আমরা কার্লসনেসকে অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই ধারণা কাঠামোগুলির সীমাবদ্ধতা, অন্ধবিন্দু (blinds spots) এবং কোন একটিমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কোন সঙ্কটের প্রতিক্রিয়ায় বড় কোন বিদেশনীতি বিশ্লেষণে এর প্রয়োগ করা হয়। এই ব্যর্থতার বোধ থেকেই বিদেশনীতি বিশ্লেষণে একটি সংশ্লেষিত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়োজনটি অনুভূত হয়। যদিও এটি বলা যত সহজ দৃষ্টিভঙ্গিটি গঠন ততটা সহজ কাজ নয়। এর কারণ হল এই যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পরস্পরবিরোধী সত্তাতাত্ত্বিক, জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং আদর্শ ভিত্তিক অবস্থান থেকে উঠে এসেছে। অবশ্য, এখানে ব্যাখ্যা (explanation) এবং বোধ (understanding)/ 'ব্যাখ্যাত

অর্থ (interpretation)-এর মধ্যে পার্থক্যটি মুছে ফেলার প্রয়াসী হতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, হেবেরীয় ধারণার দ্বি-বিভাজন (binary) থেকেই এটি উৎসারিত; যেখানে হেব্বার *erklaren* ও *verstenhen*-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আবার আধুনিক দ্বি-বিভাজনে 'বস্তুনিষ্ঠতাবাদ বা positivism' এবং ব্যাখ্যাবাদ বা Interpretativism-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয় একগুচ্ছ সমস্যা সমাধানের জন্য। হেব্বার তাঁর 'reflexive sociology'-র ধারণার মাধ্যমে সমস্যা নিরসনে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু top down ও bottom up দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে শিকড় প্রোথিত থাকার কারণে সমগ্রবাদ (holism) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ (individualism)-এর দাবিগুলির সমন্বয় সাধন অত্যন্ত দুরূহ। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের 'অভ্যন্তরীণ' ও 'বাহ্যিক'-এর পার্থক্যের কারণে আরও একগুচ্ছ সমস্যার সৃষ্টি হয়। পিটার কাটজেনস্টাইন ও অন্যান্যরা দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ কাঠামোসমূহের এবং বিদেশনীতি সঞ্জাত ক্রিয়ার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে একটি 'সংহতিমূলক সেতু' গড়ার কথা বলেন। এ ব্যাপারে ম্যথু ইভানজেলিস্তা ১৯৯৭ সালে লিখিত একটি প্রবন্ধে চমৎকারভাবে পুরো বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ওয়ালজ্‌কে অনুসরণ করে পিটার গৌরভিৎজ্ ১৯৭৮ সালে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে (innenpolitik) অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টিকে 'second order reversed' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই অধ্যায়েই আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পথটি সমস্যাকীর্ণ। কোথায় অভ্যন্তরীণ অথবা কোথায়ও বা আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি প্রাধান্য পায় তা উল্লেখ না করে আদপে তাদের মধ্যেকার পার্থ্যকেই টিকিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এই দৃষ্টিভঙ্গিতে।

সেই কারণেই সংশ্লেষ সাধনের প্রয়াসটি একটি ব্যাপক ও অধিতাত্ত্বিক (meta-theoretical) স্তরে নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে পারস্পরিক বর্জনের বিষয়টি আপনিই সংগঠিত হতে পারে। কার্লসনেস একধরণের বৈশ্লেষণিক কাঠামোর কথা বলেছেন যেখানে একটি ত্রিপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হয়। এর মধ্যে বিদেশনীতির উদ্দিষ্ট বা অভিপ্রায়মূলক (international), বিন্যাসগত (dispositional) ও কাঠামোগত মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। বিষয়টিকে এভাবে দেখানো যেতে পারে: কাঠামোগত মাত্রা → অভিপ্রায়মূলক মাত্রা → বিদেশনীতি-সক্রিয়তা। বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সুস্পষ্ট হলেও প্রত্যেকটি পর্যায় কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ, একটির সম্ভাবনা একেবারে নিঃশেষ হবার পরই পরের পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়। তিনি উপসংহারে যোগ করেছেন যে, বিদেশনীতি বিশ্লেষণের ব্যাপক ধারণা কাঠামোর মধ্যে বিদেশনীতি পরিবর্তনের গতিবিদ্যাটি যেমন, তেমনি বিদেশনীতির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ধারণার ভূমিকা নির্ধারণ এবং একই সঙ্গে এজেন্সি-কাঠামোর সমস্যাটি চিহ্নিতকরণের জন্য জায়গা রাখা প্রয়োজন (Carlsnaes, 2002:331-49)।

১.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

এই এককে আমরা প্রথমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপক্ষেত্র হিসেবে বিদেশনীতি বিশ্লেষণের মর্যাদাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন বিতর্ক-বিবাদ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তারপর, আমরা বিদেশনীতির বহু ধরনের সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছি এবং তাদের সাহায্যে বিদেশনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। এর সঙ্গে সঙ্গে এজেন্সি-ভিত্তিক, সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যাখ্যামূলক একক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা বিদেশনীতি বিশ্লেষণে বিভিন্ন ধারণাগত কাঠামোর আলোচনাও ছুঁয়ে গেছি। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের মধ্যে থাকা বিদেশনীতিকে বোঝার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে চিহ্নিত করেছি। এরপর, আমরা দেখিয়েছি কীভাবে বাস্তববাদী, উদারনীতিবাদী এবং নির্মাণবাদী দৃষ্টিকোণগুলি ৯/১১ উত্তর মার্কিন বিদেশনীতিকে বোঝার ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে আমাদের

সচেতন করে তুলেছে। সর্বোপরি, আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, কেমনভাবে বিভিন্ন আদর্শ ভিত্তিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত পূর্বানুমানগুলির সঙ্গে উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটগুরি একটি সংশ্লেষ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে একটি অধিতাত্ত্বিক স্তরে। আমরা আশা করব যে, এই আলোচনা পাঠের পর মুক্ত ও দূরশিক্ষার ছাত্র বা ছাত্রী বিদেশনীতির এক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করতে পারবে।

১.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. আপনি কি মনে করেন বিদেশনীতি বিশ্লেষণ হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক অংশ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

২. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান উপক্ষেত্র হিসাবে বিদেশীনীতির অবস্থান বিশ্লেষণ করুন।

৩. কার্যকরী সংজ্ঞাসহ বিদেশনীতির প্রকৃতি আলোচনা করুন।

৪. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১ উত্তর বিদেশনীতি অনুধাবনে বাস্তববাদ, উদারনীতিবাদ, আদর্শবাদ কিভাবে সাহায্য করবে তা বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. বিদেশনীতির সংজ্ঞা দিন। এবং তাদের সামর্থ ও দুর্বলতা আলোচনা করুন।

২. বিদেশনীতির মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

৩. বিদেশনীতির মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা করুন।

৪. বিদেশনীতির ধারণা কাঠামো সমূহের সংশ্লেষ সাধনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বিদেশনীতির আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি কী?

২. টীকা লিখুন—'বিদেশনীতির উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।'

৩. বিদেশনীতির ধারণা কাঠামোর মধ্যে সংশ্লেষ সাধনের চারটি সমস্যা লিখুন।

৪. বিদেশনীতি আলোচনায় নব্য উদারনীতিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ কি?

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Carlsnaes, Walter, 'Foreign Policy', in Carlsnaes, Thomas Risse and Beth A.Simmons, *Handbook on International Relations* (London, Thousand Oaks , New Delhi:2002).
2. Snyder Jack, 'One World, Rival Theories', *Foreign Policy* 145 (November-December 2004): 52-62.
3. Petric, Ernest, *Foreign Policy: From Conception to Diplomatic Practice* (Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013).
4. Elman, Colin, 'Horses for Courses: 'Why No Realist Theories of Foreign Policies',

Security Studies 6 (1996): 7-53, cited in Carlsnaes, Keohan, Robert, ' Institutional Theory and the Realist Challenge after the Cold War', in Baldwin, *Neorealism and Neoliberalism,* cited in Carlsnaes.
5. Axelrod, Robert and Keohan, Robert 0., 'Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions', in David Baldwin(ed.), *Neorealism and Neoliberalism, The Contemporary Debate* (New York: Columbia University Press, 1993),cited in Carlsnaes,Walter, 'Foreign Policy', in Carlsnaes, Thomas Risse and Beth A. Simmons, *Handbook of International Relations* (London,Thousand Oaks, New Delhi:2002).
6. Gourvitch,Peter, 'The Second Image Reversed : The International Sources of Domestic Policy', *International Organization* 32 (1978):881-912, cited in Carlsnaes, 'Foreign Policy'.

১.১০ অন্যান্য গ্রন্থ উৎস সমূহ

1. Bauman,Rainer,Rittberger, Volker,and Wagner, Wolfgang, 'Neorealist Foreign Policy Theory' in Volker Rittberger(ed.), *German Foreign Policy Since Unification: Theories and Case Studies* (Manchester: Manchester University Press, 2001), cited in Walter Carlsnaes, 'Foreign Policy', in Fred
2. Greenstein and Nelson W. Polsby, *Handbook of Political Science*,vol.6: *Policies and Policymaking* (Reading,M.A.:Addison-Wesley,1975).
3. Hollis,Martin and Smith,Steve, *Explaining and Understanding Internatinal Relations* (Oxford: Clarendon Press, 1990),cited in Carlsnaes.
4. Jacobson,Harold Karan and Zimmerman, William, *The Shaping of Foreign Policy* (New Jersey: Transaction Publishers, 1969/2009).
5. Keohen Robert,Institutional Theory and the Realist Challenge after the Cold War', in Baldwin, *Neorealism and Neoliberalism*, cited in Carlsnaes.
6. Navari, Cornelia, ' Hobbes, and the "Hobbsean Tradition" in *International Thought'*, Millenniumll:3(1982),207.
7. Walt, Stephen, 'Alliance Formation and the Balance of World Power', in Michael E.Brown , Sean M.Lynn-Jones and Steven E.Millers(eds.), *The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security* (Cambiridge,Mass:MIT Press, 1995), cited by Carlsnaes.
8. Wendt, Alexander, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press,1999).

একক ২ ☐ বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ

গঠন

২.১ লক্ষ্যসমূহ
২.২ ভূমিকা
২.৩ বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ
২.৩.১ ভূগোল
২.৩.২ অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়ন
২.৩.৩ রাজনৈতিক ঐতিহ্য
২.৩.৪ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ
২.৩.৫ সামরিক সামর্থ্য
২.৩.৬ জাতীয় বৈশিষ্ট্য
২.৪ প্রশ্নাবলী
২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ লক্ষ্যসমূহ

এই এককে আমরা বিদেশীতির মূল নির্ধারক সমূহের বিস্তারিত আলোচনা করব। যে আলোচনার লক্ষ্যসমূহ হল নিম্নরূপ:

- কোন দেশের বিদেশনীতি কোন একটি বা একাধিক নির্ধারক দ্বারা নির্ধারিত হয় না, এ বিষয়টি বুঝতে আপনাদের সাহায্য করা।
- কোন দেশের বিদেশনীতি নির্ধারিত হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক বিপুল পরিমাণ উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার ফল হিসাবে, পাঠকদের এবিষয়ে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
- যে সকল নির্ধারকগুলি বিদেশনীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে সেই বিষয়ে বিস্তারিত পাঠকদের অবহিত করা।
- পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশনীতির নির্ধারক হিসাবে কোন কোন বিষয়গুলি কোন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তার উদাহরণের উল্লেখ করে আপনাদের একটি স্পষ্ট ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহের তাত্ত্বিক কাঠামো ও তার ব্যবহারিক বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা গঠনে সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

এই এককে আমরা বিদেশনীতিকে কেবলমাত্র একটি নির্ভরশীল চল (dependent variable) হিসেবে দেখব। এবং একই সঙ্গে দেখবার চেষ্টা করব যে কোন কোন অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যেগুলি একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে অর্থাৎ, আমরা এখানে নির্ধারকগুলিকে নির্ধারণাত্মক উপায়ে দেখব না। পরিবর্তনীয়গুলির বিশ্লেষণগত নমনীয়তাটি অংশত এই কারণে যে, বিদেশনীতি একটি বা একাধিক উপাাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় না। বরং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক বিপুল পরিমাণ উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে বিদেশনীতি গঠিত হয়। এই উপাদানগুলির কতকগুলি প্রকৃতিগত দিক থেকে স্থায়ী অথবা অপরিবর্তনযোগ্য। এবং এই কারণেই বিদেশনীতি প্রণেতাগণ এগুলিকে জ্ঞাত তথ্য (given) বলে ধরে নেন। এবং এই যুক্তিতেই এই চলসমূহ অন্যান্য চলগুলির তুলনায় অধিক গ্রহণীয় বলে নীতি গঠকরা মনে করেছেন। অবশ্য, আরও অনেক প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনীয় উপাদান রয়েছে। এমনকি, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত ভূমিকাও মৌলিক নিয়ামকগুলির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। একটি দেশের বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের অবশ্যই দেশীয় ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ, এই পরিবেশের মধ্যেই নীতি প্রণেতাগণ তাঁদের কার্যকলাপ পরিচালনা করেন; এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চলগুলিও—প্রকৃতিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী যাই-ই হোক না কেন—এই পরিবেশেরই অংশ।

২.৩ বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ

২.৩.১ ভূগোল

স্থায়ী চলগুলির মধ্যে ভুপদার্থগত উপাদানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হল এই যে, প্রথমেই আমাদের ভূগোল ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ভূগোলের মধ্যে রয়েছে অবস্থান, আকার, টপোগ্রাফ, রাষ্ট্রীয় সীমানা, জনবসতি, জলবায়ু, জলসম্পদ, মাটি ইত্যাদি। যদি আমরা প্রশ্ন করি, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কার্য-পরিচলানায় কতটা স্বাধীনতা ভোগ করেন অথবা ফ্রাঙ্কেলিয় পরিভাষায় 'নির্ধারণবাদ-ঐচ্ছিকবাদ' এর নিরন্তর অব্যাহত পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার স্বাধীনতা নীতি প্রণয়নকারীরা ঠিক কতটাভোগ করে থাকেন? তাহলে ভূগোলের গুরুত্ব তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এই বিষয়টি প্রথমে আলোচনা করবো। Holsti খুব প্রাঞ্জল ভাষায় ভূগোলের গুরুত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন—তাঁকে আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি।

'Socio-economic and security needs are clearly related to geographical and topographical characteristics. Natural endowments are not distributed evenly around the world. Some states are richly endowed with resources (think of the billions of dollars of oil wealth in some of the small Arab states); others resource poor. Some states are relatively isolated or distant from the major centres of military power, and relatively free of security threats. This was the case of the United States in the nineteenth century and remains the case for some of the small South Pacific island states today. It is not difficult to expand at length on the opportunities, vulnerabilities, and constraints that geographic and topographic

characteristics have on different countries' security, welfare and autonomy problems (Holsti, 1995:256).

এটা স্পষ্ট যে, Holsti ভূগোল-এর আলোচনায় অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাকৃতিক সম্পদ ও অবস্থানকে এবং এটি খুবই সঙ্গত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা রাষ্ট্রীয় অবস্থানের গভীর তাৎপর্য লক্ষ্য করেছি। ব্রিটেনের দ্বীপাবস্থান এবং মহাদেশীয় ইয়োরোপ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা সমুদ্রপারে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রভূত সাহায্য করেছিল এবং আত্মরক্ষা ও আক্রমণের ক্ষেত্রে তার নৌশক্তির উপর নির্ভরতা বাড়িয়েছিল। আমেরিকার সমর কুশলীগত অবস্থান 'মনরো ডকট্রিন' থেকে তাকে সুবিধা জনক বিচ্ছিন্নতা পেতে সাহায্য করেছিল যার মাধ্যমে সে আমেরিকার দুটি অর্ধেই তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু, একই ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিম ইউরোপ-এ উত্থিত পরিস্থিতি তাকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল, যেহেতু জাপানের মত তার কাছেও আতলান্তিক মহাসাগর প্রথম প্রতিরক্ষা রেখা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। জাপানের ক্ষেত্রেও তার অবস্থান তাকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ জাহাজ নির্মাণকারি জাতিতে পরিণত করেছিল। রাশিয়ার চতুর্দিক স্থল বেষ্টিত হওয়ার কারণে সে বালতিক ও কৃষ্ণসাগরে সংযোগ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে পোল্যান্ড-এর বাফার রাষ্ট্র (buffer-state) হিসেবে অবস্থান এবং জার্মানি ও ফ্রান্স এর মধ্যে বেলজিয়ামের অবস্থান সর্বদাই ঐ দেশ দুটিকে তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যেকার যুদ্ধে ফাঁদে আবদ্ধ করেছিল। আবার, ভারতের উভয় দিকে পাকিস্তানের দ্বিবিভাজিত অবস্থিতি একধরনের নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছিল যার পরিসমাপ্তি ঘটে কেবল তখনই যখন এর বিভাজন ঘটে। ইওরোপের বাকি অংশ থেকে স্পেনের রাজনীতির ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা পীরিনিয়দের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। একইভাবে, দক্ষিণ প্রান্তের থেকে তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তরপ্রান্ত থেকে ইতালিকে আক্রমণ সহজ ছিল। কেননা, দক্ষিণ প্রান্তে আল্পস পর্বতের উপস্থিতি ইতালিকে আক্রমণের বিষয়টিকে দুরূহ করে তুলেছিল। ইংলিশ চ্যানেল নেপোলনীয় ফ্রান্স ও হিটলারের জার্মানির কাছে যে প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল তা প্রমাণিত। অন্যদিকে, আদেন ও সিঙ্গাপুর-এর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি যে ব্যাবেল ম্যান্দের সুয়েজ খাল এবং মালাক্কা প্রণালীর কারণেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার, দারদানেস, বসফরাস এবং জিব্রালটার প্রণালীর চারধারে ভূমি ও ছোট ছোট খণ্ডভূমির অবস্থানের জন্য এই অঞ্চলটি বিরামহীন সামরিক ও কূটনীতিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিল। অন্যদিকে, তাহিতি, ইয়্যাপ, মাদাগাস্কার, সিলন এবং পূর্বতন ফরমোসার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জগুলি তুলনামূলকভাবে কম সামরিক গুরুত্ব পেয়েছিল তাদের স্থানিক অবস্থানের কারণেই। ভারতের ক্ষেত্রে এই দুর্ভেদ্যতা সম্ভব করে তুলেছিল উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি, পূর্ব-সীমানায় অবহিমালয় পর্বতসমূহ আর জঙ্গল। অবশ্য, বর্তমানে পাকিস্তানে খাইবার পাসের কারণে এই দুর্ভেদ্যতা লঙ্ঘিত হয়েছে। এবং এশীয় মহাদেশীয় অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থানের জন্য, যা আদেন থেকে তোকিও পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে এটাকে নিশ্চিত করেছিল সেই প্রাচীন সময়কাল থেকেই যে, ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সে এশীয় রাজনীতিতে ও ইতিহাসে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৯/২০০০: ২৮-৩১)।

কৌটিল্য ও অ্যারিস্টটলের সময় থেকে বিদেশনীতিতে ভূগোলের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়ে আসছে। কৌটিল্যের সুবিখ্যাত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, রাজা বা বিজিগীষু তার সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখতে কোন ভৌগোলিক অঞ্চলকে অধিকার করতে হবে। 'সার্বভৌম শাসকের শাসনাঞ্চল হিমবৎ এবং সমুদ্রের উত্তর দিকে সহস্র যোজন বিস্তৃত হবে। (অর্থশাস্ত্র: ৯/১/১৮) একজন আধুনিক ভাষ্যকারের মতে, এই অধিগ্রহণযোগ্য অঞ্চলের

ধারণাটি অবাস্তবোচিত। কারণ, সহস্র যোজনের অর্থ হল ন'হাজার মাইলের অধিক যা পুরো ভারতীয় উপমহাদেশকে ছাপিয়ে যাবে। তিনি বিভিন্ন ভাষ্যকারের মত পর্যালোচনা করে এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, কৌটিল্যের মতামতকে একটু উদারভাবে দেখতে হবে এবং ভারতীয় উপমহাদেশ বলতে দক্ষিণাংশকে বাদ দিয়ে ধরতে হবে। ঐ ভাষ্যকার আরও অনুমান করেছেন যে, কৌটিল্য বিজিগীষুকে দিয়ে এই অঞ্চলটি অধিকার করাতে চেয়েছিলেন, কারণ, অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরে এক ধরণের সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছিল; যার মাধ্যমে তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল যে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্পৃহা ব্যতীত বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলা তো করা যাবেই না, বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার সেখানে বাতুল চিন্তা; এবং একই সঙ্গে সামন্ত রাজ্যিক বাধা থাকলে বাণিজ্য-দ্রব্যের অবাধ সঞ্চলনও সম্ভব হবে না (বাসু, ২০১৪)। অ্যারিস্টটলও বিদেশনীতির নির্ধারক হিসেবে ভূগোলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, 'ইউরোপের শীতলতর দেশগুলির বাসিন্দারা সাহসী, কিন্তু তাদের চিন্তা ও প্রাযুক্তিক দক্ষতার অভাব রয়েছে। পরিণামে, তারা অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বাধীন থাকতে পেরেছে। অবশ্য রাজনীতির সংগঠন না থাকার কারণে তারা তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উপর শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয় নি (বিদ্রা, ১৯৮৮: ৩৫)। একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকের আগে বিদেশনীতি গঠনে পদ্ধতিনিষ্ঠভাবে ভূগোলকে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপদান হিসেবে দেখা হয়নি। ফরাসী দার্শনিক Victor Cousin খানিকটা অনমনীয় ভাবে ভৌগোলিক চিন্তার গুরুত্ব প্রচার করেছিলেন যা পরবর্তীতে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ভূরাজনীতি যেহেতু অন্তর্নিহিত অর্থেই একটি গতিশীল ধারণা—যা স্থান ও ক্ষমতার আর্ন্তসম্পর্কটি বর্ণনা করে—সেহেতু বিদেশনীতির আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নিয়েছে। জার্মান ভূগোলবিদ Freidrich Ratzel (1844-1904) anthropogeographie নামে একটি শব্দ ব্যবহার করেন যা ভূগোল, নৃতত্ত্ব ও রাজনীতির সংশ্লেষ। এর মধ্যেই পরবর্তীকালের ভূরাজনীতির চিন্তার পূর্বাভাস নিহিত রয়েছে। অপর এক সুইডিশ ভূগোলবিদ Rudolph Kjellen (1862-1922) প্রথম ভূ-রাজনীতি কথাটি ব্যবহার করেন জাতীয় ক্ষমতার ভূ-রাজনীতিক ভিত্তিটি বোঝানোর জন্য। তিনি ডারউইনকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রের জৈবিক মতবাদ উপস্থাপন করেন, যেখানে রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রাণীদের মত টিকে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রামে রত। রাষ্ট্রকে হয় তার স্থানিক সীমানা বাড়িয়ে যেতে হবে নতুবা ধ্বংস হয়ে যেতে হবে। এখানে স্মরণ করা যায় যে, তিনজন ব্যক্তিত্ব যারা প্রত্যেকেই ভূ-রাজনীতি শব্দটি ব্যবহার না করলেও তাঁদের লেখাতেই ধ্রুপদী ভূ-রাজনীতিক তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এঁরা হলেন—আলফ্রেড থিয়ের মাহান, একজন আমেরিকান নৌ আধিকারিক ও ঐতিহাসিক; স্যার হ্যালফোর্ড ম্যাকিণ্ডার (১৮৬১-১৯৪৭), একজন ব্রিটিশ ভূগোলবিদ; এবং হাউসফার, একজন জার্মান জেনারেল, ভূগোলবিদ, সামরিক বিশেষজ্ঞ ও দূর-প্রাচ্য ভ্রামণিক (Dougherty and Pfalzgraff, 1990: 59-64-05)। উল্লেখিত তাত্ত্বিকদের তত্ত্ব-প্রয়াসে এবং পরবর্তী একশ বছরেরও অধিককাল পর্যন্ত যত তাত্ত্বিক প্রয়াস দেখা গেছে তাতে ভূ-রাজনীতি নতুন নতুন অর্থ ও স্বর লাভ করেছে। Gerard Tuathail বলেন যে, Kjellen ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী চিন্তকদের কাছে ভূ-রাজনীতি হল পশ্চিমের সেই সাম্রাজ্যবাদী ভাবনার অংশ যা প্রাকৃতিক পৃথিবীর সাথে রাজনীতির সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে আলোচনা করে। জার্মান সামরিক বিশেষজ্ঞদের লেখায় ভূ-রাজনীতির ধারণাটি কুখ্যাত নাৎসি lebensraum-এর অনুসন্ধানের ধারণাটির সঙ্গে সম্পর্কিত; যেখানে lebensraum বলতে নিজস্ব বাসস্থান বোঝান হয়েছে। এই তাত্ত্বিক চিন্তাটি দীর্ঘকাল খারিজ হয়ে যাবার ও মুলতুবি থাকার পর পুনরায় ঠান্ডা যুদ্ধের শেষের দিকে এক নতুন তাৎপর্য নিয়ে উঠে আসে। সমগ্র বিশ্বের ভূমি, জলাশয়,ও সামরিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েমের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার কথা বলতে শুরু করে। এবং ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর যুগে, এর অর্থ

হয়ে দাঁড়ায় 'বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের এক বা একাধিক ব্যাপক কল্প চিত্র (vision)-এক বৃহৎ ছবি—যা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থার সাথে স্থানীয় ও আঞ্চলিক গতিশীলতাকে যুক্ত করে।'

মাহান সামুদ্রিক ভূ-রাজনীতির কথা বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখে। বৃটেনের সুবিধার কথা ভেবে ম্যাকাইন্দার ভূমি ভিত্তিক ভূ-রাজনীতির কথা বলেছেন, যেখানে রাশিয়া বা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'ইতিহাসের চালিকাশক্তি' বা 'heartland' হিসেবে দেখে তার প্রতি সতর্ক নজর রাখতেউপদেশ দিয়েছেন। Karl Haushofer জার্মান পরিবেষ্টনের (encirclement) তত্ত্ব দিয়েছেন। Nicholas J. Spykman, যিনি বাস্তববাদ-এর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা তাত্ত্বিক হিসেবে খ্যাত, ভূ-রাজনীতির বাস্তববাদী তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে লিখিত দু'টি প্রবন্ধ—১৯৩৮ সালে লিখিত 'Geography and Foreign Policy' এবং ১৯৩৯ সালে লিখিত 'Geographic Objectives in Foreign Policy' এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত গ্রন্থ 'The Geography of the Peace' (1944)-এ যা তাঁর বক্তৃতা, মানচিত্র, টীকা, চিঠিপত্র নিয়ে রচিত—Spykman আলোচনা করেছেন কীভাবে একটি দেশের আয়তন, বিশ্বে ও অঞ্চলে তার অবস্থান জাতি সমূহের বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে। আমরা Spykman-এর তত্ত্ব বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করব, কারণ তিনি ভূগোল ও বিদেশনীতির আন্তসম্পর্কটি এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

Spykman-এর কাছে ভূগোল গুরুত্বপূর্ণ কারণ, 'ভৌগোলিক অঞ্চল' একটি রাষ্ট্রকে তার 'স্থানিক ভিত্তি' যোগান দেয় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও শান্তির সময়ের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে। যদিও ঐতিহাসিক ভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি সবই বৃহৎ রাষ্ট্র, তথাপি, ভেনিস, হল্যান্ড এবং গ্রেট বৃটেনের মত ব্যতিক্রমী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যারা সমুদ্র নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন করেছিল তারা প্রমাণ করেছিল যে, রাষ্ট্রের বৃহৎ আয়তন 'সব সময় শক্তির পরিচায়ক না হলেও সম্ভাব্য শক্তির পরিচায়ক' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বৃহৎ সম্পদ অথবা দায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; কারণ তা নির্ধারিত হয় 'প্রাকরণিক, সামাজিক, নৈতিক এবং মতাদর্শগত বিকাশের মাধ্যমে, একটি রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত গতিশীল শক্তি সমূহ, অতীতের রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ এবং ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিত্বের দ্বারা।' আয়তনের আবার শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে 'কার্যকরী কেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণের' দ্বারা যা আবার 'কেন্দ্র থেকে প্রান্তের মধ্যে কার্যকরী সংযোগ ব্যবস্থার' উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই, ইনকারা, পারসিকরা, রোমকগণ, ফরাসীরা, চীনা ও রাশিয়ানরা হাইওয়ে, রাস্তা ও খাল তৈরি করেছিল এবং আধুনিক জাতিরাষ্ট্রগুলি রেলপথ ও বিমানপোত নির্মাণের সাথে সাথে তাদের বৃহৎ অঞ্চলকে নিজ নিজ এলাকরা সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। 'স্থানিকতার বিষয়টি' পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু তার তাৎপর্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয় যোগাযোগের মাধ্যম, যোগাযোগের পথ, যুদ্ধের কৌশল এবং অবশ্যই বিশ্বশক্তির কেন্দ্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সেই জন্য স্থানের সম্পূর্ণ গুরুত্ব বোঝা সম্ভব তখনই যখন একে দুটি চিন্তা-কাঠামোর ব্যবচ্ছেদ বিন্দুতে স্থাপন করে আলোচনা করা হবে; যেখানে ভূগোল যোগান দেয় স্থান সম্পর্কিত তথ্যাদি আর ইতিহাসের মাধ্যমে আমরা মূল্যায়নের মাপকাঠি পেয়ে থাকি।

Spykman দেখিয়েছেন যে, অবস্থানের আঞ্চলিক মাত্রাটি অধিকাংশ রাষ্ট্রকে তিন ভাগে ভাগ করে; এগুলি হল—'স্থলবদ্ধ রাষ্ট্র' 'দ্বীপরাষ্ট্র' এবং 'স্থল ও সমুদ্রের সীমানা সম্বলিত রাষ্ট্র সমূহ'। নিকট প্রতিবেশীর থেকে, অন্যান্য নৌ-শক্তির থেকে অথবা বহুতর উৎস থেকে নিরাপত্তা জনিত আশঙ্কাগুলিও নির্ধারিত হয় অবস্থানের দ্বারাই। ফ্রান্স, জার্মানি এবং রাশিয়া মুখ্যত স্থল-বদ্ধ রাষ্ট্র, যদিও তাদের ভূমি ও সমুদ্র সীমান্ত উভয়ই বিদ্যমান। তদনুসারে ভূমি-নির্ভর প্রতিবেশীরা তাদের নিরাপত্তা সমস্যার উৎস। গ্রেট বৃটেন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

দ্বীপ রাষ্ট্র হওয়ায় তাদের মধ্যে সমুদ্রশক্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাওয়া যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বীপ রাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয়েছে, কারণ তার নিরাপত্তার সমস্যা কখনই কানাডা ও মেক্সিকোর মত ভূমি-ভিত্তিক নিকট প্রতিবেশীর কাছ থেকে আসেনি। কিন্তু চীন ও ইতালি স্থল ও সমুদ্র সীমানার সম উপস্থিতির কারণে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি একটি মিশ্র প্রেক্ষাপট থেকে বিচার করে; এবং এটাই উভয় দেশের বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক অবস্থানের ভিত্তি রচনা করে। Spykman-এর মতে রাষ্ট্রসমূহ কখনই তাদের ভূগোলকে উপেক্ষা করতে পারে না। না বিদেশমন্ত্রক বা কার্যালয়, না জেনারেল স্টাফ বা সেনাবাহিনী, কেউই ভূগলোকে এড়িয়ে চলতে পারে না। কারণ, 'Geography does not argue. It simply is.'

Spykman-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে রাষ্ট্রগুলির বিস্তারের ছাঁদ বা ধরণ বিশ্লেষণ করেছে। কারণ, তাঁর মতে, একমাত্র বড় সময়-কাল (time-scale) জুড়ে দেখলে তবেই রাষ্ট্রগুলিকে 'সংগ্রামরত ক্ষমতা সংগঠন' রূপে দেখান সম্ভব হবে। Spykman বিস্তারের যে ঐতিহাসিক উদাহরণগুলি দিয়েছেন, সেগুলি হল: ক) যোগাযোগের পথ হিসেবে নদী উপত্যকাকে যারা ব্যবহার করেছে; (যেমন নীল নদের তীরবর্তী মিশর, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের পার্শ্ববর্তী মেসোপটেমিয়া, হোয়াং-হো-র উপর চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মিসিসিপি ও মিসৌরি); খ) স্থলবদ্ধ রাষ্টগুলি যারা সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে যোগাযোগের জন্য উন্মুখ থেকেছে, তারা হল, বাবিলনীয় ও আসিরীয়রা ভূমধ্যসাগরের জন্য, বলকান শক্তিসমূহ অ্যাড্রিয়াটিক-এর জন্য এবং রাশিয়া বরফ-মুক্ত বন্দরের জন্য; গ) দ্বীপ রাষ্ট্রগুলি নিকটবর্তী সমুদ্র বরাবর অঞ্চল জয় করায় আগ্রহী ছিল। (গ্রেট বৃটেন ইউরোপের পশ্চিমের সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চল, জাপান চীনের উত্তর দিকের সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চল দখলে আগ্রহী ছিল); ঘ) গ্রেটবৃটেন, জাপান, হল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্র-পথগুলি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট থাকত সামরিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ঙ) যে রাষ্ট্রগুলি 'circumferential and transmarine' বিস্তারের ভূমধ্যসাগর, আমেরিকা ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ); এবং চ) যারা নিজেদের সীমানা আরও বিস্তারের জন্য সীমানা সংশোধন এবং নিয়ন্ত্রণ করতে চায়; (রাশিয়া, রোম সাম্রাজ্য, মোঙ্গল সাম্রাজ্য, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। এই বিস্তারমূলক ধাঁচগুলো যা প্রত্যক্ষ করা গেছে হিটলার, মুসোলিনী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আচরণের মধ্যে তার আশু পরিবর্তন শুধু এই কারণেই করা যাবেনা কতিপয় আন্তর্জাতিক সংগঠন তাদের উপর নজর রাখছে। Spykman-এর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই হিটলার কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইউরোপীয় পর্যায়টি শুরু হয়ে যায় এবং তার আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটে আটলান্টিকের পারের অঞ্চলে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ও প্রকৃত পক্ষে গোটা পৃথিবী জুড়েই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানটি বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে Spykman দেখিয়েছেন কেমন করে সে কেন্দ্রীয় উত্তর আমেরিকার পূর্ব সীমান্ত বরাবর সমুদ্রাঞ্চল এরএক ফালি ভূখণ্ড নিয়ে শুরু করে আজ দৈত্যসম মহাদেশীয় শক্তিকে পরিণত হয়েছে; বর্তমনে আমেরিকা উত্তর আমেরিকার কেন্দ্রের সমগ্র স্থলভূমিতেএ তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে যা আতলান্তিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি নিহিত রয়েছে ইউরোপের সংহতিহীনতা ও নির্বিঘ্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। transatlantic অঞ্চলে আমেরিকার ইউরোপের সাপেক্ষে ঠিক যেমন অবস্থান, তেমনই একজন আগ্রহী তৃতীয়পক্ষ হিসেবে, ইুরেশীয় মহাদেশের ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনের অবস্থানটিও অনুরূপ। যুগ যুগ ধরে দেখা গেছে যে, মহাদেশীয় শক্তি-সাম্য বিনষ্ট করতে উদ্যত এমন যে কোন শক্তিকে বৃটেন বাধা দিয়েছে। এবং এমনকি ঐতিহ্যগত দিক থেকে দৃঢ়ীকৃত শক্তি সমূহের কোয়ালিশনগুলির যে কোন একটি শক্তিও যদি প্রতি ভারসাম্য তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছে, তখন তাকে বৃটেন বাধা দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে।

কেবলমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই জার্মানির মহাদেশীয় আধিপত্য কায়েমের ইচ্ছাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ইউরোপ অ-ইউরোপীয় শক্তির হস্তক্ষেপ চেয়েছিল। কিন্তু, 'ইউরোপের ক্ষমতা কাঠামোর ভিত্তি এমন ক্রুরভাবে নাড়া খেয়েছিল যে ১৯৩০-এর দশকেও ইউরোপ আত্ম-ভারসাম্য রক্ষাকারী একটি ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা রূপে আর গণ্য হত না। Hajo Holborn যাকে 'ইউরোপের রাজনৈতিক পতন' আখ্যা দিয়েছেন, তার প্রসঙ্গ ধরে যে ভূ-রাজনৈতিক শিক্ষা Spykman গ্রহণ করেছিলেন, তার ভিত্তিতে তিনি আমেরিকার বিচ্ছিন্নতার নীতি ও 'নিরপেক্ষতা আইন' নিয়ে তার ভাবনা চিন্তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ক্ষমতার সাম্যের প্রতি জার্মানির চ্যালেঞ্জকে মাথায় রেখে এবং হাউসফার ও তাঁর সহকর্মীদের Geopoltik-এর ধারণাকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে Spykman ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কীভাবে জার্মানি উত্তরের সমুদ্র থেকে ইউরাল পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগকে বিরাট 'জীবন্ত ক্ষেত্র' হিসেবে বিবেচনা করে একে একটি অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং একই সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভাবনার ভিত্তিরূপে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। কারণ জার্মানির লক্ষ্য ছিল, যেকোন আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষমতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া। Spykman আরও দেখিয়েছেন, কীভাবে নিকট-প্রাচ্যের দেশগুলিকে, যারা কিনা ভারত মহাসাগরের এবং তৈল খনিগুলির দিকে যাবার সহজ পথ ছিল, জার্মানি আধা-স্বাধীন দেশ হিসেবে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঐ দেশগুলিকে জার্মানির নিয়ন্ত্রণের আগ্রহ ছিল কারণ ঐ তেলখনিগুলির উপর জার্মানির অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। এমনকি, আফ্রিকাও জার্মানির এই পরিকল্পনার অংশ ছিল। কারণ, তার মনে হয়েছিল যে, একবার যদি আফ্রিকাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে কাঁচামালের যোগান এবং আতলান্তিক বরাবর দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার রাস্তাও নাগালের মধ্যে এসে যাবে। যদি জার্মানি মহাদেশের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম হত, তবে সে সমগ্র ইউরোপে আর সম্পদ যুক্ত করে সহজেই সমুদ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম সফল হত যা সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অরক্ষিত বা নিরাপত্তাহীন করে তুলত। সেইজন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পদ, যুদ্ধের উপকরণ ও মানব সম্পদের ব্যবহার করা সম্ভবপর ছিলনা কেবলমাত্র যুদ্ধের ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্য। কারণ যুদ্ধটি ছিল মুখ্যত একটি 'ইউরোপীয় ক্ষমতার লড়াই' (Spykeman, 2008: xi,xii,xv) এবং Cohen, 2009: 22-23)।

মুখ্যত এর নির্ধারণমূলক প্রকৃতির কারণে প্রায় সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হওয়ার জন্য ভূরাজনীতির তত্ত্বে অনেক পরিবর্তন আসে। Harold Sprout (1901-1980) ও Margaret Sprout (1903-2004) বাস্তবাদিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূরাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সনাতন ভূরাজনীতির একমাত্রিকতা ও নির্ধারণবাদ থেকে জন্ম নেওয়া অসন্তুষ্ট এবং মানবিক ক্রিয়ার মানবিক ও অমানবিক সম্পদের অসম বণ্টনের মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার কারণে, স্প্রাউট দম্পতি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁরা পরিবেশকে একটি বহুমাত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখেছেন যেখানে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের ধারণাসমূহ অথবা, অন্যভাবে বলতে গেলে 'পরিবেশগত মনস্তত্ত্ব' (psycho milieu) এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণ জরুরী। এর ফলে স্প্রাউট দম্পতির মতে, ভূগোল, জনবিন্যাস, প্রযুক্তি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ সহজ হবে। একই সঙ্গে, প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য করা ও পরিমাণমূলক উপাদানগুলি—অর্থাৎ জনবসতি ও ভূখণ্ড—সমান গুরুত্ব পাবে (Sprout, 1964: 35, 67-91)। ভূরাজনীতিক তাত্ত্বিককরনের থেকে স্প্রাউট দম্পতির সরে আসার পরেও ভূরাজনীতি কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে George Liska ভূরাজনীতিক উপাদানগুলির সাহায্যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ভারসাম্যের গতিশীলতা বুঝতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি একধরণের মামুলি ও অতি

সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ইউরোপীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের যে পুনরাবৃত্ত ধাঁচটি লক্ষ্য করা যায় তা আসলে মহাদেশীয় ও সমুদ্র তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলির সংঘাত। Robert Holt ও John Turner বৃটেন, সিলন ও জাপানের বিদেশনীতির তুলনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কেমনভাবে দ্বীপ মানসিকতা তাদের বিদেশনীতির উপর প্রভাব ফেলেছে। Richard Merrit রাজনৈতিক এককগুলির সংহতির প্রশ্নে সান্নিধ্যহীনতার প্রভাব কতটা তা খতিয়ে দেখেছেন, যেহেতু কোনরকম সংলগ্নতাহীন রাষ্ট্র বা Polity প্রাকৃতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে যোগাযোগের সূত্র রক্ষার্থে বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাই আন্তর্জাতিক পরিবেশের বদলগুলির প্রতি তাদের অনেক বেশি স্পর্শকাতর করে তোলে। এবং একই সাথে অন্তর্দেশীয় জলরাশি, ভূভাগীয় ও গভীর সমুদ্রে, আকাশপথ ও ভূভাগের অধিগম্যতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগ নিয়ে চিন্তাচ্ছন্ন থাকে। মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এবং পূর্বতন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফেডারেশনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিক্রিয়ায় এই আচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা গেছে (ibid., 70-1)। বিবিধ সমালোচনা সত্ত্বেও ভূরাজনীতির পরিচিতি নিয়ে বিস্তর মারপ্যাঁচ হলেও বিশিষ্ট চিন্তা গোষ্ঠী হিসেবে এর মৃত্যু ঘটেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভূরাজনীতি শব্দটি জনপ্রিয়তা হারালেও ১৯৭০-এর দশকে হেনরি কিসিঞ্জার, মার্কিন রাষ্ট্র সচিব ও সুপরিচিত বাস্তববাদী চিন্তাবিদ, প্রায় একক উদ্যোগেই ধারণাটির পুনরুদ্ধার ঘটান এবং বিশ্বে অনুকূল ক্ষমতা-সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের সঙ্গে একে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেন। ভূরাজনীতির এই অর্থ ঠান্ডাযুদ্ধের শেষের বছরগুলিতেও সমান প্রাসঙ্গিক ছিল। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ ও তাদের সম্পদের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং দখলদারির যে প্রতিযোগিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে জারি ছিল তাও উক্ত ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হত। তখন থেকেই ভূরাজনীতির ধারণাটি নতুন করে আকাদেমিক আগ্রহের সঞ্চার করতে শুরু করে। বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনায়কগণ, জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধানরত গবেষকরা ও সাধারণ অ্যাকাদেমিকগণ ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভ্রান্তি মোচনে ভূরাজনীতির ধারণাটিরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। Tuathail ভূরাজনীতির ধারণাটির পুনরুত্থানের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন: তাঁর মতে, ভূরাজনীতির ধারণাটি পুনরায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে বলা যায় যে এই ধারণাটি বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছে। ভূরাজনীতি বিশ্বের এক 'বৃহৎ ছবি'-র প্রতি দৃষ্ট আকর্ষণ করে এবং স্থানিক ও আঞ্চলিক গতিময়তাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যবস্থাকে সম্পর্কিত করে আলোচনা করে। এই ফ্রেমের মধ্যে বিশ্বমঞ্চে অনুষ্ঠিত বিচিত্র ধরণের নাটক, সংঘাত এবং গতিশীলতা একটা বড় রণনীতিগত প্রেক্ষাপট থেকে আলোচিত হয়, যা একটা অলিম্পিয় (Olympian) দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনা করে যা অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় ও কাঙ্ক্ষিত। অধিকন্তু, সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিকতা সত্ত্বেও, এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একটি বিস্তৃত চিন্তা পরিসরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যেখানে বিশ্ব দাবার ছকে যুগপৎ ভাবে বিভিন্ন ধরণের কুশীলব, উপাদান এবং অবস্থনের প্রায় সুবিন্যস্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিটির একটি বিশিষ্ট বৈশ্বিক চিহ্ন লক্ষণ আছে; ভৌগোলিক (পৃথবী ব্যাপী) এবং ধারণাগত (ব্যাপক ও সামগ্রিক)-এই উভয় অর্থেই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিশিষ্ট। এটি বাচিকের অপেক্ষা দৃশ্যমান, মানস কল্পনার ও আদর্শমুখিতার চেয়ে অনেক বস্তুনিষ্ঠ ও নির্লিপ্ত। আরও বলা যায়, কতিপয় মানুষের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি আগ্রহ সঞ্চারী এই কারণে যে, এটি আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ এবং বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্রের আকার কীরকম হতে পারে, সে বিষয়ে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির যোগান দেয়। অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বিশ্লেষকের মতে, ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব ভবিষ্যতের এক স্ফটিক স্বচ্ছ গোলকের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি দেয় যা তাৎক্ষণিকতার মেঘাচ্ছন্ন ধন্দ অতিক্রম করে ভবিষ্যতের এক ঝলক হাজির করে যেখানে সংঘাত ও সহযোগিতার সীমারেখাগুলি স্পষ্ট। টেলি যোগাযোগের

ক্ষেত্রে বিপ্লব ও বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং ওয়েব দুনিয়ার চাপে ক্রমশ সঙ্কুচিত ও দ্রুতগামী পৃথিবীর-সেখানে সময়-স্থানের বিভাজন রেখা প্রায় মুছেই গেছে—কাছে 'চিরকালীন অন্তর্দৃষ্টি' দিতে পারে এমন তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের আকাঙ্ক্ষা বা দাবি পূর্বের তুলনায় এখন অনেক জোরাল।

ভূ-রাজনীতির যে তত্ত্ব আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে সেটি বাতিল হয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যবাদী ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্বও যেমন নয়, ঠান্ডা যুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা প্রত্যাখ্যাত তত্ত্বটিও নয়। যেটি প্রাসঙ্গিক তা Tuathail-এর ভাষায় 'নব্য ভূ-রাজনীতি', যা ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে উদ্ভূত হয়েছে এবং যা 'ভূ-রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী ইস্যুসমূহ দ্বারা চালিত' উদীয়মান ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাখ্যায় Mackinder-এর 'God's-Eye-View' দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রয়োগ করে। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্বায়ন, বাণিজ্যের, বিনিয়োগের বিভিন্ন দ্রব্যাদির এবং বিচিত্র সব ইমেজের বিশ্বব্যাপী প্রবহমানতার ও একই সাথে রাষ্ট্র, তার সার্বভৌমত্ব এবং এই উপগ্রহ পৃথিবীর ভৌগোলিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করে চলেছে। আবার, কোন কোন ভূ-রাজনীতির তাত্ত্বিক তাঁদের দৃষ্টি রাষ্ট্রগুলির ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সংগ্রামের অচল হয়ে যাওয়া তত্ত্ব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সন্ত্রাসবাদ, পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার, সভ্যতার সংঘর্ষ ইত্যাদির মত সমস্যা সৃষ্টিকারী অতি-রাষ্ট্রিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। আরেক দিকে, কতিপয় তাত্ত্বিক ভূ-রাজনীতিকে পরিবেশ রাজনীতির সঙ্গে সমার্থক করে দেখেছেন। অন্য কয়েক জন তাত্ত্বিকের কাছে 'উপর থেকে চাপানো আধিপত্যকামী রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিকে' 'নীচু থেকে উঠে আসা স্থানীয় ভিত্তিক রাজনীতি' অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এই নতুন 'ভূ-রাজনীতি' বহুলাংশেই 'সমালোচনা মূলক রাজনীতি'। এর কারণ হল এই যে, একই সঙ্গে 'বিশ্ব রাজনীতিক মানচিত্রের সাম্যহীন বর্ণনার পরিবর্তে ভূ-রাজনীতির এমন এক বয়ান উপস্থাপন করতে আগ্রহী যা 'ভূগোল ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্ণনায় ও উপস্থাপনে সাংস্কৃতিক দিক হতে একটি বিচিত্র পন্থার জন্ম দিতে পারে' (Tuathail, 2003: 1-3)।

অবশ্য, যখনই বিদেশনীতির ব্যাখ্যায় আমরা কোন তত্ত্ব প্রয়োগ করব তখন খেয়াল রাখতে হবে, ভৌগলিক অথবা ভূ-রাজনৈতিক চিন্তা যেন সব ধরণের নির্ধারণবাদের থেকে মুক্ত থাকে এবং একটি মাত্র কারণ নির্ভর ব্যাখ্যার পরিবর্তে এজেন্সি বা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হওয়া সমীচীন। Holsti জাপানের উদাহরণ দিয়ে এই তাত্ত্বিক সম্ভাবনার দিকটি দেখিয়েছেন। ১৯৩০ এর দশকে, জাপান ক্রমবর্ধমান ও সম্পদের অপ্রতুলতার মধ্যে পড়ে নিদারুণ সমস্যায় পড়েছিল। ঐ সময়েই মহামন্দা তীব্র সামাজিক দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। বৃহৎ শিল্পায়িত রাষ্ট্রগুলির নানান বিরূপতা জনক আচরণ যা জাপনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই সমস্ত কারণেই সামরিক দিক থেকে মাঞ্চুরিয়া দখলের ইচ্ছাটি জেগে উঠেছিল যার প্রক্রিয়াটি ১৯৩১ সাল নাগাদ শুরু হয়। এবং চূড়ান্ত ভাবে জাপানের চারিদিকে পূর্ব এশিয়া 'Co-prosperity Sphere' গড়ে ওঠে। সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে থেকে জাপানীরা চেয়েছিল সামরিক উপায়েই তাদের জনকল্যাণ সম্পর্কিত বিরক্তিজনক সমস্যাগুলির সমাধান করতে। দ্বীপ-রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের বিচ্ছিন্ন অবস্থান, জন বৃদ্ধির উচ্চ হার এবং সম্পদের অপ্রতুলতা তার বিদেশ নীতি-আচরণের একটি মাত্র ব্যাখ্যা হিসেবে দেখিয়ে তারা দাবী করে থাকে যে, এই কারণগুলিই তাকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করেছিল। এমনকি, কিছু যুক্তিও এই ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, যা জাপান প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। ওই যুক্তিগুলি উপস্থাপন করার আগে একথা স্মরণে রাখা উচিৎ যে, একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হবার পরই জাপান ভিন্ন ধরনের সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিল। এই সমাধান সূত্র খুঁজেছিল সামরিক প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরতায় এবং গবেষণা, বিকাশ ও শিক্ষায় যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের সাথে সাথে অতি

সক্রিয় রপ্তানী-নির্ভর বৃদ্ধির উপর। যদিও সমস্যাগুলি ছিল মূলত একই ধরনের তথাপি সমস্যা মোকাবিলার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন প্রকারের। নীতি-পছন্দ সমূহ এবং বিকল্প সমূহ বাছাই-এর সুযোগ ছিল যেমন থাকে যেকোন নীতি-পরিস্থিতিতে; ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত উপাদানগুলি জাপানকে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে থাকতে পারে তার সামনে থাকা নীতি-বিকল্পগুলির সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে। কিন্তু, বাস্তবে তারা নীতি নির্ধারণে কখনই প্রভাব ফেলেনি। কারণ প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবনের ফলে ভৌগোলিক বাস্তবতাগুলি গভীরভাবে পুর্নমূল্যায়ন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরকুশলগত ও নিরাপদ বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে গিয়েছিল দূর-পাল্লার বোমা ও আর্ন্তমহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্রের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে। এবং এই নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একেবারে নতুন সামরিক কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। একইভাবে, অনেক বিকাশশীল দেশের নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্নটি যেমন, তেমনই শিল্পায়নের ফলে তাদের লাভক্ষতির সম্পর্কিত প্রশ্নটিও বিকল্প শক্তিসম্পদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বারা পুরোপুরি পুনর্গঠিত হয়েছিল। এবং OECD দেশগুলির অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রভাবের ও সুবিধার বিষয়টিও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। (Holsti, 1995:256)।

২.৩.২ অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়ন

ভূগোলের পর দ্বিতীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিদেশনীতি নির্ধারকটি হল অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়নর ধারণা। পূর্ণ বিকশিত উন্নত রাষ্ট্রগুলি ছাড়া অন্যান্য বিকাশশীল রাষ্ট্রগুলি বৃহৎ শক্তিকে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে সার্বিক মোট বিকাশের উৎপাদনশীলতা বা GDP-এর হারটির প্রভাব ব্যাপক। এটিই শেষোক্ত দেশগুলির উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার বিষয়টিকে মোটামুটিভাবে সুনিশ্চিত করে বলে মনে করা হয়। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সক্ষমতা অর্জনের দ্রুততা ও কতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব থাকবে—এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব কেবল তখনই, যখন একটি রাষ্ট্রের বৃদ্ধির হার ও তার বন্টনের বিষয়টির আলোকে এই প্রশ্নগুলি আলোচিত হবে। একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের উপায় ও পথটি সেই রাষ্ট্রের বৈদেশিক ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা এবং একই সঙ্গে সেই সংশ্লিষ্ট দেশের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। এই বিষয়টিকে জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'boundary conditions within which such aid is to be sought and secured' (Bandyopadhyay, 2000:48) বলেছেন।

একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর বিদেশনীতির উৎস হিসেবে অথবা, অন্ততপক্ষে, বিদেশনীতিতে তার স্বাধীনতার বিষয়টি যে অর্থনৈতিক বিকাশের উপরই নির্ভরশীল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সমগ্র বিশ্বের দেশগুলির উপর মার্কিন বিদেশনীতির তাৎপর্য ও প্রভাব বা ঈষৎ অন্যভাবে, এর আন্তর্জাতিক প্রভাব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে বৃহৎ শক্তির মর্যাদাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। আমেরিকার বিদেশনীতির উপর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থেও এই বিষয়টি অকপটে স্বীকার করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে: 'Given that the United States is superpower whose foreign policy will have a major impact on the prospects for war and peace in twenty-first century, a better understanding of the polarizing role of ideology on its foreign is urgently needed' (Gries, 2014:9). OECD দেশগুলির স্বাধীন বিদেশনীতি এবং তার স্বাধীন প্রভাবের ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত কথাগুলি সত্য। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধকতাগুলিকে মাথায় রেখে সঙ্গতিপূর্ণ বিদেশনীতি গঠনের দায় তাদের নেই। তবে, সব ক্ষেত্রে এটি সত্য নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যেসমস্ত ইউরোপীয় দেশ

মার্শাল প্ল্যানের আওতায় বিদেশ ঋণ গ্রহণ করেছিল তাদের বিদেশনীতি গ্রহণে স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল। সেই কারণেই উক্ত দেশগুলির অনেককেই ন্যাটোর অগ্রাধিকার অনুযায়ী তাকে বিদেশনীতি পরিচালিত করতে হয়েছিল। কিন্তু, এই ইউরোপীয় অর্থব্যবস্থাগুলি তাদের নির্ভরশীলতাকে জয় করার পর Organization for Security and Cooperation (OSCE) এর মাধ্যমে ন্যাটোর প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছিল। তাদের মধ্যকার উত্তেজনা ও দ্বন্দ্বের বিষয়টি ২০০০ সালের পর ন্যাটোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানবিক হস্তক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত গ্রন্থ থেকে উৎকলিত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে।

"Because operations will likely be conducted with non-NATO nations, it would seem desirable to have the principle of humanitarian intervention or defense of values accepted at the widest possible level. The natural framework will be OSCE, which in theory units like-minded states committeed to democracy...However, OSCE,...has excluded enforcement action from its array of possibilities, and had never conducted the peacekeeping missions that were agreed in 1992. The United States takes the view that if it was to participate in the peacekeeping, this would most likely have to be under NATO, even though on OSCE-led operation would have the advantage of Russia being an equal participant (Aguest borawski, 19:54).'

এমনিক এই ছোট্ট উদ্ধৃতি থেকেও এই বার্তাটি স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো পুনরুজ্জীবিত ও স্বাতন্ত্র্য সচেতন ইউরোপের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষিতে OSEC-এর সুবিধাগুলোকে উপেক্ষা করতে চাইছিল না। বিশেষ করে, ন্যাটো ইউরোপীয় বিদেশনীতির স্পর্শকাতর বিষয়গুলি স্পষ্টতই বিবেচনার মধ্যে রেখেছিল।

একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর প্রভূত পরিমাণে এর অবস্থান নির্ধারণ করে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিদ্যমান বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর রেজিম গুলির সাপেক্ষে। সংক্ষেপে, কোন দেশ দাতা না গ্রহীতা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, একজন সাহায্যদাতা ও একজন সাহায্য গ্রহীতা দেশ—অর্থাৎ একটি সফল ও ব্যর্থ রাষ্ট্রের বিদেশনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হয়। একটি দাতা রাষ্ট্র খুব স্বাভাবিক কারণেই অন্য একটি গ্রহীতা রাষ্ট্রের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে বিদেশনীতি প্রণয়নে। বিদেশী সাহায্য দান দাতারাষ্ট্রকে ক্ষমতাবান করে তোলে, অন্যদিকে, গ্রহীতা রাষ্ট্রকে হীনবল ও বাধ্যবাধকতার আবর্তে আবদ্ধ করে। এমনকি, অনেক গবেষণাও ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কাল জুড়ে বিশ্বের বিদেশি সাহায্য রেজিম গুলির নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমনই একজন গবেষক Lumsdaine-কে স্বীকার করতে হয়েছিল যে, 'নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে বৈদেশিক সাহায্য করা হয়েছিল প্রথমত তাদেরকে সোভিয়েত শিবির থেকে দূরে রাখতে এবং এটিই ছিল পাশ্চাত্যের সরকারগুলির বৈদেশিক ঋণ বা সাহায্যের কর্মসূচির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা (Lumsdaine, in Pratt, 2003:64)'। স্পষ্টতই এক্ষেত্রে গ্রহীতা রাষ্ট্রের বিদেশনীতি প্রণয়নে স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

এই কারণগুলির জন্যই সকল উদীয়মান ও বিকাশশীল রাষ্ট্রের বিদেশনীতির লক্ষ্য প্রায়শই হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা বিকাশ সাধন। চৈনিক রাজনীতির ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, দেন জিয়াও পিং-এর আমলে 'জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রাধিকারের' তালিকায় অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কিত স্বার্থপূরণ; এবং 'এই প্রথমবারের জন্য চিনের আধুনিক ইতিহাসে অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণই জাতীয় বিকাশের মূখ্য লক্ষ্যে পরিণত' (Zhao, 1996:62)'। এটা বলা সহজ যে, এই 'micro-macro linkage approach' অর্থনৈতিক বিকাশ ও আধুনিকীকরণ, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বাস্তব রাজনীতির উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ

করে যেগুলি আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। এটা পরিষ্কার যে, অর্থনৈতিক বিকাশ বৃহৎ শক্তির মর্যাদালাভের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাশিয়ার ক্ষেত্রে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বিশ্বশক্তি হিসেবে তার ক্ষমতা ও প্রভাব বাড়িয়েছিল এমনভাবে যে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অপ্রত্যাশিত তো ছিলই এবং আদৌ গ্রহণীয় ছিল না (Oliker cited. 2009)। অবশ্য, ভৌগোলিক উপাদানের ক্ষেত্রে আমরা যেমন নির্ধারণবাদকে এড়িয়ে চলেছি, একইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গেও তেমনি নির্ধারণবাদের উপর অতি মাত্রায় গুরুত্ব প্রদানকে এড়িয়ে চলা উচিত। ফ্রান্সের গ্যালীয় (Gaullist) বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন মান্য গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, 'একটি দুর্বল অবস্থান থেকে শুরু করে (ফ্রান্স) বাণিজ্যবাদের একটি zero-sum শর্তের পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিল যার মাধ্যমে শক্তি অন্যান্য শক্তির রাষ্ট্রের চেয়ে বৃদ্ধি পায়,' এবং একই সাথে তিনি সতর্ক করেছিলেন এই বলে যে, 'Domestic economic growth offers only a partial explanation of (these) foreign policy goals' (Morse, 1973: 29-30)।

তাহলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্ধারকগুলি কী? এক্ষেত্রে, ম্যাক্র-অর্থনীতি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই বিচিত্র আলোচনা ক্ষেত্রের বিভিন্ন গবেষকগণ আমাদের বৌদ্ধিক দিগন্তকে আলোকিত করেছেন। কিন্তু অর্থশাস্ত্রই এই আলোচনা ক্ষেত্রটিতে প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। লিউসের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তত্ত্ব (Lewis, 1955), রস্টোর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির রাজনীতি ও 'বৃদ্ধির পর্যায়গুলি' (Rostow, 1971, 1991)-র তত্ত্ব থেকে, ম্যাক্র-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির যে নির্ধারকগুলি বিভিন্ন দেশগুলিতে দেখতে পাওয়া গেছিল, বারো (Baro) তাঁর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আলোচনা বিশ্লেষণ করেছিলেন—যার থেকেই বিভিন্ন আলোচনা-প্রেক্ষিত আমরা পেয়েছি। যদিও নব্য-উদারবাদী অর্থনীতিতে বার্ষিক বৃদ্ধির হার বা GDP-কেই একমাত্র মাত্র মানদণ্ড ধরা হয়, সব অর্থনীতিবিদই কিন্তু এর সঙ্গে সহমত নন। নব্য-মার্ক্সবাদী কাঠামোবাদী পরিপ্রেক্ষিত থেকে নারস্ক (Nursk) যুক্তি দিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানবিক গুণাবলি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক, পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পুঁজির অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তা উন্নয়নের একমাত্র শর্ত নয় (1970:1)। ক্যালডর, যিনি করব্যবস্থার উপর একজন সুপরিচিত আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ, এবং যাঁকে ভারতের অর্থব্যবস্থার একজন মান্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিবেচনাও করা হয়, মন্তব্য করেছেন যে, 'study of the dynamics of economic growth leads beyond the study of psychological and sociological determinants of these factors.' (Kaldor, 1955:1980) এমনকি, রস্টো নিজেও স্বীকার করেছেন যে, 'economic decision which determine the rate of growth and productivity of working fore and of capital should not be regarded as governed by strictly economic motives of human beings (Rostow, 1952:12)।

ভারতের ক্ষেত্রে, বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কতকগুলি 'মৌলিক বাধ্যবাধকতা' নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি উন্নয়নকে জাতীয় ক্ষমতার অর্থাৎ জনসংখ্যা, প্রাকৃতির সম্পদ এবং প্রযুক্তিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন। এর মধ্যে জনসংখ্যাকে তিনি সবচাইতে প্রতিবন্ধকজনক উপাদান বলে দেখেছেন। তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে মন্তব্য করেছেন, অন্যান্য উপাদানগুলির ক্ষেত্রে সাম্য থাকলেও একটি অধিক জনসংখ্যা সম্বলিত রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক জনগণ সম্বলিত রাষ্ট্রের তুলনায় অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থাকে। এবং এই কারণেই, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের তুলনা টেনেছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, কীভাবে বিপুল জনসংখ্যা 'ভারতের সমগ্র অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার' পক্ষেই বাধা স্বরূপ। জনসংখ্যার জন্যই অনপনেয় খাদ্য সঙ্কট, অন্যান্য দেশগুলিতে বিপুল সংখ্যায় জনগণের অভিবাসন

ও একটি বৃহৎ এবং সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়ে থাকে (2000:50-30)। উপর্যুক্ত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করা যায়। যথার্থ নেতৃত্ব থাকলে, সঠিক রাজনৈতিক কর্মসূচি গৃহীত হলে অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকলে এবং সেই সঙ্গে যদি একটি সামগ্রিক মতাদর্শ থাকে তবে এই বৃহৎ জনবসতিও সম্পদে পরিণত হতে পারে, কেবলমাত্র সামরিক শক্তির প্রকাশ না ঘটিয়ে। সামরিক যুক্তির প্রেক্ষিতে মাও জে দং তাঁর ১৯৪৯ সালে প্রদত্ত ভাষণে বলেন: 'It is a very good thing that China has a big population. Even if China multiplies her populations many times, she is fully capable of finding a solution.' একথা বলার সাথে সাথে তিনি ম্যালথাসের তত্ত্বকে বর্জন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্বাধীন চিনের বিপ্লবোত্তর বাস্তবতাকে তুলে ধরেন। মাও জোরের সঙ্গে বলেন যে, বিপ্লবের সঙ্গে উৎপাদন যুক্ত হলে জনগণের খাদ্য সমস্যা মিটে যাবে এবং বিশ্বের সমস্ত কিছুর ভিতরে জনগণই সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে, যদি জনগণ সঙ্গে থাকে, তবে যেকোন বিস্ময়কর কাজ করা সম্ভব।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পঞ্চ বর্ণের চৈনিক স্লোগানের মধ্যে মূর্ততা পেয়েছে। স্লোগানটি হল: 'রেন দুও, লিল্লিয়াং দা'। ইংরেজিতে তর্জমা করলে দাঁড়ায়: 'With Many people Strength is Great' (cited in Shapiro, 2001:31)। শ্যাপিরো অবশ্য মাওকে উদ্ধৃত করেছেন জনগণকে আণবিক অস্ত্রের লক্ষ্য হিসেবে দেখে তাঁর এ ব্যাপারে যান্ত্রিক যুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও মাও-এর যুক্তির ধার কমে না। তার কারণ হল এই যে মাও-উত্তর পর্বে স্নগস্কার-উত্তর চিনে দেং জিয়াও জিয়াও-এর সময়েও জনগণকে সম্পদ হিসেবেই দেখা হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি বড় সামরিক প্রকাশনার কথা বলা যেতে পারে; যেখানে 'ব্যাপক অর্থে জাতীয় সামর্থ্য' তৈরি হয় 'তিন ধরনের সামর্থ্য সম্পর্কিত উপাদান এবং ন'টি প্রয়োজনীয় উপাদনের' মধ্য দিয়ে। সামর্থগুলি হল, 'আন্তর্জাতিক অবদান, টিকে থাকরা ক্ষমতা এবং বলপ্রয়োগের সামর্থ্য।' অন্যদিকে প্রয়োজনীয় উপায়গুলির মধ্যে পড়ে 'বাস্তব আর্থিক সামর্থ্য, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, শিক্ষার স্তর, সামরিক সামর্থ্য, বৈদেশিক নীতি গ্রহণের সামর্থ্য, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি জনসংখ্যা এবং ভূখণ্ড'; ভূখণ্ডকে এখনও সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয় (Gurtov and Byong-Moo, 1997:21)। কখনও কখনও অবশ্য জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বা বিকাশের মধ্যে ধরা হয়না, কিন্তু চৈনিক বিদেশনীতি বিশ্লেষকরা একে 'মৌলিক ক্ষমতা বা শক্তির' তিনটি উপাদনের অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁদের কাছে অন্য দুটি উপাদান হল দেশের সম্পদ ও জাতীয় ঐক্য; অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে শিল্প, কৃষি, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, আর্থিক এবং বাণিজ্যিক উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত। বৃহৎ জনসংখ্যা যে কেবলমাত্র অবিমিশ্র প্রতিবন্ধক নয় তা ভারতের ক্ষেত্রটি বিবেচনা করলেও বোঝা যায়। এদেশের বৃহৎ জনসংখ্যা আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি বৃহৎ শিল্পায়িত দেশগুলির কাছে এক লোভনীয় বাজারে পরিণত করেছে; এবং এর ফলে ভারত তার বিদেশনীতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতি প্রণয়নে অনেক বেশি দরকষাকষির সুযোগ পাচ্ছে। ভার্মা দেখিয়েছেন যে, ভারতের আর্থিক নীতির উদারীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপারে ধারণারও পরিবর্তন হয়েছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তন ২০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন ধরা হয়।

ভার্মার ভাষায় : এই 'উদারীকরণ'-এর প্যাকেজটিতে 'বিশ্বায়িত' আর্থিক ব্যবস্থায় একটি অন্যতম মূল ভূমিকায় নিয়ে আসার জন্য হঠাৎই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কারণটি লুকিয়ে আছে এর ভোগ করা সামর্থ্যের উপর। অর্থাৎ যদি ভারত তার অর্থব্যবস্থাকে বিশ্ব বাজারের কাছে উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে ঠিক কতটা পরিমাণ সে ক্রয় করতে সক্ষম তা জানা জরুরী। ক্রয় ক্ষমতার অধিকারী বৃহত্তম অংশটিই হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তার ভোগ করার ক্ষমতাটি তার ফলে সঠিকভাবে পরিমাপ করা

সম্ভব হবে। এই পরিমাপের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেবলমাত্র ভারত সরকারের কাছেই নয়, যে কিনা সর্বদাই উন্নত বিশ্বের অর্থব্যবস্থাগুলির কাছে তার বাজারের শক্তিকে বিজ্ঞাপিত করতে ব্যস্ত; শেষোক্ত উন্নত দেশগুলির কাছেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা সবসময়েই তাদের দ্রব্যাদি ও প্রযুক্তি বিক্রয়ের জন্য নতুন নতুন বাজারের বিষয়ে যার-পর-নাই উৎসাহী। অবশ্য, 'বিশ্বে ভারতেই সর্বাধিক স্কুল-ছুট শিশু বাস করে', আবার এই দেশেই 'পৃথিবীর অন্যতম শিক্ষিত ও দক্ষ মানবশক্তির ভাণ্ডার' রয়েছে (Varma, 2004: 114-15) যা কেবল অর্থনৈতিক বিকাশের দেশজ সম্পদ নয়, তা রপ্তানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে এটা বলাই যথেষ্ট যে, শিল্পায়নের ভিত্তি, যা আবার অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশনীতির দিক নির্দেশ করে। কার্যত, প্রভূত ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপরই একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতির স্বাধীনতা নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (কয়লা, তামা, সীসা, মলিবেনডাম, ফসফেট, দুষ্প্রাপ্য, ভূ-উপাদান, ইউরেনিয়াম, বক্সাইট, সোনা, লোহা, পারদ, নিকেল, পটাস, রূপা, টাংস্টেন, দস্তা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঠ, বিশ্বের সামগ্রিক সঞ্চিত কয়লা সম্পদের সর্ববৃহৎ ভান্ডার-মোট কয়লার ২৭ শতাংশ), পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন (কেবল রাশিয়ার একার বিস্তৃত প্রাকৃতিক সম্পদের অঞ্চল রয়েছে যেখানে প্রভূত তৈল সম্পদ রক্ষিত আছে, সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্য, দুষ্প্রাপ্য ভূ-উপাদান, কাঠ আছে।) এবং ভারত (পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম কয়লা ভাণ্ডার, কাঁচা লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, দুষ্প্রাপ্য ভূ-উপাদান, কাঁচা টাইটেনিয়াম, ক্রোমাইট, প্রাকৃতিক গ্যাস, হিরে, পেট্রোলিয়াম, চুনাপাথর, চাষযোগ্য জমি রয়েছে।)—এই দেশগুলি তদের বিদেশনীতির প্রণয়নে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে সেই সব দেশগুলির তুলনায় যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত স্বল্প। ভারত প্রকৃতির সম্পাদের বিচারে যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ শক্তি, পাকিস্তান (ভূমি, বিস্তৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের ভান্ডার, সীমিত পেট্রোলিয়াম, নিম্ন মানের কয়লা, কাঁচা লোহা, তামা, লবণ, চুনাপাথর), বাংলাদেশ (প্রাকৃতিক গ্যাস, চাষযোগ্য জমি, কাঠ, কয়লা), শ্রীলঙ্কা (চুনাপাথর, গ্রাফাইট, খনিজ বালি, রত্নাদি, ফসফেট, মাচি ও জল বিদ্যুৎ), নেপাল (কোয়ারতজ, জলসম্পদ, জলবিদ্যুৎ, দৃশ্য সৌন্দর্য, লিগ্নাইট, তামা, কোবাল্ট, কাঁচা লোহার স্বল্প ভাণ্ডার), এবং ভূটান (কাঠ, জলবিদ্যুৎ, জিপসাম, ক্যালসিয়াম কারবোনেট) দরিদ্র দেশ; স্বাভাবিক কারণেই অর্থনৈতিক বিকাশে বাধার সম্মুখীন হয়। এই দেশগুলির সঙ্গে আমরা অ্যাঙ্কুইলা (লবণ, মাছ, চিংড়ি) কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ (মাছ ও সমুদ্র সৈকত), এবং বৌভে দ্বীপপুঞ্জ (কিছুই নেই)-এর এবং তাদের বিদেশনীতির প্রভাবের তুলনা টানতে পারি (CIA, n.d)।

সারা বিশ্বেই অন্য কারণে বিদেশনীতি প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকবে। ভয়ঙ্করভাবে বিশ্বের সম্পদ হ্রাস পাওয়ার কারণে। এমনকি প্রাথমিক উৎপাদনকারীরাও কিয়ত পরিমাণে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে সক্ষম ও বিদেশনীতি প্রণয়নে কিছুটা স্বাধীনতা পাচ্ছে, এর প্রমাণ পাওয়া যায় সম্পদ রাজনীতির উপর ক্রমবর্ধমান আকাদেমিক রচনার মধ্যে। প্রাকৃতিক সম্পদের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ১৯৭০ দশকের প্রথমদিকে তেলকে কেন্দ্র করে ১৯৯০-এর দশকেই পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল তেলকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠা রাজনীতিকে উদাহরণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে।

প্রযুক্তিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক এবং প্রতিবন্ধক-এই দু'ভাবেই দেখানো যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া প্রযুক্তিগত দিক থেকে বৃহৎ শক্তি; একইভাবে, জাপান, জার্মানি ও OECD দেশগুলি এবং সাম্প্রতিকে চিনও প্রযুক্তির দিক হতে বৃহৎ শক্তি হিসেবে পরিগণিত। এদের প্রত্যেকেই বিশ্বের প্রযুক্তির দিক থেকে নেতৃত্বস্থানীয়, যাদের বিদেশনীতির প্রভাব অপরিসীম। অন্যদিকে, ভারতে আমদানী

পরিবর্ত শিল্পনীতির ফলস্বরূপ যে পরনির্ভর ও অনুন্নত প্রযুক্তি এবং তার পরিণতিতে অর্থনৈতিক বিকাশের 'হিন্দু বৃদ্ধির হার' (রাজকৃষ্ণ কথিত), তা নিশ্চিতভাবেই ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশের বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যখন আবার উন্নত প্রযুক্তি গ্রহনীয় হয়ে ওঠে, তখন তা আবার প্রাযুক্তিক নীতির পরিবর্তে অর্থনৈতিক নীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। Mowery ও Rosenberg উল্লেখ করেছেন যে, 'গবেষণা ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতিগত শর্তের উপর কেবলমাত্র চোখ না রেখে' আমাদের, গবেষণালবদ্ধ ফল ও বাণিজ্যিক উদ্ভাবনে' তার প্রয়োগের উপরই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কেবলমাত্র গবেষণাকে উদ্ভাবনে পরিবর্তিত করতে পারলে তবেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে অর্থনৈতিক ফল লাভ করা সম্ভব, এবং সাম্প্রতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে যে, গবেষণা ক্ষেত্রে সামর্থ্যই কেবল গবেষণায় বিনিয়োগের থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভকে সুনিশ্চিত করে না' (1995:3)। এক অর্থে, Mowery ও Rosenberg যা বলছেন তা বহু আগেই শ্যুম্পিটার বলে গেছেন। শিল্পবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে শ্যুম্পিটার বলেন, 'The last candidate is technological progress. Was not the observed performance due to that stream of invention is that revolutionized the technique of production rather than to the businessman's hunt for profit? The answer is the negative. The carrying into effect of that those technological novelties was the essence of that hunt. And even in the inventing itself... was a function of the capitalist process which is responsible for the mental habits that will produce invention' (2013:110)। তবেই প্রযুক্তিকে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিণাম হিসেবে না দেখে একে একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ফসল হিসেবে দেখা সম্ভব হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল, যাকে বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্ভুতভাবে বলেছন 'মৌলিক বাধ্যবাধকতা' এবং যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, বৃদ্ধির ধরন বা ধাঁচ। একে পূর্বোক্ত 'মৌলিক বাধ্যবাধকতা'-র থেকে পৃথক করার প্রয়োজন। বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য যথার্থ বলেছেন যে, ব্যাপকভাবে বিচিত্র পরিস্থিতি, আদর্শসমূহ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়ন হতে পারে। উন্নয়ন অবাধ বাণিজ্যের ইংল্যান্ডে, আমেরিকা ও আর অনেক ইউরোপীয় দেশে যেমন হয়েছে, ঠিক তেমনি আবার মুক্ত উদ্যোগের ও পরবর্তী কালের ফ্যাসিবাদী জাপানে, মেইজি শাসনকাল থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মুক্ত বাজারের জাপানে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিনের কেন্দ্রীয় ভাবে নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থাতেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য, এধরণের বিচিত্র পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিতে, বৃদ্ধির ধরণটি ততদূর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যতদূর এটি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন স্থায়িত্ব বা ভঙ্গুরতা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়। এখানেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে; এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাটি আদর্শগত উপাদান বর্জিত নয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ অবধি প্রতি বৎসর ৩.৫ শতাংশ 'হিন্দু বৃদ্ধির হার'-এর পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে দেখানোর চেষ্টা হত যে ভারতের বৃদ্ধির হার কত খারাপ। কিন্তু অনেক কাল আগে শ্যুম্পিটার মন্তব্য করেছিলেন, তাঁর যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থনৈতিক উপাদানগুলিই কেবলমাত্র পুঁজিবাদের পতনের একমাত্র কারণ নয়; এমনকি যদি ১৮৭০ থেকে ১৯৩০ সাল অবধি ২ শতাংশ 'প্রাপ্ত output'-এর (যৌগিক সুদের হার) ফলে 'আধুনিক কর্মীদেরও কিছু কিছু জিনিস প্রাপণীয় হয়ে উঠেছিল যা ষোড়শ লুই পেলে আনন্দিত বোধ করতেন কিন্তু তা তিনি পান নি'। তাঁর আরও মন্তব্য: ২.৫ হারে বৃদ্ধি হলে পুঁজিবাদ অপরাজেয় হয়ে উঠবে (প্রাগুক্ত, 63-71)। তাঁর গ্রন্থে শ্যুম্পিটার অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে এটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন যে কেন একদিন পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পতন হবে। আমরা এখানে

তাঁর বক্তব্যের উল্লেখ করলাম এই কারণে যে এমনকি ভারতের 'হিন্দু বৃদ্ধির হার'-টিকেও প্রকৃত প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আলোচনা করা হয় নি; যখন একই সময়কালে অন্যান্য তৃতীয় বৃদ্ধির হার অর্থাৎ ৪.৯ শতাংশের সঙ্গে তুলনা করা হয় যেখান সমগ্র বিশ্বের বৃদ্ধির হারটি ৪.০১ শতাংশ ঐ একই সময়কালের মধ্যে। এই বৃদ্ধির হারটি খুব বেশি ছিল না যদি মনে রাখা হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডেরাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি ও শ্রমবাজারের সঙ্কোচনের ভয়ে বৃদ্ধির হারকে ৩.৫ শতাংশের কাছাকাছি এলেই বৃদ্ধির হালে লাগাম টানার কথা ভাবতে শুরু করত। তাই Woo-Cummings যথার্থই এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেন ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধির হার আমেরিকায় একেবারেই উচ্চ হার বলে অকাম্য, আর ভারতে এই বৃদ্ধির হারটিকেই শোচনীয় ভাবে নিম্ন হার বলে ধরা হবে (Woo-Cummings, 310).

এখানে, আমাদের উত্তরটি হল জনবসতি বা জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার। পারমিট-কোটা রাজ, আমদানি পরিবর্ত শিল্পায়ন এবং 'হিন্দু বৃদ্ধির হার' নিয়ে বিলাপ সত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ভারতের শিল্প-বৃদ্ধির ৭ শতাংশ হার যথেষ্ট সন্তোষজনক। পারমিট-কোটারাজ বৃদ্ধির হারকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে—এহেন উদ্বেগ ১৯৬৫ সালের পর শিল্প বৃদ্ধির হারের পতনের বিষয়টিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছিল। যাঁরা এব্যাপারে খুব হৈ চৈ করেছিলেন তাঁরা এটা খেয়াল করেননি বা খেয়াল করলেও এটা প্রকাশ করেন নি যে, এই বৃদ্ধির হারের হ্রাস, যার জন্য নীতিকথন জুটেছিল ভারতের কপালে, ১৯৮০ সালেই শিল্প-বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৭.৯-এ গিয়ে পরিণতি পেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে হারের পতনের নানাবিধ কারণ ছিল। এগুলি হল জলবায়ু সম্পর্কিত, সামাজিক-রাজনৈতিক, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালের খরা এবং অংশত এর ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। একই সঙ্গে যাঁরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ধাঁচটি নিয়ে বিদ্রূপ করেন, তাঁরা রব জেনকিন্সের কথাগুলি মনে রাখলে ভালো করবেন। জেনকিন্সকে অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁর মতে, 'প্রচণ্ডভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নীতিই' হয়ত বা সংস্কারের দিকে উত্তরণের পথটি সুগম করে থাকতে পারে 'গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির লালনপালন করে' এবং অতঃপর 'প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করে সংস্কার বা গণতন্ত্রকে ছোট না করেই' (Rob Jenkins, 211)।

বন্দ্যোপাধ্যায় সব থেকে সফল দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশ বা উন্নয়নের ইতিহাস থেকে তাত্ত্বিক পাঠ গ্রহণ করে উল্লেখ করেছেন যে, কীভাবে সাংবিধানিক বাধা, রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মতাদর্শ ভারতে অর্থনৈতিক বিকাশের গতিপথটিকে রূপদান করেছিল। তবে, এখানে এটা আমাদের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা মূলত অর্থনৈতিক বিকাশের কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করব। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় একে অর্থনৈতিক বিকাশের তৃতীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই কূটনীতিতে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এবং বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক ঋণের বিষয়টি আলোচিত। কিন্তু আমরা এখানে আলোচনার খেই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এর ভিতরে প্রবেশ করব না।

২.৩.৩ রাজনৈতিক ঐতিহ্য

এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, একটি দেশের বিদেশনীতি সেই দেশের প্রাচীন ও সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। এটা স্পষ্ট নয় যে কেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্ধারকটিকে ভারতের মত নব্য স্বাধীন দেশের পক্ষে অতি জরুরী বলে মনে করেছেন (প্রাগুক্ত, 69)। কারণ, এই ধারণাটি দীর্ঘকাল থেকে অস্তিত্ব সম্পন্ন জাতিগুলির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। উদারনীতিবাদ ও গণতন্ত্রের ধারণা দুটির

উপর গুরুত্ব না দিয়ে কী ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতিগুলি বোঝা সম্ভব? অথবা, ইউরোপের উপর প্রাধান্য বজায় রাখার সাবেকী জার্মান ভাবনাকে উদারনীতিবাদের সাপেক্ষে বা নিরপেক্ষে, বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে জার্মান বিদেশনীতিটি বোঝা সম্ভব? মার্ক্সের বিখ্যাত উক্তিটি থেকে ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের গুরুত্বটি উত্তমভাবে বোঝা যেতে পারে। উক্তিটি উদ্ধৃত করা হল:

'Men make their own history, but not as they please. They do to choose the circumstances for themselves, but have to work upon circumstnaces as they find them, have to fashion the material handed down by the past. The legacy of all the dead generations weight like an alp (mountain) on the brains of the living. At the very time when they seem to be revolutionizing themselves and things, when they seem to be creating something perfectly new—in such epochs of revolutionary crises, they are eager to press the spirits of the past into their service, borrowing the names of the dead; reviving old war cries, dressing up in raditional costumes, that they make a braver pageant in the newly staged scenes of world history' (Eighteenth Brumaire: 23).

প্রায় একই রকম অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে কিছুটা তীক্ষ্ণ হতাশার মাধ্যমে নিৎসের ভাষায়:

'For as we are merely resultant of previous generations, we are also the resultant of their errors, passions and crimes; it is possible to shake off this chin. Though we condemn the errors think we have escaped them, we cannot escape the fact that we spring from them (Nietzsche, 1873: 21).

ভারতের ক্ষেত্রে রাজনীতি ও ক্ষমতার আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আন্তর্জাতিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং বর্ণবাদ বিরোধিতা ও এশীয়বাদ সম্পর্কে আদর্শবাদী মনোভঙ্গি এবং একই সঙ্গে পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সাম্যবাদকে বর্জন তার বিদেশনীতির অভিমুখ নির্ধারণের সবথেকে উর্বর উৎস হিসেবে দেখা যেতে পারে (Bandyopadhyay, 69-70)। অন্যান্য গবেষকরা ভারতের নির্জোট নীতির উৎসটি খুঁজে পেয়েছেন তার প্রাচীন ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে (Rana, 1976)।

২.৩.৪ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ

বিচ্ছিন্নভাবে বিদেশনীতির নির্ধারক হিসেবে অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় পরিবেশ বা পরিস্থিতিকে বাহ্যিক প্রেক্ষিত থেকে আলাদা করে আলোচনা করলে তা পদ্ধতিগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকার বিদেশনীতির প্রেক্ষিতে কথা বলতে গিয়ে নিয়েলসন (Nielson) মন্তব্য করেন যে, বিদেশনীতি গঠনের পথটি যেহেতু অনেকাংশেই ব্যক্তির 'ব্যক্তিত্ব, চরিত এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল যাঁর হাতেই গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিণামগুলি ন্যস্ত থাকে', সেইহেতু 'বিদেশনীতির অভ্যন্তরীণ, দেশীয় নির্ধারকগুলিও' 'বাহ্যিক, বিদেশী চ্যালেঞ্জ অথবা উদ্ভূত সঙ্কটের—যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করে। সেই কারণেই, প্রশ্নাতীতভাবেই বৈদেশিক পরিবেশ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও দেশীয় পরিস্থিতির একটি অত্যন্ত জটিল সম্পর্ক...' (2000:4-50)। আমরা যেহেতু আমাদের প্রথম এককে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি-এর দৃষ্টিভঙ্গিটি নিয়ে আলোচনা করেছি, এবং পরবর্তী এককে বিদেশনীতির দেশী উপাদানগুলি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সেইহেতু এখানে আমরা এবিষয়ে খুব বেশি বাক্য ব্যয় করব না।

বাহ্যিক/আন্তর্জাতিক পরিবেশ/ বিদেশনীতির নির্ধারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সীমাহীন ও সার্বজনীন। যদিও

ভূগোল ও প্রাকৃতিক সম্পদের মত 'মৌলিক ক্ষমতা' নির্ধারকগুলি স্থিতিশীল, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিবেশ তুলনায় অস্থিতিশীল নির্ধারক। এর কারণ হল এই যে, একটি দেশের বিদেশনীতির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি রয়েছে যা আন্তর্জাতিক পরিবেশে কার্যকরী হয় এবং যা প্রায়শই ও ঘন ঘন বিভিন্ন অস্থির পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনীয়। এই পরিস্থিতির সবথেকে ভাল উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ইউরোপের ক্ষমতার ভারসাম্যের সময়কালের কূটনীতির ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দু'দশক জুড়ে। এখানে আমরা দেখি যেকোন দু'টি বা তিনটি বৃহৎ শক্তি সমানে তাদের মধ্যে আঁতাত করে এসেছে, কিন্তু, বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিবেশের গত বারো দশকের বিপুল পরিবর্তন এসেছে অনেক কারণে। এগুলি হল:

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে দ্বি-মেরু ব্যবস্থার উত্থান, বিবর্তন, সঙ্কট এবং বিলুপ্তি;
- পরিণতিতে, বৃহৎ শক্তির রাজনীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন;
- প্রচণ্ড উন্নত ও মারাত্মক গণ বিধ্বংসীঅস্ত্র আবিষ্কার, প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রেরও উন্নতি এবং আণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার, রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্রের বিকাশ এবং একই সঙ্গে অবিরাম অথচ সীমিতভাবে আণবিক অস্ত্রের প্রসার;
- আন্তর্জাতিক আইনের অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি এবং প্রসার ও একটি সার্বজনীন সংস্থা ও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে সম্মিতি জাতিপুঞ্জের ধীরগতির বিকাশ;
- প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি ও জাতি-রাষ্ট্রগুলির উপর তার প্রভাব;
- ধ্রুপদী সাম্রাজ্যবাদের পরিসমাপ্তি, নিয়মিতভাবে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল এবং নাতি দুর্বল রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটে।

বিদেশনীতির উপর বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবের বিষয়টি সংক্ষিপ্তাকারে ও আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে। কোন রাষ্ট্র সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গণ-অভ্যুত্থানের অথবা সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া দেখাবে না; দু'টি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা বরাবর বা দূরবর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বাধলে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে; কোন রাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক, শিল্প অথবা জলপথের জাতীয়করণ হলে বা অন্য কোন দেশের মধ্যে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে অথবা ডলার বা ইয়েনের আকস্মিক এবং সুতীব্র পরিবর্তন হলে কোন রাষ্ট্র কী কোন প্রতিক্রিয়া দেখাবে? এসব বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অবশ্যই সেই রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহ প্রতিক্রিয়া দেখাবে। তবে, একথা উল্লেখ করা দরকার যে, আপনা আপনিই আন্তর্জাতিক পরিবেশের প্রভাব বিদেশনীতিতে পড়ে না, নীতি নির্ধারকরা কীভাবে ঘটনাগুলিকে দেখছেন তার উপরই আন্তর্জাতিক প্রভাবের বিষয়টি নির্ভর করে। এদিক থেকে, বাস্তববাদী চিন্তাগোষ্ঠীর প্রবক্তারা যথার্থই বলেছেন যে, কোন দেশের বিদেশনীতির মৌলিক নির্ধারকটি হল সেই দেশের নীতি প্রণয়নকারী বাহ্যিক, আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা, বিশেষ করে, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের সম্পর্কিত ধারণাটি। এটি চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব বিষয়ে মার্কিন নেতৃত্বের ধারণা সম্পর্কে যতটা সত্য, ঠিক ততটাই সত্য ভারতের নীতিকারদের নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গদের ধারণা সম্পর্কেও। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের ফলে চীনের ব্যাপারে মার্কিন বিদেশনীতিতে সামুদ্রিক পরিবর্তন এসেছিল যেমন, ঠিক তেমনই বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতা-কাঠামোয় পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতের বিদেশ নীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটতে দেখা গিয়েছিল। পাকিস্তানে ভুট্টো সরকারে অন্তর্ঘাত এবং তদপরবর্তী সময়ে জেনালের জিয়া-উল-হকের সামরিক একনায়কত্ব, বাংলাদেশে মজিব-উর-রহমনের হত্যা, আফগাস্তিানের সোভিয়েত আক্রমণ, মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের সামরিক পুনঃসজ্জা ইত্যাদি কারণে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে ভারতের বিদেশনীতিতে নীতি প্রণেতারা বেশ কিছু বাঁক ও মোচড় এনেছিলেন। একইভাবে, আণবিক অস্ত্রে বলীয়ান চীনের থেকে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থেকে এবং প্রায় প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে আণবিক অস্ত্রের ও উপকরণের যোগান চীন দিয়ে আসছিল—এর ফলশ্রুতিতে বিজেপির নের্তৃত্বে এন ডি এ সরকার পোখরানে ১৯৯৮ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার পারমানবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।

অন্যদিক থেকেও বিদেশনীতি গঠনে বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লিটওয়াক (Litwak) আমেরিকার বিদেশনীতির প্রেক্ষিতে 'দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলির' প্রতি নির্দেশ করে বলেছেন যে, 'লক্ষ্য রাষ্ট্রের উপর আন্তর্জাতিক পরিবেশের গুরুত্বের নিরিখে বিচার করে বাহ্যিক এককগুলিকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে উক্ত রাষ্ট্রের উপর তাদের নীতিসমূহের প্রভাব বিচার করতে হবে। এই বিষয়টিই ১৯৯০-এর দশকে ইরানের প্রতি আটলান্টিক দেশগুলির নীতিগত বিরোধের কেন্দ্রে ছিল (অর্থাৎ ক্লিনটন প্রশাসনের সার্বিক প্রতিরোধের নীতি বনাম ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'শর্ত সাপেক্ষে আলাপ-আলোচনা'-র বা 'critical dialogue'-এর নীতি)। যে ইস্যুগুলি বিতর্কের কেন্দ্র ছিল তার একটি হল এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি কী একটা অভ্যন্তরীণ চাপ সৃষ্টি করেছিল যা কি না রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মহম্মদ খাতামিকে রাষ্ট্রপতি পদে বসিয়েছিল। কিংবা, ইরানকে শাস্তি দেবার ও তাকে একঘরে করে দেওয়ার মার্কিনী নীতিই কী একটি অস্বাভাবিক পরিণামের দিকে ঠেলে দিয়েছিল যেখানে 'ইরানী জাতীয়তাবাদীদের একটি ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য করেছিল।' লিটওয়াকের মতে, 'questions surronding this specific case underscore the general need for external actors to evaluated the influence of the internatoinal environment, and, in particular, the impact of their policies on the target state' (Litwak, 2000:95)।

বিদেশনীতিতে বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ে যেকোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমরা আন্তর্জাতিক এবং বিশ্ব প্রক্রিয়ার ভূমিকার কথা উল্লেখ না করি। হোয়েল মন্তব্য করেছেন 'একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনমতের প্রভাবের বাইরে উদীয়মান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার FPA-এর প্রয়োজন যাতে করে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াসমূহের প্রতি আরও অধিক মনোযোগ দেওয়া যায়; কারণ এই প্রক্রিয়াগুলিই সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে থাকে। যদিও সাম্প্রতিককালের আলোচনায় কেমনভাবে দেশীয় নীতি-পছন্দগুলিকে প্রভাবিত করে সেই ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোকপাত করে, তথাপি, ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত বিশ্ব জনমতের ভূমিকার উপর এবং দেশীয় এককগুলির উপর তার প্রভাবের উপর (রাষ্ট্র 'ক' কীভারে রাষ্ট্র 'খ'-এর জনতার প্রতিক্রিয়ার সাড়া দেয়); একই সাথে বিশ্বায়িত নাগরিকদের কার্যকলাপের উপরও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।' হোয়েল নীতিকারদের উপর বিশ্ব জনমতের প্রভাবের দুটি অভিমুখের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। একদিকে, রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের বিশ্বাস ছিল যে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর বিশ্বজনমত রাষ্ট্রগুলিকে আন্তর্জাতিক শর্তের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে অধিকতর শান্তিপূর্ণ বিদেশনীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তাঁর এই বিশ্বাস কল্পনাপ্রসূত বলে প্রমাণিত হয়েছিল কারণ, এই বিশ্বাসটি ছিল অপরিণত। এরপর, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ড্বাইট ডি আইজেনহাওয়ার (Dwight D. Eisenhower) প্রশাসন অন্ততপক্ষে দুটি ক্ষেত্রে তাদের পছন্দের বিদেশনীতির পরিবর্তনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। প্রথমত, একেবারে শুরুতেই আইজেনহাওয়ার এবং তাঁর রাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালাস বিশ্ব জনমতের বাধার প্রেক্ষিতে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়ে ইন্দোচিন ও তাইওয়ান প্রণালীর সময় পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ সম্পর্কিত আলোচনাটিতে অবদান রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৫৪ সালের ঠিক আগে তাইওয়ান প্রণালীর লাগোয়া দ্বীপপুঞ্জগুলির বিষয়ে মার্কিন বিদেশনীতির আলোচনার সময়

প্রকাশ্যে এই আশঙ্কা করেছিলেন যে, বিশ্ব জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে বড় কোন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়া উচিৎ হবে না।

হোয়েল আরো মনে করেন, বিশ্ব যত ভুবনায়িত হবে, ব্যক্তি, বস্তু ও ধারণার আদান প্রদান বা চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা ততই দূরীভূত হবে। তাঁর ভাষায়: 'members of the public are likely to become more aware of and concerned with the substance and processes involved in policymaking in foreign countries.' ডয়েলের (হোয়েলের?) মতে, বিশ্বায়নের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রগুলি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যেভাবে আন্তর্জাতিক পরিবেশকে বুজেছেন তাতে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। এই পরিস্থিতিতে, যেখানে বহুজাতিক কর্পোরশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে 'সমগ্র বিশ্বের সরকারগুলির এবং ব্যক্তিদের পছন্দের' উপর, সেখানে কাম্য উপযোগিতা লাভের জন্য সেই সমস্ত ব্যক্তিগণ যে তাদের আর্থিক এবং বিনিয়োগ সম্পর্কিত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত ভাবেই গ্রহণ করবে বিশ্বের উদ্দিষ্ট দেশগুলির আর্থিক ব্যবস্থা ও তাদের রাজনীতির দিকে তাকিয়েই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৯৭-৯৮ সালের সময়কাল থেকে বা বলা ভাল, ২০০৭-৮ সালের বিশ্বমন্দার সময় থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাষ্ট্র অর্থব্যবস্থাগুলি অনেকাংশেই বৃহৎ সংখ্যক ব্যক্তি—যারা অর্থনৈতিক আনুগত্যের অর্থে অভিবাসী বা রাষ্ট্রহীন—তাদের উপর নির্ভরশীল। সব দেশের বিদেশনীতিকারদের ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের মনোভঙ্গিকে মাথায় রেখে নীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ডয়েল দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রভিত্তিক এককগুলি ইতোমধ্যেই 'বিশ্বায়িত শক্তি সমূহ ও আন্তর্জাতিক স্তরের এককগুলির (বন্ডের বাজার, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, ভ্রমণকারী ও তা থেকে সংগৃহীত অর্থ, এবিষয়ে বৈশ্বিক নিয়মাবলী ইত্যাদি)' মাথায় রাখতে শুরু করেছে কারণ উল্লেখিত বিষয়গুলিতে পরিবর্তনের আন্দাজ করার এবং তার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতার উপরই সফল বিদেশনীতি প্রণয়নটি নির্ভর করে। ফলত, FPA 'আন্তরাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক, জনতা, স্বার্থ গোষ্ঠী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতিশীলতার উপর বেশি করে আলোকপাত করে পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রমের' প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানোর বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিস্থিতিতে সরকারী আনুষ্ঠানিক এককগুলির উপর অধিক দৃষ্টি দেবার সাথে সাথে 'একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রসারিত প্রক্রিয়াগুলির' মধ্যে কিভাবে উক্ত একক সমূহ ক্রিয়া করে বা নিজেদের ভিতর মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়াটি চালায় সে বিষয়ে আলোকদীপ্ত আলোচনা করতে প্রয়াসে রত থাকে।

ডয়েল আরও যে বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হল এই যে, একটি বৃহৎ সংখ্যার শিক্ষিত বিশ্ব-নাগরিক এই 'প্রেক্ষিতগত পরিবর্তন-কে তাদের নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করেন। বিশেষজ্ঞদের কাছে এই স্বীকৃতি মিলছে যে, ল্যান্ডমাইন থেকে শ্রমিকের কাজের মান, পরিবেশ নীতি থেকে মুক্ত বাণিজ্য এবম্বিধ এক বৃহৎ সংখ্যক ইস্যুতে বিশ্বের নাগরিকরা বিশ্ব জনমতের আলোকে নিজেদের বক্তব্যই শুধু জানাতে শুরু করে নি বা প্রতিক্রিয়া দেয় নি, বহু ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের জাতীয় নেতৃবন্দের নীতি বাছাই-এর কাজটিকেও কঠিন করে তুলছে। ICT-তে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ব্যক্তিবর্গকে তাদের নিজেদের বিদেশনীতি-সিদ্ধান্ত প্রয়োগে সমর্থ করে তুলেছে। বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন, যখন ২০০১ সালে মার্কিন-চীন সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা যায় একটি গুপ্তচর প্লেনকে কেন্দ্র করে; যেখানে চৈনিক নাগরিকরা মার্কিন ওয়েবসাইটে আন্তর্জাল আক্রমণ করে এবং বিপরীত দিকে মার্কিন নাগরিকরা অনুরূপ আক্রমণ চালায় চৈনিক ওয়েবসাইটগুলিতে। এভাবেই তারা তাদের প্রতিবাদ জানায়।

২.৩.৫ সামরিক সামর্থ্য

যদিও সামরিক সামর্থ্যকে একটি নির্ভরশীল চল (Dependent variagble) হিসেবেই দেখা হয়, তথাপি একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও উন্নয়নের ফল হিসেবে এটি একটি দেশের বিদেশনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বাস্তববাদী তাত্ত্বিকগণ টিকে থাকা ও নিরাপত্তাকে বিদেশনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে দেখেন এবং সেই সঙ্গে সামরিক সামর্থ্যকে এর নিশ্চিত রক্ষাকবজ মনে করেন। কোন দেশ বৃহৎ শক্তিধর না মধ্যস্তরীয় রাষ্ট্র, না একটি উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে তা সামরিক সামর্থ্যের বিবেচনার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে; যদিও বর্তমানে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিষয়টি ক্রমেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একজন শীর্ষস্থানীয় গবেষক এবং চীনের বিষয়ে মার্কিননীতির পরামর্শদাতা ডোয়াক বার্নেট মন্তব্য করেছেন: 'একদিকে যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানগুলি ভবিষ্যতে চীনের বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনের সক্ষমতাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করবে, অন্যদিকে তেমনি অন্যান্য বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলির সাপেক্ষে চীনের সামরিক সামর্থ্য বিদেশনীতি পছন্দের ব্যাপারে সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সংক্ষেপে, সামরিক সামর্থ্যের বাস্তবতাগুলি ভবিষ্যতে পিকিং-এর অবস্থান ও নীতির ক্ষেত্রে মৌলিক নির্ধারক হয়ে দাঁড়াবে, যা অতীতেও দেখা গেছে, এক বড় কৌশলগত অর্থে' (Doak Barnett, 2001:273)। সুতরাং, এটা অর্থহীন নয় যে বিশ্ব রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক অবস্থান নির্ণীত হয়, হয় বিশ্বে আগুনে শক্তির সূচক [Global Firepower Index] বা (GNF)-এর নিরিখে নতুবা, সামরিক সামর্থ্যের নিরিখে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা সূচক (pwindex), ভৌগোলিক উপাদান, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরতা, নৌশক্তির সামর্থ্য এবং দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি হিসেবের মধ্যে রাখা হলেও দেশটির পারমাণবিক সামর্থ্য, স্থলবদ্ধতা এবং বর্তমান রাজনৈতিক/ সামরিক নেতৃত্বের বিষয়গুলি ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় না। GFP-এর সূচক অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবস্থানটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিটি দেশের '২০১৫ সালে স্থল, সমুদ্র বা বায়ু-এই তিনটি বিভাগে প্রচলিত যুদ্ধে যাওয়ার সক্ষমতার উপর। উন্নত হিসেবের নিয়মে প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কম বেশি ৫০টি ভিন্ন ভিন্ন মাপকের উপাদান সংগ্রহ করে কিছু মূল্যমানকেও এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। যেমন, উচ্চ তৈল উপভোগকারী এবং নিম্ন তৈল উপভোগকারী দেশগুলিকে এর আওতায় আনা হয়েছে। এই হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বের প্রথম দশটি GNF-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Pwrlndx 0.1661), রাশিয়া (PwrIndx 9.1868), চীন (PwrIndx 9.0.2341), ভারত (PwrIndx 0.2695), যুক্তরাজ্য (PwrIndx 0.2743), ফ্রান্স (PwrIndx 0.3065), দক্ষিণ কোরিয়া (PwrIndx 0.3098), জার্মানি (PwrIndx 0.3505), জাপান (PwrIndx 0.3836), এবং তুর্কি (PwrIndx), (www.globalfirepower.com/countrieslisting.asp)। সামরিক দিক থেকে সবচাইতে শক্তিশালী দেশগুলির শক্তি মাপা হয়েছে লোকবল, সাজোয়া বাহিনী, যুদ্ধ জাহাজ, পারমাণবিক অস্ত্র বহনকারী যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ বাহকের সংখ্যা সাবমেরিনের সংখ্যা এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ের পরিমাণের নিরিখে। এখানেও বিশ্বের প্রথম দেশগুলি হল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারত, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, তুর্কী, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান (www.businessinsider.com/35-most-powerful-militaries-in-the-world-2015)। আমরা যদি উপর্যুক্ত দুটি তালিকার সাথে পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারের নিরিখে আরও প্রথম দশটি দেশের নাম যুক্ত করি, তাহলে তার মধ্যে পড়বে রাশিয়া (৮০০০), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৭৩০০), ফ্রান্স (৩০০), চীন (২৫০), যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান (১০০-১২০), ভারত (৯০-১১০), ইজরায়েল (৮০), উত্তর কোরিয়া (৬-৮)

(www.mapsofworld.com> World Top Ten)। অতঃপর আমরা নিম্নোক্ত অনুসিদ্ধান্তগুলিতে পৌঁছতে পারি।

- প্রথম তালিকায়, অনেক GFP দুটি বৃহৎ শক্তির তুলনায় বেশি; এর অর্থ হল, দুই বৃহৎ শক্তিই পারমাণবিক শক্তির উপর অধিক নির্ভর করে তাদের প্রতিরক্ষা বা deterrence এর জন্য।
- GHP-এর তুলনায় সর্বোচ্চ শক্তিশালী সেনাবাহিনী কোন দেশের শক্তি পরিমাপের উৎকৃষ্টতর সূচক; কারণ এর মধ্যে পারমাণবিক ক্ষমতাটিও অন্তর্গত।
- এমনকি ছোট দেশগুলিও নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়তে ও রক্ষা করতে পারে।
- ইজরায়েল ও উত্তর কোরিয়ার মত নিরাপত্তার আশঙ্কায় ভুগতে থাকা দেশগুলি পারমাণবিক অস্ত্রের উপর তাদের নির্ভরতা দেখায় তাদের নিরাপত্তা এবং deterrence-এর উদ্দেশ্যে, যার ফলে তাদের সঙ্গে মহাশক্তিধর দেশগুলির সাদৃশ্য চোখে পড়ে।
- কিন্তু ইজরায়েল এবং উত্তর কোরিয়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থান ভিত্তিক স্তর কম বেশি খাপ খায়।

মোদ্দা কথাটি হল এই যে, সামরিক শক্তিকে বিদেশনীতি পছন্দের একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়।

২.৩.৬ জাতীয় বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০০০) পর ভারতের বিদেশনীতির গঠনের উপর প্রত্যেকটি পাঠ্য পুস্তকেই বিদেশনীতির নির্ধারক হিসেবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে পৃথক একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে,যদিও ধারণাটিকে ঘিরে অনেক সমস্যা আছে। বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে কমপক্ষে তিনটি প্রশ্ন রয়েছে যে পূর্বানুমানকে কেন্দ্র করে। এগুলি হল:

- যেকোন দেশের ব্যক্তি নাগরিকদের একটি সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, অস্মিতবোধ অথবা একধরনের মূল্যবোধের প্রণালী থাকে যা তাদেরকে অন্যান্য দেশের নাগরিকদের থেকে পৃথক করে।
- দীর্ঘ দিন ধরে একটি দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য তেমন বড় ধরণের কোন পরিবর্তন ছাড়াই টিকে থাকে।
- ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সাথে জাতীয় লক্ষ্যগুলির একটি স্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে (Organski, 1968:87)।

কার্যত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, 'জাতীয় বৈশিষ্ট্যে'র ধারণাটি একটি ফ্যাশনদুরস্ত ধারণায় পর্যবসিত হয়; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এর ব্যক্তিকরণের ঝোঁক ও তাৎপর্যের জন্য ধারণাটি বাতিল বলে গণ্য হয়। ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কাল জুড়ে বাস্তববাদের সঙ্গে বিশুদ্ধবাদী কট্টর সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এধরণের নৃতাত্ত্বিক, প্রতীতিবাদী (Impressionist) এবং অস্পষ্ট ধারণার কোন স্থানই ছিল না। বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ক্রিস্টোফার হিল প্রদত্ত ১৯৮৯ সালের বিখ্যাত কনওয়ে বক্তৃতাটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়: '[t] resort to national character as an explanation means that you have no explanation: national character changes with history' (Hill in Dumbrell, 1998:29). কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এই ধারণাটিকে এ হেন সীমাবদ্ধতার গহ্বর থেকে উদ্ধার করা হয়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এই ধারণাটির বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি প্রধানত পদ্ধতিগত বা methodological, এর ত্রুটি হল এই যে, এই ধারণাটির অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কিন্তু এই খামতিটুকু সংশোধনযোগ্য, যেহেতু 'জাতীয় চরিত্রকে সংজ্ঞাত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

আলোচনাও করা যায় সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার সাপেক্ষে এবং তার সাহায্যে ধারণাটির বিপক্ষের পদ্ধতিগত আপত্তিগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব। তারপর বিশ্লেষকরা দেখান 'কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের, কূটনীতিকদের, আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলের এবং চুক্তি-সম্পাদক আলোচক দলের ধারণা, প্রতিক্রিয়া, আচরণের ধরণ-ধারণ বিদেশনীতি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে বা করে থাকে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অতঃপর কতকগুলি নির্বাচিত দেশর জাতীয় চরিত্রের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। আমেরিকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য হল 'সম্পদ ও ক্ষমতার আরাধনা', 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা'কে এবং কতিপয় সুযোগ্য গবেষক অভিযোগ করেন যে, আমেরিকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল 'শ্বেতকায় আমেরিকানদের জাত্যাভিমান'। পরিণামে, বন্দোপাধ্যায়ের মতে, আমেরিকার নেতৃবৃন্দ ও জনগণ সেই ধরনের বৈশ্বিক বিদেশনীতি-কৌশলকে সমর্থন করবে না যা ক্রমোচ্চস্তর বিন্যস্ত নয় এমন রাষ্ট্র-সাম্যাবস্থাকে স্বীকার করে। একই সাথে 'অন্যত্র যৌথবাদী বা আধা-যৌথবাদী বিকাশের ধাঁচ-'কে এবং পৃথিবীর কোন প্রান্তেই 'প্রকৃত জাতি-বৈষম্যবাদ বিরোধী বিদেশনীতি'-কে তারা সমর্থন করে না (১২০-২১)। ডাম্ব্রেল অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা যুক্ত করেছেন। এগুলি হল, 'মানবিক চরিত্র ও বৃত্তিনিপুণতা সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যার সমাধান যোগ্যতা সম্বন্ধে একধরণের অভিজ্ঞতা প্রসূত বিশ্বাস', 'পাপ বা evil থেকে মুক্তির ধারণা', 'প্রযুক্তির বিশ্বাস', 'পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতি আমেরিকার জনগণের নীতিগত অঙ্গীকার', এবং চূড়ান্ত ভাবে একটি 'জাতীয় লক্ষ্যের' ধারণা। এই জাতীয় লক্ষ্যের ধারণাটির উৎসটি রয়েছে পিউরিটান উত্তরাধিকারের মধ্যে; যেখানে 'পর্বতে নগর' নির্মাণ-এর কথা বলা হয় এবং তাকে ছড়িয়ে দিয়ে ফিলিপাইন ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে প্রসারিত করে দেবার কথা ভাবা হয়। ডাম্ব্রেল কৌশলের সঙ্গে এই 'জটিল যৌগ' বা complexটির উল্লেখ করেছেন যেখানে 'জাতি-বৈষম্যবাদের উপাদানের সঙ্গে উপনিবেশবাদ বিরোধী অঙ্গীকারে'-র মিশ্রণ ঘটেছে (Dumbrel, 1998:29-30)। আমেরিকার জাতীয় চরিত্রের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য, যাকে American Exceptionalism' হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে আমেরিকার বিদেশনীতিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে প্রভাবিত করে এসেছে. মর্গেণথাউও 'ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও উদ্ভাবন'কে আমৌরকার জাতীয় চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশদের বৈশিষ্ট্য হল 'গোঁড়ামীশূন্য সাধারণ জ্ঞান' এবং জার্মানরা সেখানে 'শৃঙ্খলা এবং তন্নিশঠতা thoroughness-কে গুরুত্ব দেয় (Morgenthau, 1948/1966:131)।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আবার 'প্রাথমিক নিষ্ঠা, সরকারি কর্তৃপক্ষের আরাধনা, এবং দেশীদের সম্পর্কে ভীতি' 'রাশিয়ার জাতীয় চরিত্রের আপেক্ষিকভাবে অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য'। এটা স্পষ্ট নয় যে, তিনি স্বীকৃতি ছাড়া মর্গেনিথাউকে স্মরণ করেছেন বা তাঁকে উদ্ধৃত করেছেন কি না। কারণ, রাশিয়ানদের 'কতকগুলি বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর আকর্ষণীয় প্রমাণ স্বরূপ' যাদের উল্লেখ করেছেন মর্গেন্থআউও দুটি পর্যায়ে সরকারি কতৃত্বের আরাধনার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম ক্ষেত্রে, ১৮৫৯ সালে বিসমার্ক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হল সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সময়ে একজন প্রহরীকে রাজার বাগানে পাহারা দিতে দেখা গিয়েছিল যে কিনা জানতই না কেন সে পাহারা দিচ্ছে। যখন সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে কি পাহারা দিচ্ছে, তখন প্রহরী কেবল উত্তর করিলেন যে, 'Those are my orders'। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর কৌতূহলী সম্রাট জানতে পেরেছিলেন যে, সে প্রহরীদের সুদীর্ঘ লাইনের শেষ ব্যক্তি যারা আদপে কোন কিছুই পাহারা দিচ্ছে না। 'ফুল ফোটার সময় একটু শীঘ্রই বরফ পড়তে' দেখে জারিনা কাথারিন (যিনি ১৭৬২ থেকে ১৭৯৬ সাল অবধি রাজত্ব করেছিলেন) ফুল যাতে কেউ তুলে না নিতে পারে, সেইজন্য ঐ স্থানে একজন প্রহরীকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সেই

থেকে ৬৩ বছরের বেশি সময় ধরে ক্রমান্বয়ে ২৪ × ৭ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে বিসমার্কের কৌতূকপ্রদ মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য: 'they are an expression of the elementary force and persistence on which the strength of the Russian nature depends in its attitude to the rest of Europe. It reminds us of the sentinels in the flood at St. Petersburg in 1825, and in the Shipka Pass in 1877; not being relived, the former were drowned, the latter frozen to death.'

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'টাইম' পত্রিকায় যেভাবে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল সেটি এরকম: একজন রাশিয়ান সৈনিক 'Potsdam's slushy Berlinerstrasse'-তে বারজন যুদ্ধবন্দীর দিকে মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসার সময় একজন জার্মান স্ত্রীলোককে ওদের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেল এবং তাকে অনুমতি দিল তার কাছে এগিয়ে আসতে, তাকে আলিঙ্গন করতে; এমনকি তাদেরকে পাশে ঠেলে দিল পালানোর জন্য সর্বদা তার টমি বন্দুকটি তাদের দিকে তাক করে রেখে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে ঐ স্ত্রীলোকটি ও তার সন্তানটি প্রলাপ বকছে, অন্যেরা বিহ্বল, এবং এগারো জন বন্দী ভাবলেশহীন মুখে টলমল ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে, তখন সেই রাশিয়ান সৈনিকটিকে সামান্য কয়েক মুহূর্ত ভাবতে দেখা গেল। তারপর সে পাশে হেঁটে চলা জার্মান যুবকটিকে ঐ দলটির মধ্যে ঠেলে ফেলে দিল পথচারীদের অবাক করে দিয়ে এবং খুব নিরুদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে তার পাইপটি ধরাল। মর্গেণ থাউ তাঁর উপলব্ধির সঙ্গে বলেন, যে, 'Between these two episodes a great revolution intervened, interrupting the historic continuity on practically all levels of national life. Yet the traits of the Russian national character emerged intact from the holocaust of the[communist]. Even so, through a change in the social and economic structure, in political leadereship and institutions, in the ways of life and thought has not been able to affect the "elementary force and persistence" of the Russian character which Bismarck found reveled in his experience' (ibid. 128-30)।

ভারতের জাতীয় চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি নির্দেশ করেছেন।

- 'অ-মেরুকৃত অ-দ্বান্দ্বিক চিন্তার' প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায় ভারতের গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণের 'সাংস্কৃতিক ও বিশ্বাস-ব্যবস্থার' মধ্যে।
- তাদের মনের ভিতর 'একটা নিরাকার আপেক্ষিক সত্য এবং বাস্তবতার প্রভাব দেখা যায় যা শেষাবধি একটি চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছায়; যার বিস্তার আবার 'সৃষ্টিকর্তার, বিশ্বজগতের, ঈশ্বর এবং মানুষের অধিবিদ্যক অদ্বৈত (non-duality) থেকে শুরু করে শুভাশুভ'র অদ্বৈতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং এমনকি রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির বাস্তব জগতের অদ্বৈত পর্যন্ত'।
- এই সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ভারতের জটিল জাত-ব্যবস্থার মধ্যে।

ফলস্বরূপ, হিন্দু, অ-হিন্দু, নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদীরা কেউ সম্পূর্ণভাবে, কেউবা আবার আংশিকভাবে অথবা ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিশ্বাসের অনুগামীরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এমনকি একজন নিরীশ্বরবাদী হিসেবে, বরং বলা ভালো যে একজন প্রান্তিক হিন্দু হিসেবে জহরলাল নেহেরুও এই বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর নির্জোট নীতি কৌশল রূপায়নের বা গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রভাবটি লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য দিয়েই এই আলোচনার ইতি টানা যায়। তাঁর মন্তব্যটি হল: 'For the non-recognition of the non-duality of phenomena, coming down through India's trackless centuries to constitute

an essential attribute of the Indian national character, would be inconsistent with the acceptance of bipolarity as a global reality' (Bandyapadhyay, 121-23)।

২.৪ প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. একটি দেশের বিদেশনীতি নির্মাণে ভূগোল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. বিদেশনীতিতে ভূগোলের ভূমিকার অর্থাৎ ভূরাজনীতির প্রকাশ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।
৩. বিদেশনীতি রচনায় অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হয়?
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান যে সব উপাদান বিদেশনীতি নির্মাণে সক্রিয় থাকে সেগুলি উল্লেখ করুন?
৫. কোনো দেশের অতীত ইতিহাস তার বর্তমান বিদেশনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
৬. কোনো দেশের রাজনৈতিক ঐতিহ্য তার বিদেশনীতি নির্মাণে যে ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায় সে-বিষয়ে মন্তব্য করুন।
৭. আন্তর্জাতিক পরিবেশ কোনো দেশের রাজনৈতিক কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করে?
৮. কিভাবে জাতীয় চরিত্রের দ্বারা দেশের বিদেশনীতি প্রভাবিত হতে পারে।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. বিদেশনীতির পর্যালোচনায় ভূগোলের গুরুত্ব বিষয়ে ম্যাকিন্ডারের বক্তব্য উল্লেখ করুন।
২. বিদেশনীতি নির্ধারণে ভূ-রাজনীতি প্রসঙ্গে স্পাইকম্যানের প্রধান বক্তব্যগুলি নির্দিষ্ট করুন।
৩. নতুন ধারার ভূ-রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।
৪. অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান উপাদানগুলি নির্ধারণ করুন।
৫. আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিবেশের প্রধান উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করুন?
৬. 'জাতীয় চরিত্র' এই শব্দবন্ধ নিয়ে বিতর্কের কারণ কি? এই বিতর্ক নিরসন হয়েছে কিভাবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. হোলস্টি বিদেশনীতি নির্ধারণে ভূগোলকে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেছেন?
২. প্রাথমিক পর্যায়ে ভূ-রাজনীতির উপরে আলোচনার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।
৩. 'মাহান'-এর বর্ণিত ভূ-রাজনীতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা সংযোজন করুন।
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগোষ্ঠী বিষয়ে একটি টীকা লিখুন?
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে প্রযুক্তি গুরুত্ব কতোখানি?
৬. বিদেশনীতি অনুধাবন ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা কী?

২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

1. Bandyopadhyay, J., *The Making of India's Foreign Policy* (New Delhi: Allied Publishers Limited, 1979/2000).
2. Jayapalan, N., *Foreign Policy of India* (New Delhi: Atlantic Publishers, 2001).
3. Rana, A. P., The Imperative of Won- *Alignment:* A Conceptual Study of India's Foreign Policy Strategy in the Nehru Period (New Delhi: Macmillan, 1976).
4. Sempa, Francis, P., 'Introduction to the Transaction Edition: The Geopolitical Realism of Nicholas Spykman', in Spykman, *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power,* originally published by Harcourt, Brace and Company in 1942 (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2008).
5. Dougherty James E., and Pfalzgraff Jr. Robert L, *Contending Theories of International Relations* (New York: Harper & Row, Publishers, 1990).
6. Tuathail, Gearoid 6, 'Introduction: Thinking Critically about Geopolitics', in Simon Dalby, Paul Routledge, Gearoid 6 Tuathail (eds.), *The Geopolitics Reader* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2003).

একক ৩ ☐ বিদেশনীতির দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ—জনমত, আইনসভা রাজনৈতিক দলসমূহ, স্বার্থগোষ্ঠী সমূহ এবং আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

গঠন

৩.১ লক্ষ্য সমূহ

৩.২ ভূমিকা

৩.৩ জনমতের ভূমিকা

৩.৪ বিদেশনীতিতে কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলির ভূমিকা

৩.৫ বিদেশনীতিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৩.৬ বিদেশনীতিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

৩.৭ বিদেশনীতিতে স্বার্থ গোষ্ঠীসমূহের ভূমিকা

৩.৮ সারসংক্ষেপ

৩.৯ প্রশ্নাবলী

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১১ অন্যান্য গ্রন্থ উৎসসমূহ

৩.১ লক্ষ্য সমূহ

আমরা প্রথম এককের তাত্ত্বিক আলোচনায় যাকে innenpolitik বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করেছি এবং প্রসঙ্গক্রমে দ্বিতীয় এককে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উল্লেখ করেছি সেগুলিই এখানে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আশা করব যে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ সমাপ্ত করবার পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে সক্ষম হবেন।

- এটা সর্বজনবিদিত সত্য (truism) যে, জনমত বিদেশনীতির অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে গণতন্ত্রের পক্ষেও অত্যন্ত জরুরী।
- কেন এবং কিভাবে বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও গণতন্ত্রগুলিতে সময় সময় অকার্যকর হয়ে পড়ে গণমাধ্যমগুলির নিয়ন্ত্রণের কারণে।
- কেমনভাবেই বা একটি গণতন্ত্রে জনমতকে শৃঙ্খল মুক্ত করে বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্যের উপর এক ধরনের নজরদারী করা যায় যা আদতে অনাকাঙ্ক্ষিত।
- একটি দেশের বিদেশনীতির সর্বার্থে কাঙ্ক্ষিত অভিমুখ নির্ধারণে রাজনৈতিক দলগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা বিবেচনা করা হয়েছে এই এককে।
- কোন কোন পথে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি এবং চাপ সৃষ্টিকারীগোষ্ঠীগুলি একটি দেশের বিদেশনীতির অভিমুখ নির্ধারণ করে।

একটি দেশের বিদেশনীতির গঠন, অভিমুখ নির্ধারণ ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

৩.২ ভূমিকা

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, পূর্বের এককে আমরা বিদেশনীতির নির্ধারক হিসেবে দেশীয় পরিবেশকে আলোচনা করিনি, কারণ এই এককে এই বিষয়টি আলোচনার জন্য তা স্থগিত রেখেছিলাম। কিন্তু, innenpolitik-এর বিষয়টি বিদেশনীতি বোঝার ধারণাগত কাঠামোগুলির তাত্ত্বিক আলোচনার অধ্যায়ে প্রসঙ্গত উল্লেখের পর এটা অনুমান করাই যেতে পারে যে, আমরা এই অধ্যায়ে বিদেশনীতিতে অভ্যন্তরীণ উৎসগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করব এটি আরো যথার্থ এই কারণে যে, আমরা এই মডিউলের একেবারে শুরুতে ইঙ্গিত করেছিলাম যে, ১৯৭৫ সালে সেজ প্রকাশনা থেকে আট খণ্ডে প্রকাশিত *Handbook of Political Science*-এ নীতিসমূহ ও নীতি-গঠনের উপর প্রথম বিদেশনীতি-বিশ্লেষণের একটি ব্যাপক তাত্ত্বিক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। এর ইঙ্গিতটি স্পষ্ট। বিদেশনীতি কেবলমাত্র অনেক সরকারি নীতির অন্যতম এবং সেই কারণেই দেশীয় ও বৈদেশিক নীতির বিষয়টি অবিচ্ছেদ্যভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন যে, জনমতের বিষয়টি আদৌ স্বাধীন পছন্দের বিষয় নয়; বরং জনমতের মধ্যে বিভিন্ন দেশীয় উপাদানের অনপনেয় ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। নিয়েলসনকে অনুসরণ করে আমরা পূর্বের অধ্যায় নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি, যেহেতু বিদেশনীতির গতিপথটি অনেকাংশেই নীতি নির্ধারকদের 'ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের এবং সিদ্ধান্তের পরিণামের উপর নির্ভর করে', সেইহেতু, এই আলোচনাটি কখনই এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে 'বিদেশনীতির অভ্যন্তরীণ ও দেশী নির্ধারকগুলিও বাহ্যিক, বৈদেশিক চ্যালেঞ্জ বা সঙ্কট থেকে উদ্ভূত সিদ্ধান্তগুলির সমান গুরুত্বপূর্ণ।' এমনকি রবার্ট পাটনামের মনেও এই সব দেশীয় উপাদানগুলির গুরুত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ বা সংশয় নেই। সেই কারণে তিনি বলেন, 'It is frutless to debate whether domestic politics really determines international relations, or the reverse. The answer to that questions is clealry "both, sometimes". The more interesting questions are "when?" and "How" (Putnam, 1988:427)'. এই এককে আমরা এই অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করব। উদাহরণস্বরূপ, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মান্য গবেষকরা মনে করেন উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে একত্রে 'Political Institutions'-এর আওতাভুক্ত করে আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে জনমতের আলোচনা দিয়ে শুরু করব।

৩.৩ জনমতের ভূমিকা

জনমতের আলোচনা শুরু করার আগে, একথা বেশ বুঝতে পারছি যে, তোমাদের/আপনাদের মনে একটা যৌক্তিক প্রশ্নের উদয় হচ্ছে এই ভেবে যে, পূর্বের অধ্যায়ের শেষাংশে আন্তর্জাতিক অথবা বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে জনমতের কথা বলা হয়েছে যখন তখন কি আবার ঐ বিষয়টির আলোচনা পুনরাবৃত্তির সামিল হবে না! কিন্তু আমাদের বলার কথা এই যে, না তা হবে না; কারণ আমরা এখানে কেবল অভ্যন্তরীণ বা দেশীয় জনমতের বিষয়ে আলোচনা করব।

জনমতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা আছে বা থাকা উচিত—এহেন বিশ্বাস আন্তর্জাতিক সম্পর্কে উদারবাদী-বাস্তববাদী বিতর্কের সবকিছুই এর অঙ্গীভূত করে তোলে। বিদেশনীতি সহ সমস্ত সরকারী নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে জনমতের ভূমিকার যে আদর্শ তাত্ত্বিক অনুমোদন রয়েছে তা প্রকৃত অর্থে উদারনৈতিক ঐতিহ্যের অংশ যা এর সমর্থন যোগাড় করে গণসার্বভৌমিকতার মতবাদটি থেকে; এই গণসার্বভৌমিকতার ধারণাটি আবার ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য বাধা হিসেবে কাজ করে। জেরেমি বেন্থামের সময় থেকেই এই মতবাদটি চলে আসছে, যিনি জনমতকে বা বরং বলা যায় 'জনমতের ট্রাইবুন্যাল'কে, নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রেখেছিলেন এবং একে সরকারের যাবতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে সর্বরোগহর হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁর 'সার্বজনীন ও চিরস্থায়ী শান্তির পরিকল্পনার' ক্ষেত্রে তিনি বহির্দেশীয় বিষয়গুলির পচিালনার ব্যাপারে যে কোন ধরনের গোপনীয়তার অবসানের উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়: 'That secrecy in the operation of the foreign department ought not to be endured in England, being equally repugnant to that interests of liberty and those of peace'. জনমতের ভূমিকা বিষয়ে জেমস মিলের বক্তব্য হ'ল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেহেতু যুক্তির দ্বারা পরিচালিত, সেইহেতু তারা 'সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং তার প্রাধান্য দ্বারাই নির্দেশিত' হয়ে থাকে। সুতরাং যখন 'সমান যত্ন ও সমান দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন উপসংহার টানা হয়ে থাকে, (তখন) একধরনের নৈতিক নিশ্চয়তা দেখতে পাওয়া যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ সঠিক বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং সর্বাধিক পরিমাণ সাক্ষ্য-প্রমাণ সর্বাধিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে' (Holsti, 2004:3-4)। এই বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা নির্ভর যাচাই করেছিলেন রুশো যখন তিনি দাবী করেন Letters from the Mountains গ্রন্থে এবং বলেন: 'Injustice and fraud find protectors often; but never is the public one of them. It is here that the voice of the people is the voice of God (Millier, 1984:108)'। একইভাবে কান্টের লজিকটি সেইসব প্রতিবন্ধকতাগুলিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল সেখানে প্রজাতান্ত্রিক এবং অ-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গুলি ঐ প্রতিবন্ধকতার কথা মাথায় রেখে ঠিক কখন যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিৎ তা ঠিক করত। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত যে, যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে সরকার খানিকটা অনিচ্ছুক থাকে কারণ যুদ্ধের খরচের অধিকাংশটই জনগণকে বহন করতে হয়। সেইজন্যই সরকার যুদ্ধ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সাবধানী হয়। কিন্তু অ-প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিস্থিতির ব্যাপক ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় যেখানে 'বিশ্বের সবচাইতে সহজতম বিষয়টি হল যুদ্ধ ঘোষণা করা।' কারণটি হল এই যে, 'রাজা এখানে সহ নাগরিক নন, তিনি জাতির মালিক, এবং যুদ্ধ তাঁর কোন কিছুকেই প্রভাবিত করে না; না তাঁর মৃগয়া বিলাসকে,প্রমোদকে না তাঁর উৎসবাদিকে'।

জনমতের এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি উনিশ শতক পর্যন্ত উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন দ্বারা বাহিত হয়েছিল এবং এর পরেও বিংশ শতকে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রী আরনেস্ট বেভিন কর্তৃক এই ভাবনাটি বহমান দেখতে পাওয়া যায়, যিনি কান্টিয় ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'সাধারণ মানুষের' মধ্যে 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে মহোত্তম সুরক্ষা' দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই উদারনৈতিক অবস্থানটি বাস্তববাদীদের যুক্তিপূর্ণ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল এই কারণে যে, বাস্তববাদীরা ব্যক্তি-একক হিসেবে বা ব্যক্তিকে যূথবদ্ধ গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ব্যক্তির প্রকৃতি বিষয়ে একধরনের নিরাশাবাদী মত পোষণ করতেন; একই সাথে নৈরাজ্যমূলক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক সজ্জা যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে বৃদ্ধি করতে পারে সে ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। বাস্তববাদীদের মতে, রাষ্ট্রনায়করা অপরাপর দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকে কেবল একটি উপায় রূপে গণ্য করে থাকেন। অন্যদিকে, জনগণ এই সম্পর্কগুলিকে লক্ষ্য হিসেবেই বিবেচনা করে এবং নৃশংস একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে অপছন্দ জ্ঞাপন করে। তাই, জনমত সুচিন্তিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদেশনীতি নির্মাণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনকদের এবং Federalist Papers-এর লেখকদের মধ্যেও এই জনমতের প্রজ্ঞার ব্যাপারে অবিশ্বাস ছিল আধুনিক বাস্তববাদ গড়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই। টকভিল, যিনি আমেরিকার সরকারী দার্শনিক হিসেবে সুবিখ্যত, বিদেশনীতির উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের উপর সীলমোহরটি দেন। 'বিদেশনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে আমেরিকার গণতন্ত্র কী পরিমাণ বিচক্ষণতার পরিচয় দেবে এটা বলা অত্যন্ত কঠিন' স্বীকার করার পরেও মন্তব্য করেন যে, 'As for myself, I do not hesitate to say that it is especially in the conduct of their foreign relations that democracies appear to be decidedly inferior to other governments' (all Holsti, 2004:5-7)।

> এই টানাপোড়েনের কারণেই লাতিন বাগধারা—'vox populi vox die'-এ আজকের দিনে একটি মিশ্র ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রাঙ্কিয় সম্রাট শারলেমনের কাছে তাঁর পরামর্শদাতা আলকুনিন লিখিত একটি পত্রে এই বিষয়টির প্রথম উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। আক্ষরিক অর্থে, এর মানে হল জনগণের কণ্ঠ বা রব হল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সাধারণ মানুষের মতামত ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই প্রকাশ করে এবং সেই জন্যই আনুগত্য বা বাধ্যতা দাবী করে। অবশ্য, এই বাক্যবন্ধটি আগে যে পবিত্রতার সঙ্গে উচ্চারিত হত এখন তা আর হয় না। পরোক্ষ উল্লেখের এক অভিধানে বলা হয়েছে যে, 'এটি প্রায়শই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় এই কারণে যে জনকণ্ঠ সুবিবেচনা এবং মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত নাও হতে পারে এবং সর্বনিম্ন সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হলেও অপ্রতিরোধ্য শক্তিরূপে বিবেচিত হতে পারে (Mrriam-Webster, 1999:560)। অবশ্য, জনমতের ধারণাটি একটি অপরিচ্ছন্ন ও পিচ্ছিল প্রায়শই সামগ্রিকভাবে জনগণের রাজনৈতিক ভূমিকা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়', তথাপি এটি একটি 'যথাযথ সংজ্ঞাত ধারণা নয়। আমরা এই তিনটি প্রশ্ন প্রায় তুলিই না যে, কেন আমরা জনমতকে চিহ্নিত করে থাকি, এবং আমরা যখন জনমতের কথা বলি তখন আমরা কোন জনমতের কথা বলি—জাতীয় জনমত না স্থানীয় জনমতের?'

তাহলে কেন দেশীয় জনমতকে বিদেশনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে দেখা হয়? সবচাইতে স্পষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ উত্তরটি দিয়েছেন ফ্র্যাঙ্কেল। তিনি বলেন যে, বিদেশনীতি প্রণয়নকারীরা 'বৈদেশিক পরিবেশের তুলনায় দেশীয় পরিবেশের সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত থাকেন।' এই সম্পর্কের কারণটি হল এই যে, নীতিপ্রণেতাগণ মূল্যবোধের আত্তীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতিতে সামাজিকীকরণ এবং দেশীয় ক্ষেত্রে প্রভাব এবং চাপের থেকে নিয়ত মিথষ্ক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকেন। এর ফলে, 'সামগ্রিকভাবে জনগণের চূড়ান্ত গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে একটি গণতান্ত্রিক আদর্শ অথবা 'সাধারণ ইচ্ছার' তত্ত্ব গঠন করাটা অপ্রয়োজনীয়'। এমনকি সামগ্রিকতাবাদী ব্যবস্থাগুলিতেও জনগণের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা হয় না। কিন্তু, বিদেশনীতি গঠনে জনগণের ভূমিকাটি দু'ভাবে গ্রহণ করতে দেখা যায়। প্রথমত, 'হয় একটি অসংগঠিত সমগ্র হিসেবে, নয়তো নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে, তাদের মধ্যবর্তিতায় বা শ্রেণীগত মাধ্যমে।' তাই, বিদেশনীতির দেশীয় উৎসগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করার সময়ে প্রত্যেক দেশ জনমতের কাঠামোর—যা দেশ থেকে দেশে ভিন্ন ভিন্ন হয়—গভীর আলোচনা প্রয়োজন।

ফ্র্যাঙ্কেলের কাছে unmediated জনমত গুরত্বপূর্ণ কারণ, যেখানে বিদেশনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংগঠিত গোষ্ঠীসমূহের অথবা নেতৃত্বের একটি সদর্থক প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, 'সমগ্র হিসেবে জনগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে জনমতের আবহের মধ্য দিয়ে; যাকে গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড 'the mood' বলেছেন এবং যা সেইসব সীমারেখাগুলিকে নির্দেশ করে যার ভিতর জনমত এটা রূপ পায়'। এই ভাবগতিক (mood) প্রায়শ বাধার সীমা চিহ্নিত করে দেয় বা বাস্তব পছন্দগুলিকে বাতিল করে। এর ফলে, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের সামনে বিকল্প বলে কিছু থাকে না কেবল কতকগুলি নিষেধ ছাড়া। এখানে আমরা 'অস্পষ্ট অথচ খুব বাস্তব প্রকৃতির ক্ষমতা'-র কার্যকারিতা লক্ষ্য করি, যার মধ্যে আবার 'স্পষ্টভাবে সংজ্ঞাত দায়িত্বের' অভাব দেখতে পাওয়া যায়। ফ্র্যাঙ্কেল উল্লেখ করেছেন যে, যখন রাষ্ট্রনায়করা 'অনিয়ন্ত্রণযোগ্য জনরুচির সম্মুখীন' হন আন্তর্জাতিক সংঘাতের মোকাবিলা করার সময়, তখন তাঁরা দেখেন সমস্যার সমাধানের প্রয়াসগুলি বা সমাধানের আশাগুলির হতাশাজনক পরিণাম হচ্ছে। ১৯১৫ সাল থেকে দণি তাইরোলকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়া ও ইতালির বিরোধের সময় এটি ঘটতে দেখা গেছে। অনরূপ বাধা উঠে আসতে পারে ঐ একই সরকারের ক্ষেত্রে যদি দুটি সমান শক্তিশালী জনতা কোন বিষয়কে সমর্থন অথাব বিরোধিতা করতে থাকে। রাজনৈতিক কর্মী এবং কেনিয়া আফ্রিকা ন্যাশনাল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জামো কেনিয়াত্তার মুক্তি এবং মাউ মাউ বিদ্রোহে ১৯৬১ সালের আগস্ট মাসে তাঁর ভূমিকার জন্য গ্রেপ্তারীর সময় সরকারে দোদুলম্যানতার পরিচয় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। একদিকে কেনীয় আফ্রিকানরা তাঁর মুক্তিকে সমর্থন করেছিল; অন্যদিকে, শ্বেতকায় বাসিন্দারা ও অন্যান্য রক্ষণশীলরা এর চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছিল এবং সরকার এর ফলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফ্রাঙ্কেল আরো উল্লেখ করেছেন যে, জনগণ যখন কোন ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন কোন পক্ষের সামর্থ্য কিরকম তা আন্দাজ করা সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে ১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে সাধারণ বাজারে (Common Market) ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিতর্কের কথা বলা যায়। আমাদের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অসহায়তার বিষটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কাশ্মীর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, এবং চীনের ইস্যুতে বিদেশনীতির উপর জনমতের নেতিবাচক বা বিভাজনমূলক প্রভাব পড়তে দেখা যায়। প্রসঙ্গত ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং নওয়াজ সরিফের পাকিস্তান বিষয়ে উভয় সঙ্কটের কথা উল্লেখ করা যায়।

যদিও বিদেশনীতি গঠনে জনমতের গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির বিকাশের পর, তথাপি এটা লক্ষ্য করা যায় যে, নতুন নতুন গবেষণা যখন দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকায় উপর নতুন নতুন অন্তর্দৃষ্টি সহ আলোচনা করতে শুরু করে তখনি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, জনমত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে বা এখনও করে থাকে। ডেভিড হিউম তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধটি হল 'The First Principles of Government'। এখানে তাঁর বক্তব্যটি হল এই যে, প্রচলিত তত্ত্বকথা অনুযায়ী প্রতিটি সরকারই জনমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণাটি' 'extends to the most despotic and most military government'। তবুও একথা বলতেই হবে, যতদিন পর্যন্ত বিদেশনীতির বিষয়টি সরকার এবং তার কূটনীতিকদের হাতে থাকবে, জনমতের ভূমিকার প্রভাব কেবল আংশিকভাবে কার্যকর থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু এর পূর্ণ প্রভাব ছিল না; এবং দ্রুত বর্ধমান শ্রমশক্তির জোরাল বক্তব্যই কিন্তু বিদেশনীতিতে জনগণের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল যা 'উদারনীতিক শান্তির চাবিকাঠি' হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। এই নতুন শ্রমশক্তিকেই জনমতের ভূমিকার অনুমোদনের প্রস্তাবনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি উইলসন এই বক্তব্যের ভাষা

যুগিয়েছিলেন। তিনি ১৯১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পক্ষগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছিলেন এবং পরিষ্কার স্বীকারোক্তি করেন যে, কোন পক্ষই তাদের যুদ্ধের লক্ষ্যগুলি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে নি। ট্রটস্কি আর এক ধাপ এগিয়ে বিদেশনীতিতে জনমতের সুস্পষ্ট আবেদনের তথা ভূমিকার কথা বলেন। তিনি Brest-Litovosk-এর আলোচনার সময় উপস্থিত থাকাকালীন জার্মান সৈনিকদের মাঝে প্রচারপত্র বিলি করে তাদেরকে তাদের সরকারের ভূমিকার বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে আর্জি জানান। উইলসনও একই কৌশল অলম্বন করেন যখন তিনি ইতালির জনগণের কাছে তাদের সরকারের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধের জন্য ঐকান্তিক আবেদন জানান। এবং তৎপরবর্তী সময়ে থেকেই অন্যান্য জনগণের কাছে প্রচারবাদী পদ্ধতিটি একটি মান্য বিদেশনীতি-আচরণের স্বীকৃতি লাভ করেছে বলা যায়।

ফ্র্যাঙ্কেলও উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয় আন্তর্জাতিকবাদীর কাছেও জনমত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, তারা সঙ্কটকালীন মুহূর্তগুলিতে জনমতের বিষয়টি উত্থাপন করেন যেমনটি একবার লর্ড সেসিল করেছিলেন ১৯১৯ সালের ২১ জুলাই হাউস অব কমন্সে লীগের সনদটি উপস্থাপনের সময়। এখানে তাঁর মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেন: 'The great weapon is public opinion, and if we are wrong about it, the whole thing is wrong'। ফ্র্যাঙ্কেল কিন্তু এখানে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিদেশনীতিতে জনমতের দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হবার ক্ষেত্রে কিছু স্পষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমটি হল জনগণকে ঠিকমত ওয়াকিবহাল করে তোলার প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মত গণমাধ্যমের ভূমিকার ব্যর্থতা লক্ষিত হয় (Frankel, 1971:70-72)। অবশ্য গণমাধ্যমগুলির এই খামতিগুলি আজকের দিনে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সংযোগ-প্রযুক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে অনেকাংশেই সংশোধিত হয়ে গেছে। বিদেশনীতিতে এই গণমাধ্যম বাহিত তথ্যাদির প্রভাবের ফলে একশ্রেণীর গণমাধ্যমের গুরুত্বের ক্ষেত্রে কীরকম পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে লিখিত একটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে: 'Beginning in the late 60s or early 70s, television replaced newspapers as the American public's preferred souce of news and public affairs information. In the 1990s, cable television surpassed network television as the main source of continuous availability. The Pew Research Center for the People and the Press surveys showed appropriately 90 percent of Americans reported getting most of their news about 9/11 Operation Iraqi Freedom from televison. Forty five percent cited cable television for 9/11 versus 50 percent who mentioned cable as their main source of news on the Iraqi War. Finally, the internet emerged as a major news source after 9/11. Five percent of Americans cited it as a main source of information about the terrorist attacks, a figure rose to 11 percent during Operation Iraqi Freedom. Variety and timeless were two of the most important reason American internet users gave for seeking information online (Larsen, 2004:20)'।

কিন্তু, উল্লেখিত ঘটনার পর কী বিদেশনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যে সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করা হয়েছে তা অন্তর্হিত হয়েছে? এর কোন সরল উত্তর দেওয়া কঠিন। পঞ্চাশ বছর আগে স্যার আইভর কিরপাট্রিক বি বি সি ও বিদেশ কার্যালয়ের তথ্য বিভাগে কাজ করার অভিজ্ঞতার সুবাদে মন্তব্য করেছেন যে, শান্তির সময় বিদেশনীতিতে উপযোগী সন্তোষজনক তথ্য লাভ করাটা প্রায় অসম্ভব মূলত তিনটি কারণে। এই কারণগুলি হল: (ক) 'জনগণের অপরিমেয় অজ্ঞতা', (খ) সরকারি পরিষেবা বাণিজ্যিক পরিষেবার জীবন্ত ও অন্তর্দৃষ্টি জ্ঞাপক তথ্যাদির সঙ্গে এঁটে ওঠার সমস্যা; এবং (গ) দীর্ঘসময়কাল ধরে নিশ্চিত অর্থ সরবরাহের অনিশ্চয়তা। আজকের দিনে, একশ্রেণীর মিডিয়ার দ্বারা সৃষ্ট তথ্যবিপ্লব অতথ্য থেকে ভুল তথ্যের

সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভুল তথ্য দুটি উৎস থেকে সৃষ্ট। এ দুটি হল: (১) দারিদ্র, অশিক্ষা, দুর্বল তথ্য এবং সংযোগ প্রযুক্তি-কাঠামোর দুর্বলতা এবং 'digital divide'যা ভারতীয় জনগণকে একেবারে লম্বভাবে বিভক্ত করেছে। দরিদ্র জনগণের পক্ষে ওয়েব থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব প্রায় এই সমস্ত কারণে; এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভাষার সমস্যা। ভাষার ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। লারসেনের মতে, 'the mere fact the Aljazeera.net is an Arabic language Web site has a profound influence on who read its pages and with which impact.' লারসেন দেখিয়েছেন যে, এই থেকে প্রধান ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রাধান্য ধীরে ধীরে কমে এসে সাইটে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার প্রবেশ সম্ভব হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যায় সংস্কৃতি ও ভাষার গুরুত্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৯/১১ আক্রমণের পর আমেরিকায় বিপুল বিহ্বল করা সহানুভূতির প্রেক্ষিতে জনদৃষ্টিভঙ্গির উপর একটি সমীক্ষা হয়েছিল, যা পিউ (Pew) সমীক্ষা নামে পরিচিত। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, ২০০০ সালের পর, ২৭টি দেশের মধ্যে ১৯টিতে আমেরিকার প্রতি এই সহানুভূতির বাতাস ক্রম ক্ষীয়মান। অবশ্যই বিরূপতা সবাইতে বেশি ছিল মুসলিম দেশগুলিতে। তবে, সামগ্রিকভাবেই এই বিরূপতা বৃদ্ধি পেয়েছিল; এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে চির বন্ধু-দেশ সেই দক্ষিণ কোরিয়াতেও দুবছরের সময়কালে মার্কিনীদের প্রতি সহানুভূতির হারও পাঁচ শতাংশ কমে গিয়েছিল (Larsen, 21-22)।

উপরের কথাগুলি কেবলমাত্র আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তনের প্রতিই ইঙ্গিত করে না, বা মাধ্যমগুলির বিভিন্ন শাখার দ্বারা পরিবেশিত তথ্যাদির দিকে নির্দেশ করে না, গণমাধ্যম কর্তৃত পরিবেশিত সংবাদের ক্ষেত্রে পক্ষপাতের অথবা ভুল সংবাদাদিরও প্রতিও নির্দেশ করে। সংবাদ পরিবেশনের ধরন এমনভাবে হতে পারে যে কোন নির্দিষ্ট সরকার তার গৃহীত সকল বিদেশনীতি-সিদ্ধান্তের পক্ষে তো বটেই, এমনকি চূড়ান্ত বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলিতেও জনগণের সম্মতি আদায় করে নিতে পারে। ম্যাথু বাউম দেখিয়েছেন কেমনভাবে ৯/১১ ঘটনার আগেও অর্থাৎ আফগানিস্তানে ২০০১ সালে আমেরিকার আক্রমণের সময়, ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের সময় এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষেত্রে 'Today's Entertainment', 'Oprah Winfrey Chat' এর মত অনেক হালকা প্রোগ্রামে পরিবেশিত 'নির্বিষ সংবাদ' 'যুদ্ধকে জনগণের কাছে এনে দিয়েছিল।' এবং একই সঙ্গে টিভি চানেলগুলি 'দর্শক নির্মাণে'-র বিষয়টিকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেই ক্ষান্ত দেয়নি, যুদ্ধের মত বীভৎসতাকে বিনোদনে পরিণত করেছিল। Danny Schechter বলেছেন: 'It started with the Gulf War—the packaging of news, the graphics, the music, the classification of stories...Everybody benefited by saturation coverage. The more channels, the more sedated public will respond to this...If you can get an audience hooked, breathlessly awaiting every fresh disclousure with a recognizable cast of characters they can either love or hate, with a dramatic are and a certain coming down to a deadline, you have a winner in terms of building audience' (Baum, 2007:1)।

১৯৯৮ সালের ২০ আগস্ট রাত্রি ১.৩০ মিনিটে কিভাবে আফগানিস্তান এবং সুদানের ছয়টি সন্দেহজনক এলাকায় ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্রের আক্রমণ শুরু হয়েছিল তা টিভিতে দেখানোর পর—যা ঘটেছিল রাষ্ট্রপতি ক্লিনটনের হোয়াইট হাউসের কর্মী মোনিকা লিউন্সকির সঙ্গে যৌন কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় মহা বিচারকদের সামনে বিচারের ঠিক তিনদিন পর—বাউম দেখিয়েছেন, কিভাবে আমেরিকার সরকার ঐ আক্রমণের সপক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। ঐ আক্রমণের সময়টা খেয়াল করবার মত। আক্রমণ সংক্রান্ত সংবাদকে বিশ্বের অধিকাংশ টিভি চ্যানেলের মুখ্য সময়ে (Prime Time) প্রচারে জন্য পরিকল্পিত ভাবে রাখা হয়েছিল; আক্রমণের ছবি সাধারণ প্রচলিত চ্যানেলগুলিতেই কেবল দেখানো হয় নি, অন্যান্য কঠোরভাবে

সংবাদের জন্য নির্দিষ্ট চ্যানেলের পাশাপাশি বিনোদন মূলক টিভি চ্যানেলগুলিতেও প্রদর্শিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ, জনসমীক্ষায় জনগণের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আক্রমণকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই সমীক্ষায় ষাট শতাংশ আমেরিকা মনে করে নি যে, আক্রমণটি আসলে ক্লিনটন-লিউপকি কেলেঙ্কারির থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার এক কৌশল, যদিও ৪০ শতাংশ মানুষ একে অন্যতম কৌশল হিসেবেই দেখেছিল। বাউমের মতে, এই ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণের প্রতি মিডিয়ার বা জনগণের প্রতিক্রিয়া 'গত কয়েক দশক জুড়ে গণমাধ্যম কিভাবে বিদেশনীতির সঙ্কটের মত বড় রাজনৈতিক ঘটনার সংবাদ পরিবেশন করে সে বিষয়ে সম্ভাব্য পরিবর্তনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে; এবং পরিণামে, এই ঘটনাক্রম থেকে জনগণ কিভাবে ও কী শিক্ষা লাভ করে তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৮০-এর দশকের আগে জনগণ বিদেশনীতির ইস্যুগুলি সম্পর্কে সবচাইতে অবহিত হত এলিট সংবাদপত্র অথবা প্রধান প্রধান বেতারের রাত্রিকালীন সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে। তারও সামান্য আগে, সিভিক সংস্থাগুলি বেতারের আলোচনা থেকে বিদেশনীতির সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু, আজকের দিনে, সিভিক সংস্থাগুলির সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের দার্ঢ্য কমে যাওয়ার কারণে এবং আধুনিক মানুষের প্রবণতার—যাকে পাটনাম 'bowling aone' বলেছেন—জন্য আজকের মানুষ অনেক বেশি মিডিয়াবাহিত প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত। বাউম বলেছেন, 'many politically inattentive Americans actively avoid politics and foreign policy except what is covered by their soft news programs'. জনগণের ধারণায় পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বা তাৎপর্য থাকলেও, বাউমের মতে, সমস্যা হল 'মনোযোগী জনগণ' অথবা 'ইস্যু জনগণ' ব্যাতীত দুঃখজনকভাবে অজ্ঞ সাধারণ জনগণকে কিভাবে সরকারি বা বিদেশনীতির বয়ান বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করান যায়। তিনি বলেন যে, যদি জনগণের একটা বড় অংশকে হালকা সংবাদ পরিবেশনকারী গণমাধ্যমের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়, তবে জনমতের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বা সমসত্ত্বতা (heterogeneity) বৃদ্ধি সম্ভবপর হত (ibid. 2-4)।

কিন্তু সরকার এবং মিডিয়ার দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রক্ষেপণের আগ্রাসী সংবাদ পরিবেশনের প্রেক্ষিতে এই দুঃসাধ্য কাজটি কি আদৌ করা সম্ভব? এন্টমান দেখিয়েছেন যে কিভাবে মার্কিন মিডিয়ার গ্রেনেডা অথবা পানামার মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের একনায়কদের উপর আমেরিকার জয় উল্লাসের সঙ্গে প্রচারিত হয়েছে কিন্তু আমেরিকা বিদেশনীতির অন্যান্য বিতর্কিত ইস্যুগুলির দিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে নি। এন্টমান বিদেশ সম্পর্ক বিষয়ে জনমতের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সংবাদ গঠনের যে 'cascade model' টি দিয়েছেন তার মধ্যে তিনটি প্রস্তাবনা বা propositions রেখেছেন। এই প্রস্তাবনাগলি নীচে হুবহু উদ্ধৃত করা হল:

১) The public's actual opnions arise from framed information, from selected highlights of events, issues, problems, rather than from dire contact with the realities of foreign affairs.

২) Elites for their part cannot know the full reality of public thinking and feeling, but must rely on selective interpretations that draw on news frames.

৩) Policy makers relentlessly conten to influence the very news frames that influence them (Emtman, 209:125).

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদেশনীতির দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎস হিসেবে জনমতের ভূমিকাটি অত্যন্ত জটিল। আমরা ফ্রাঙ্কেলের সঙ্গে সহমত পোষণ করি যেখানে তিনি বলেন, Public opionin is too important to be left by any government to find its own level.' তাই তথ্যের উপর অনিবার্যভাবেই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়ে থাকে। যেহেতু 'গণতান্ত্রিক ধারণা হল এই যে, সমাজ অশিক্ষিত জনগণের আনুগত্য ব্যতীত পরিবর্তন

করা যায় না, সেই কারণেই এই জনগণকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন' (Frankel, 1971:75-76)। কিন্তু আমরা আমেরিকার অভিজ্ঞতার থেকে যা দেখেছি তাতে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব সরকারের একার ঘাড়ে যেমন ফেলে রাখা উচিৎ নয়, তেমনই কার্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার হাতেও সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ কর্পোরেটেরা এখন বিশ্ব পুঁজিবাদের নব্য চ্যাম্পিয়ন। মিডিয়ার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিরাপদ নয়; আমরা আগে ১৯৯৮ সালের ক্ষেপনাস্ত্র আক্রমণের সময় আমরা দেখেছি রাষ্ট্র কিভাবে জনমত ও সম্মতি তৈরি করে। এই সম্মতি তৈরির উপায়, সময়, এবং সরকার কেমনভাবে তা পরিবেশন করে তা দেখা যেতে পারে। যখন সাংবাদিকরা ইরাক যুদ্ধের বিষয়ে বুশ প্রশাসনের সময় নির্বাচনকে ঘিরে তদন্তের দাবিতে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে, তখন সেনাপ্রধান আন্ড্রু কার্ড হাড় হিম করা অকপটতার সঙ্গে বলেন, 'from a marketing point of veiw, you don't introduce new products in August' (Harold, 2007)। গবেষকরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে গত দু'দশক ধরে বিশ্বে একধরনের বাণিজ্যিক মিডিয়া ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং তার বিকাশ ঘটেছে অতি দ্রুততার সাথে। একইসঙ্গে 'বিশ্বের অধিকাংশ দেশে জাতীয় গণমাধ্যমের' গতিপ্রকৃতি ও তার চেহারা নির্ধারণ করে চলেছে। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে, এই বিশ্বায়িত বাণিজ্যিক গণমাধ্যমগুলি মাত্র দশটি অতিরাষ্ট্রিক (transnational) মিডিয়াগোষ্ঠীর দ্বারা হয় নিয়ন্ত্রিত নতুবা তাদের মালিকানাধীন যাদের প্রত্যেকেই প্রায় আমেরিকাস্থিত। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে চল্লিশটি বৃহৎ উত্তর আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যারা আঞ্চলিক বাজারের উপর প্রাধান্য বজায় রেখেছে। বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে এবং কর্পোরেট স্বার্থ সাধনকারী ও ভোগবাদী মূল্যবোধের পুজারী হিসেবে এই গণমাধ্যম ব্যবস্থায় কতিপয় কাঠামোগত অপ্রতুলতার সৃষ্টি করেছে যা আদতে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্ব-শাসনকেই সীমায়িত করে। সেখানে স্বাধীন জমত গঠনের চিন্তাটিই বাতুল হিসেবে গণ্য হয় (Herrman and McChesney, 1997: 189-90)।

এই কর্পোরেট মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিকল্প গণমাধ্যম বা সামাজি গণমাধ্যমের লড়াই এখনও একটা অসম লড়াই। যতক্ষণ না এই যুদ্ধে জয় আসে, ততক্ষণ জনমত একটি ভাঙাচোরা, শৃঙ্খলিত এবং অকার্যকর শক্তি হিসেবেই থেকে যাবে; অন্তত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকে আগ্রাসী বিদেশনীতি অনুসরণে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। উপসাগরীয় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে, গণমাধ্যমের সংবাদ পরিবেশনের ধরনটি—যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি—বিশ্লেষণ করে হ্যাকেট দেখিয়েছেন 'No blood for oil–was pushed to the margins in the mainstream press and found much beter expression in alternative papers'–এই প্রশ্ন উদ্রেককর স্লোগানটিকে অগ্রাহ্য করে বৃহৎ আখ্যানটিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে এর সমালোচনা করে। হ্যাকেট তাঁর যুক্তির সমর্থনে লিখেছেন: 'Only there did one find police harassment of protesters as a significant news topic-reversing the enemy within frame-extended the discussion of the internal politics of the antiwar coalition as a movement with traditions and complexity. Alternative media were more likely to seek a broader context, which departed from the master narrative and to access voices otherwise marginalized'. (Hackett, 1997:158)।

৩.৪ বিদেশনীতিতে সংসদ, কংগ্রেস এবং অন্যান্য আইন সভাগুলির ভূমিকা

বিদেশনীতির দেশীয় উৎসগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মিডিয়া বাহিত জনমতের সর্বোত্তম প্রতিষ্ঠান। এই বিভাগে আমরা একে পার্লামেন্ট না বলে কেন্দ্রীয় আইনসভা বলে অভিহিত করব,

কারণ সকল গণতান্ত্রিক সরকারের পার্লামেন্ট-ব্যবস্থা নেই। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বিদেশনীতিতে যেখানে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক রচনা সম্ভারকে আমরা আলোচনার বাইরে রেখে দেব। যেখানে পার্লামেন্টের ধারণাটি প্রযোজ্য সেখানে অবশ্যই একে ব্যবহার করব। আমরা আমাদের আলোচনা ব্রিটেনকে দিয়ে শুরু করব; ব্রিটেনকে পার্লামেন্টীয় সার্বভৌমিকতার আঁতুড়ঘর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানেই পার্লামেন্টীয় সার্বভৌমিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সুইস তাত্ত্বিক Jean-Louii de Lolme বলেন 'It is a fundmental principle with the English lawyers, that parliament can do everything except a woman a man or a man a woman' (Memories, 1779)। স্যার উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন এই দাবীটিকে একটু খাটো করে বলেছেন: 'পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও অধিকারের এলাকা—এতটাই ব্যাতিক্রমী ও চূড়ান্ত যে কোন ব্যক্তি বা কারণের জন্যই একে কোন সীমার মধ্যে বেধে রাখা সম্ভব নয়। এর আইন প্রণয়ন, একে অনুমোদনের, এর বিস্তার ঘটানো, প্রতিহত করা, বাতিল করা, সংশোধন করা, এর পুনরুজীবন ঘটানো এবং সর্বোপরি আইনের সবিস্তার ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে পার্লামেন্ট সার্বভৌম এবং অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্বের অধিকারী. এছাড়াও যাজক সম্বন্ধীয় বা জাগতিক-এর সর্ববিধ বিষয়ে নাগরিক, সামরিক, সামুদ্রিক অথবা অপরাধী বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা যা অন্যান্য সরকারের ক্ষেত্রে কোথাও অর্পিত থাকে তা (ব্রিটেনে) বিভিন্ন রাজ্যের সংবিধান কর্তৃক এর (পার্লামেন্টের) হাতেই চূড়ান্ত এবং কতকটা স্বৈরাচারমূলক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে।...' তিনি আরো বলেছেন, 'All mischiefs and grievances, operations and remedies, that transcend the ordinary course of the laws, are within the reach of this exraordinary tribunal. It can change and create afresh even the Constitution of the kingdom, and of parliaments themselves, as was done by the Act of Union and the statues for triennial and septennial elections. It can, in short, do everything that is not naturally impossible to be done; and, therefore, some have not scrupled to call its power, by a figure rather too bold, the omnipotence of Parliament.'

উপরের বক্তব্য থেকে একথা সহজেই যে কেউ ভুলক্রমে মনে করে নিতে পারে যে, পার্লামেন্টের বিদেশনীতির গঠনে চূড়ান্ত ক্ষমতা রয়েছে। এর কারণ হল এই যে, যদিও ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত তথাপি, ইয়ানি ব্রওলির মতে, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে (ক্ষমতা) দৃঢ়ভাবে প্রোথিত', যা আবার ব্রিটেনের স্বীকৃত আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিপুল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। যে সমস্ত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত সেগুলি হল: পার্লামেন্ট কেবলমাত্র একজন নারীকে পুরুষে বা তার উল্টোটা ছাড়া সব কিছুই করতে পারে; অর্থাৎ, পার্লামেন্ট স্বাভাবিকভাবে যা কিছু অসম্ভব তা সব কিছুই করতে পারে যদি ইচ্ছে করে।

- ১৭০৭ এর স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ইউনিয়নের আইন, যাতে বলা হয়েছিল সমস্ত সংসদীয় আইন যদি উক্ত আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে তা অবৈধ।
- ১৯৩১-এর ওয়েস্টমিনিস্টার সনদ যা কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যুক্তরাজ্যের ক্ষমতার কথা বলে।
- ১৯৭২ এর ইউরোপীয় কমিউনিটি আইন—যদিও এর কর্তৃত্ব একটি প্রথাগত বিষয়।

পার্লামেন্টের এই সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাগুলিকে অন্যদিক থেকে মাঝে মাঝে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ব্রউলি উল্লেখ করেছেন: '...the United Kingdom has certain quasi federal specs. These are often missed...' উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, 'for certain purpose the Isle of Man and the channel Islands are not part of the United Kingdom. Because of this, when the question of accession to the

European Common market arose, the Channel Islands conducted their own negotiations...they gave a mandate to the negotiators, but took their own view. Without their separate consent the British government could not have their authoreity to negotiate.' পার্লামেন্টীয় সার্বভৌমিকতার এই সব বাধার কথা বাদ দিলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, যে নীতি ব্রিটিশ সংবিধনের পরিচালনায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সমগ্র সংবিধান জুড়েই এর উপস্থিতি জানান দিয়ে থাকে তা হল এর ক্যাবিনেট ব্যবস্থা। সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েব তাঁদের A Constitution for the Socialist commonweath of Great Britain (1920) শীর্ষক গ্রন্থে একে 'ক্যাবিনেট একনায়কত্ব' বলে অভিহিত করেছেন। আবার বুরির লর্ড হিউয়ার্ট তাঁর The New Despotism (1929) গ্রন্থে একে 'ক্যাবিনেট স্বৈরতান্ত্রিক' বলেছেন। জি. ডব্লু. কিটোন তাঁর ১৯৫২ সালে প্রকাশিত পুস্তক The passing of Parliament-এ একে 'পার্লামেন্টের বিশেষ ক্ষমতার ত্যাগ' বা 'abdicatioin of Parliament' হিসেবে দেখেছেন। পার্লামেন্টীয় সার্বভৌমিকতার এই সব র‍্যাডিকাল সমালোচনা বাদ দিয়েও আমরা স্যার আইভর জেনিংসের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি যেখানে জেনিংস ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ফরাসী ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি সাধারণ প্রচলিত বক্তব্যকে বাতিল করে মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা পার্লামেন্টকে সরকার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এটা ফ্রান্সের ক্ষেত্রে সত্য হলেও ব্রিটেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ ফ্রান্সে যে কোন সরকারই একটা কোয়ালিশান সরকার এবং এখানে প্রকৃত সম্ভ্রম দেখান হয় আইনসভার বিভিন্ন কমিটিগুলির মতামতকে। কিন্তু জেনিংসের মতে এটি ব্রিটেনর ক্ষেত্রে সত্য নয়। করাবিনেট বা ক্যাবিনেটর নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বিভাগ বা দপ্তর নীতি প্রণয়ন করে এবং পার্লামেন্ট হয় তা গ্রহণ করে নতুবা তাকে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন যে, হাউস অব কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য। প্রণীত আইন হাউসের সামনে উপস্থিত করা হয় এই আশায় যে দল তাকে সমর্থন করবে। যদি দল পূর্ব নির্ধারিত উপায়ে সমর্থন যোগায় তবে স্বাভাবিক ভাবেই ক্যাবিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। বিরোধী দল কি বলল বা কি করল তাতে কিছু এসে যায় না কারণ নীতিটি পূর্বেই সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত এবং সেই কারণেই একে বাতিল করা যায় না। জেনিংসের এই বক্তব্য উল্লেখিত আছে তাঁরই রচিত গ্রন্থ The Law and the Constitution-তে।

ব্রউলি এই সব মন্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'this preponderant power of the cabinet, even when there is minority government...is a condition affecting the role of parliament in all spheres, and not least in foreign affairs. It limits the role of Parliament *fundamentally.* Moreover, even within the ruling party, the isolation of the cabinet restricts the role of members of Parliament in policy-making.'

ক্যাবিনেট নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ব্রিটিশ ব্যবস্থার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল রাজার বা রানির হাতে বিশেষ ক্ষমতা পার্লামেন্টর বিদেশনীতির উপর নিয়ন্ত্রণকে সীমায়িত করেছে, যা প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ও সিভিল সার্ভিসকেই বুঝিয়েছে। একে 'বিশেষাধিকার বা বিশেষ ক্ষমতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষমতার মধ্যে পড়ে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সদস্যপদ গ্রহণ করার ক্ষমতা, কোন রাষ্ট্র বা সরকারকে স্বীকৃতি দেবার মতো চুক্তি সম্পাদনের এবং পূর্বে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চল সংযুক্তিকরণের ক্ষমতা। অবশ্য, উক্ত ক্ষমতাগুলির ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে; কারণ, ক্যাবিনেট এবং প্রত্যেক ব্যক্তি-মন্ত্রী পার্লামেন্টের কাছে তাদের রূপায়িত সিদ্ধান্তের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। তবুও এখানে বলতেই হয় যে, পররাষ্ট্রিক কার্য এমনভাবে করা হয়ে থাকে যে, পার্লামেন্টিয় প্রশ্নাবলী ও বিতর্কসমূহ ইতিমধ্যেই রূপায়িত

নীতিগুলির মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়। যার ফলে আগে থেকেই এর একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা হয়ে যায়। এমনকি জেনিংস এর মতে 'Ponsonby rule' যা অনুযায়ী যেকোন আন্তর্জাতিক চুক্তি আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের আগে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থাপন করা জরুরি হলেও তা আর বাধ্যতামূলক নয়।

এই সব কাঠামোগত কারণ ছাড়াও এটা মনে রাখা উচিত যে, উনিশ শতকে সাংবিধানিক প্রথায় যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্ট বিদেশনীতি নিয়ন্ত্রণ করত না। ১৮৬৭ সালে ওয়াল্টার বেজহট লিখিত ধ্রুপদী গ্রন্থ The English Constitution–তে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। ১৯৩৪ পর্যন্ত এবং তার পরেও গোপন কূটনীতির বিষয়টি বিদেশনীতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আয়ত্তের বাইরে ছিল এমনকি প্রাচীন দেশগুলিতে—যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। এই আপাতস্ববিরোধী অবস্থানটি স্পষ্ট হবে হ্যারল্ড নিকলসনের মন্তব্য থেকে।

'The diplomatist, being a civil servant, is subject to the foreign secretary, being a member of the cabinet, is subject to the majority of the Parliament; being but a representative assembly, is a subject to the sovereign people.'

কিন্তু সার্বভৌম জনগণ এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়। নিকলসন উল্লেখ করেছেন যে, এমনকি ১৯১৮ সালেও যখন বিদেশনীতিতে এবং শান্তি আলোচনায় জনগণের ভূমিকা চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল, তখনও বিদেশনীতির সীমা নির্ধারণে জনগণ কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি; যদিও আলোচনার মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণের বৈধ সুযোগ ছিল। পার্লামেন্ট ভার্সাই চুক্তি গ্রহণ করেছিল কেবলমাত্র চারটি বিরোধী ভোটের মুখোমুখি হয়ে। এটি উপস্থাপন করেন লয়েড জর্জ। এমনকি ১৯২৯ সালে লেবার সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধারের আগে পর্যন্ত Ponsonby ruleটিও অকার্যকর ও সুপ্ত অবস্থায় ছিল। অবশ্য পার্লামেন্ট কতকগুলি ঐতিহাসিক মুহূর্তে তার ক্ষমতার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ১৯৩৫ সালে ইথিওপিয়ার বিনিময়ে মুসোলিনীকে হোর-লাভাল পরিকল্পনার মাধ্যমে তোষণ করা খবরটি ফাঁস হয়ে গেলে পরিকল্পনাটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এর থেকে ভালো উদাহরণ হিসেবে ১৯৪০ সালে চার্চিল কর্তৃক কুখ্যাত চেম্বারলেনের অপসারণের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে, বাস্তব উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রাখলে বলতে হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীই তাঁর সিভিল সার্ভিসের পরামর্শদাতাগণের সাহায্যে, বিশেষ করে বিদেশ কার্যালয়ের আধিকারিকরা, এবং প্রতিরক্ষা, সমুদ্র পারের নীতি নিয়ামক কমিটি, অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ কমিটি সহ অন্যান্য ক্যাবিনেট কমিটিগুলির সাহায্যে বিদেশনীতি গঠন করেন। এক্ষেত্রে পার্লামেন্টের কোন উপস্থিতিই লক্ষ্য করা যায় না। বিদিশে কার্যালয়ের আধিকারিকরাই এক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন (Browli, 1980:1-10)।

প্রায় একই কথা পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে আর জোরের সাথে বলা যায়। ফরাসী পার্লামেন্টের (Parlement francaise)-যা সিনেট (Senate) এবং জাতীয় সভা নিয়ে গঠিত—বিষয়ে বলতে গিয়ে জাঁপিয়েরে কট (Jean Pierre Cot) বলেছেন, 'no sector has been affected by the decline of parliament as much as foreign policy. The exercise of parliamentary control has, in effect, been deeply prejudiced in France, and this prejudice has worsened under the Fifth Republic, both with regard to the function of control over foreign policy and with respect to...judicial authorization' or 'ratification of treaties' through Art.53 of the French constiution...' কট বলেছেন যে, ১৯৪৬ সালের সংবিধান যা পার্লামেন্টকে অনেক বেশি ক্ষমতা দিয়েছিল, তার তুলনায় ১৯৫৮ সালের সংবিধান পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সীমায়িত ও খর্ব করেছিল। তিনি এর কারণ সংবিধানের গ্যলীয় ধারণার এবং এর সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্কের

মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি ফ্রান্সের পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সদস্য রূপে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

'বিদেশনীতির বিষয়টি পার্লামেন্টকে আকৃষ্ট করে না। বিদেশনীতিতে আগ্রহ দেখানটা একটা বাজে রাজনৈতিক চাল। কোন সদস্যের নিজের নির্বাচনী জেলা হারানোর এটি সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সেই কারণেই বিদেশনীতি বিষয়ক বিবাদ বিতর্ক মোটেও আগ্রহ সঞ্চারী নয়। ফল স্বরূপ পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি একটি বন্ধু ভাবাপন্ন ক্লাব...যা সপ্তাহে একবার এটা সেটা বলার জন্য মিলিত হয়... এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক বিতর্ক দৃশ্যতই নিষিদ্ধ, কারণ ফ্রান্সের বিদেশনীতির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সরাসরি কমিটির সামনে আনাটা অসুবিধাজনক। এই নিষেধাজ্ঞাটি কোন আইন দ্বারা কৃত হয় নি, বরং সরকার ও পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রেসিডেন্টের যৌথ ইচ্ছার ফলই এটি জারি হয়েছে।'

কট এ প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প শুনিয়েছেন। ১৯৭০-এর দশকে তেল সঙ্কটের সময় নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী তেলের বর্ধিত মূল্য ও তজ্জনিত সমস্যার ব্যাপারে উত্তর দেবার জন্য কমিটির সামনে উপস্থিত হন। 'তিনি কার্যত বলেন যে এই সম্পর্কে প্রশ্নটি জটিল এবং এটা কেবলমাত্র তাঁর বিবেচনার বিষয় নয়, এর সঙ্গে আরও অনেকের বিষয়-বিবেচনা জড়িত'। যখন উত্তরে তাঁকে বলা হয় এর সাথে জড়িত এলিস এর সেক্রেটারি জেনারেলকেও ডাকা হবে, তখন ঐ ব্যক্তি 'বলেন যে, একজন সিভিল সারভেন্টকে ডাকার কোন প্রশ্নই নেই, এমনকি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ কাউকে ডাকারও প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি এই ব্যাপারে দায়িত্বশীল কেউ নন যদিও তিনি রাষ্ট্রের বিদেশনীতির বিষয়টি পরিচালনা করে থাকেন।'

কট চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের অবক্ষয়টি দেখিয়েছেন। সংবিধানের ৫৩ নং ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি সম্পাদনের অনুমোদনের আগে বা পরে পার্লামেন্টের একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকার কথা। এখানে কটকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'In other words, parliamentary intervention is no longer justified by former criterion (the existence of treaty needing ratification in order to enter into force), but by a material one (the subject matter of international agreement)'. এবং এই অন্যতম বিরল ধারাটি ১৯৫৮ সালের সংবিধানে যা বর্ণিত হয়েছে তা 'বিদেশনীতির বিষয়ে পার্লামেন্টের যোগ্যতা বা অধিকারটিকে প্রসারিত করেছে' (Cot, 1980:11-17)।

বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টগুলির তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বিদেশনীতি গঠনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর কারণ হিসেবে ডেভিড লেইটন-ব্রাউন যথার্থ বলেছেন যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিদেশনীতির গঠনের ক্ষমতা আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেস এবং প্রশাসনিক শাখা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি উভয়কেই প্রদান করেছে'। ফিশার উল্লেখ করেছেন যে, কিভাবে বিদেশনীতির গঠনের ক্ষমতাকে 'কংগ্রেস, রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে' ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বিদেশনীতির ক্ষমতা বিভাজনের এই সাংবিধানিক পদ্ধতির অনেক উদাহরণ রয়েছে।

- যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে থাকলেও রাষ্ট্রপতি হলেন সেনা প্রধান বা কম্যান্ডার-ইন-চিফ।
- রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন, কিন্তু কংগ্রেসের হাতে সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার এবং সমর্থন জুগিয়ে যাবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে; নৌবাহিনীর জন্য অর্থ যোগান দেওয়া এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ও সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি তৈরির ক্ষমতাও কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত।
- অর্থের এবং বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণের উপর কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা ১৭৮৭ সালের রাজনৈতিক সংঘাতকেই মনে করিয়ে দেয়।

- বিষয়টিকে আরও একটু জটিল করে তোলা হয়, যখন দেখা যায় সে সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করেছে, আবার একই সঙ্গে সেনেটের পরামর্শ এবং অনুমতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। চুক্তিগুলিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য যেহেতু যাথার্থ্যতার বা appropriations-এর প্রয়োজন সেই কারণে, জনপ্রতিনিধিসভা চুক্তিমধ্যে অঙ্গীকৃত বিষয়গুলির পরিধিকে সীমায়িত করার ক্ষমতা ধরে।

রাষ্ট্রদূত সহ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ক্ষমতার উপর সেনেটের ক্ষমতা আছে। অবশ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সেনেট রাষ্ট্রপতির নিয়োগ সম্পর্কিত ক্ষমতার আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়ে তাকে প্রতিরোধ করা অথবা তাতে বাধা দেওয়ার বাপারে দ্বৈধী ভাব দেখিয়ে এসেছে। রোসাটি ও স্কট উল্লেখ করেছেন যে, একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কংগ্রেসের থেকে সর্বমোট ৬৮টি অনুমোদনের জন্য সেনেটের কাছে প্রেরিত বিষয়ের মধ্যে ৬৪টিতে অর্থাৎ ৯৪ শতাংশের উপর তার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর প্রদান করেছে। কিন্তু সেনেটের অনুমোদন প্রক্রিয়াটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ ও জটিল হয়ে পড়েছে এবং পক্ষপাত এই প্রক্রিয়াটিকে বাপকভাবে প্রভাবিত করে। এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কিছু কিছু সেনেট সদস্য নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনুমোদনকে বাতিল করার চেষ্টা করেন, তাঁদের ক্ষমতার ব্যবহার করে এই যুক্তিতে যে ঐ ব্যক্তিগণ বিদ্যমান কংগ্রেসের সংখ্যা গরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত নন। অন্যান্যরা সম্মতি ও অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টিকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে বিবেচনা না করে একে প্রশাসনিক শাখার থেকে কংগ্রেসকে রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন'। বাতিল অনুমোদনগুলিও কিন্তু কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এর মধ্যে যেগুলি উল্লেখের দাবী রাখে সেগুলি নিম্নরূপ: (১) রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার কর্তৃক অনুনোমদিত CIA-এর ডিরেক্টরের পদে থিওডোর সোরেনসনের অনুমোদন বাতিল করতে হয় দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক এবং রক্ষণশীল সেনেটরদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতার করণে; (২) রাষ্ট্রপতি জর্জবুশ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে জন টাওয়ারের নিয়োগ সেনেটের অস্বীকৃতির জন্য বাতিল হয়ে যায়: (৩) DCI পদে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে অ্যান্থনি লেকের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন রিপাবলিকান সদস্যদের প্রবল বাধার মুখে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন; (৪) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দূত হিসেবে জন বলরনের অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাময়িক নিয়োগটি করা হয় কংগ্রেসের বিরোধিতাকে এড়ানোর জন্য (Rosati and Scott, 2011:314)।

বিশেষজ্ঞরা মার্কিন বিদেশনীতির গঠনে কংগ্রেসের ভূমিকাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেছেন। যেমন লেইটন-ব্রাউন উল্লেখ করেছেন:

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের প্রথম পঁচিশ বৎসরের সময়কালে বিদেশনীতিতে কংগ্রেসের চারটি স্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল মানিয়ে নেবার পর্যায়ে বা accommodation, বিরোধিতার পর্যায় বা antagonism, মৌন সম্মতির পর্যায় বা qcuiescence এবং অস্পষ্টতার পর্যায় বা Ambiguity। অবশ্য, এই সমগ্র সময়কাল জুড়েই রাষ্ট্রপতি নেতৃত্বে দান করেছেন। তারপর ১৯৭০-এর দশকে প্রশাসনিক গোপনীয়তার ব্যাপারে পবর্তপ্রমাণ অসন্তোষের কারণে এবং ভিয়েতনাম ও ওয়াটারগেটের বিষয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে এবং অংশত আইনসভার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণে, কংগ্রেস বিদেশনীতির ক্ষেত্রে শক্ত পদক্ষেপ নিতে শুরু করে ও রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর বিধিনিষেধ জারি করতে আরম্ভ করে এবং নতুন নতুন নীতলক্ষ্য নির্ধারণে উদ্যোগী হয়। অতি সম্প্রতি, ১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে পূর্বের দৃঢ়তাপূর্ণ ভূমিকার থেকে পিছু হটে আগের দশকে নেওয়া বিধিনিষেধ মূলক পদক্ষেপগুলির সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় নমনীয়তা

আনার উদ্যোগ লক্ষিত হয়। এর ফলে, যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি রয়ে যায় সেটি হল এই যে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে এই উলোটপুরাণ কি কংগ্রেসের ভূমিকার গুরুত্বের অবনতিকেই সূচিত করেছিল অথবা ১৯৭০-এর দশকে কংগ্রেসের ভূমিকায় একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছিল যাতে কিনা অদূর ভবিষ্যতে আইনবিভাগ-শাসনবিভাগ সম্পর্কের ফলে কংগ্রেসের আব্বার দৃঢ়তাপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হবে' (Leyton-Brown, 1982-83: 59)।

যাকে লেইটন-ব্রাউন কংগ্রেসের দৃঢ়তাপূর্ণ ভূমিকা বলেছেন ১৯৭০-এর দশকে তা-ই ছিল আসলে অবিমৃশ্যকারিতা যা একাধিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতির এবং শাসন বিভাগের বিদেশনীতি-বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তকে পাল্টে দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল এবং নতুননীতি আচরণকে বাধ্যতামূলক করে তুলেছিল। যেসব ক্ষেত্রে এই সক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল সেগুলি হল:. 'সামরিক কার্যকলাপ, অস্ত্র বিক্রয়, গোয়েন্দা কার্যকলাপ, বাণিজ্য এবং আণবিক অস্ত্রের প্রসার মানবাধিকার এবং শাসন বিভাগীয় চুক্তির উপর নজরদারী' (ibid., 60)। কিন্তু, লেইটন-ব্রাউন যা ১৯৮০-এর দশকে বলেছিলেন বা খুঁজে পেয়েছিলেন অর্থাৎ পুর্বোল্লেখিত পিছু ব্যাপারটি আদৌ কি ঘটেছিল? ভিন্নতর মত পোষণ করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এখানে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফিসার যুক্তি দিয়েছেন যে, 'রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের এবং কংগ্রেসের সঙ্গে বিদেশনীতি বিষয়ে সাংবিধানিক সম্পর্কটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল '১৯৮৭ সালে এগুগুচ্ছ অসাধারণ গুনানির সময়ে' যখন, 'ইরান-কন্ট্রা সম্পর্কিত ব্যাপারে কংগ্রেসের অনুসন্ধান' শুরু হয়েছিল: অর্থাৎ, যখন 'কংগ্রেস রেগন প্রশাসনের ইরানকে অস্ত্র বিক্রি সম্পর্কিত ক্রিয়াকাণ্ড পরীক্ষা করেছিল এবং সেই বিক্রির থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আবার নিকারাগুয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্যের কাজে লাগিয়েছিল।' লক্ষ লক্ষ আমেরিকা অধিবাসী তাদের টিভিতে একমাস ধরে এই কাহিনী প্রত্যক্ষ করেছিল, ঠিক তখনই পুর্বোল্লখিত শুনানির মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে, ইরান-কন্ট্রা ব্যাপারের অনেকটাই জুড়ে ছিল বিদেশনীতিতে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যেকার সম্পর্ক বিষয়ে এক ভুল ধারণা। 'মূল প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুসারে বিদেশনীতির বিষয়টি একান্তভাবেই রাষ্ট্রপতির এক্তিয়ারভূক্ত। তাঁর মনে করেন, প্রকৃতিগত দিক থেকেই, কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ শাসনবিভাগের দায়িত্বের উপর এক অবৈধ বা অনধিকার চর্চা।' কিন্তু, এই প্রমাণ উপস্থাপনকারীরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রপতির বিদেশনীতি বিষয়ক ক্ষমতা হস্তাগত করার আগেই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির প্রশাসনকে কার্যত অধিকার করে নিয়েছিল; যখন ১৯৮১ সালে, কানাডার বিনিয়োগের পরিণাম নিয়ে এবং আমেরিকার বাণিজ্যে শক্তি নীতির ব্যাপারে বিরোধ বাধে, তখন রেগন প্রশাসন বিদেশনীতিতে পৃথক পন্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। (কিন্তু) এই বিষয়টি স্পষ্টতই কংগ্রেসের সাংবাধিনিক এক্তিয়ারভূক্ত, কারণ সংবিধান কংগ্রেসকে 'বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণের' অধিকার দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, House Committee on Energy and Commernce-কে প্রশাসন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি প্রদান করতে অস্বীকার করে অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম ফিঞ্চের যুক্তিকে তুলে ধরে; যে যুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, তথ্যগুলি শাসনবিভাগের মধ্যে চলতে থাকা 'আলোচনা প্রক্রিয়ার' পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথবা এর ভিতর 'স্পর্শকাতর বিদেশনীতির বিবেচনাধীন বিষয়' রয়েছে। কংগ্রেস অবশ্য দপ্তরের সচিবকে লেখ জারি করে এবং অবমাননার দায়ে দোষী করে ঐ মুল্যবান তথাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়।

অধিকন্তু, ইরান-কন্ট্রা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতার অপব্যবহারে উদ্রিক্ত হয়ে কংগ্রেস পুনরায়তার ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত উপায় দৃঢ়ীকৃত করতে সমর্থ হয়। ফিশারের ভাষায়: 'Bills have been introduced to tighten congressional control on covert operations, especially by requiring the president to nitify Congress and members of the National Security Council. If the president decides to

authorize a cover action, he must prepare a written finding, distribute it to the proper parites, and take steps that all findings are preserved as official records. Findings are to be prospective, not retroactive. To prevent private parties from engaging in personal forays into foreign policy, Congress is considering amendments to strengthen the Neutrality Act. Enactment of new criminal penalties would remind executive officials and private citizens the violating congressional policy runs the risk of fines and jail sentences' (Fisher, 150-59)।

এমনকি এই প্রমাণগুলিও বিদেশনীতি গঠনে মার্কিন কংগ্রেসের ভূমিকার মূল্যায়নে যথেষ্ট নয়, কারণ উক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা শুধু এটুকুও প্রকাশিত হয় যে কিভাবে কংগ্রেস বিচ্ছিন্ন কিছু ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের ইচ্ছা চরিতার্থতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সমগ্র বিদেশনীতি প্রক্রিয়াটিতেই এর যে সর্বব্যাপী প্রভাব ছিল তা আলোকিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, এই প্রচলিত আলেচনাগুলি পরিণাম হিসেবে নীতি থেকে প্রক্রিয়া হিসেবে নীতিকে পৃথক করতে সক্ষম হয়নি। 'নব্য প্রতিষ্ঠানবাদীদের' অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে লিন্ডসে দেখিয়েছেন, কিভাবে 'Congress changes the structure and procedures of decision making in the executive branch in order to influence the content of policy.' এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস আনীত 'পাঁচটি পদ্ধতিগত উদ্ভাবন'-এর তিনি মূল্যায়ন করেছেন। এগুলি হল: (ক) পেন্টাগনে অফিস অব দ্য ডিরেক্টর অব অপারেশনাল টেস্ট অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশান: (খ) অস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আইন সঙ্ক্রান্ত ভিটো; (গ) বাণিজ্যিক চুক্তি আলোচনায় কংগ্রেসের অংশগ্রহণ; (ঘ) মার্কিন সাহায্যের ক্ষেত্রে শর্তাবলীর সংযুক্তিরণ; এবং (ঙ) গোয়েন্দা বিভাগগুলির রিপোর্টের উপর গুরুত্ব প্রদান। এই পাঁচটি ক্ষেত্রের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লিন্ডসে মন্তব্য করেছেন যে, 'studies of Congress's role in foreign policy need to pay more attention to how members of Congress use procedural innovations to build their policy preferences into the policy-making process' (Liondsya, 1994:281-304).

লিন্ডসে আরো উল্লেখ করেছেন, বিদেশনীতি প্রণয়নে মার্কিন কংগ্রেসের ভূমিকাটি আমরা একেবারে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছি। লিন্ডসে বলেন, 'কংগ্রেসের প্রভাব মূল্যায়নে অধিকাংশ প্রায়শই বাস্তব স্বাতন্ত্রযুক্ত নীতি-প্রস্তাব সৃষ্টি ও তা পাস করানোর সক্ষমতা সংগ্রেসের আছে কি না তা ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হয়েছে। আইন সংক্রান্ত সাফল্যকে একমাত্র মাপকাঠি বিবেচনা করায় কংগ্রেসের গুরুত্ব তেমন অনুভূত হয় না। গত দু'দশকে আমেরিকার রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও কংগ্রেসের খুব কম সংখ্যক বিদেশনীতি-প্রস্তাবই তৈরি করতে পেরেছে; বিদেশনীতির ক্ষেত্রে উদ্যোগের বাপারটি এখনো হোয়াইট হাউসের হাতেই রয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। যদিও বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিতর্ক পঁচিশ বছর আগের তুলনায় বেশিরভাগটই বিভেদমূলক, তথাপি জনপ্রতিনিধি সভা এবং সেনেট রাষ্ট্রপতির বিদেশনীতি-সম্বন্ধীয় অনুরোধ বা তাদের বিকল্প কোন নীতি গ্রহণে অনিচ্ছুক'।

কংগ্রেস কি বিদেশনীতির বিষয়ে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ?—এই প্রশ্নের প্রায় নেতিবাচক উত্তরটি উত্থিত হয় কেবলমাত্র বৈদেশিক নীতিতে কংগ্রেস কতটা আইন প্রণয়ন করতে পারে তার সামর্থ্যের বিচার করে। কংগ্রেসের এই আইন সংক্রান্ত ভূমিকার ইতিহাসটি কেবল একটি আংশিক গল্পকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। এর কারণ হল:

'Congress influences policy through several indirect means; anticipated reactions, changes in the decision making process in the executive branch, and political grandstanding. Indeed, the same factors that frustrate congressional attempts to lead on foreign affairs encourage

legislators to use indirect means to influence policy. Attention to these indirect means suggests contrary to the argument made by pessimists, that Congress often exercises considerable influence over the substance of U.S. foreign policy' (Lindsay, 1992-93:607-09).

কিন্তু, আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে হবে, বিদেশনীতি গঠনে মার্কিন কংগ্রেসে ব্রিটিশ ও ফরাসী পার্লামেন্টের তুলনায় অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করবার আগে, আমাদের উল্লেখ করা উচিৎ যে, ভারতীয়, পার্লামেন্টও এর নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সংবিধানের ২৪৬ নম্বর ধারায় বিদেশনীতির সর্ব বিষয়ে পার্লামেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশের পার্লামেন্টের মতই ক্যাবিনেটের এক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকাকে যোগসূত্রটি স্থআপন করে 'Consultative Committee of Parliament on External Affairs'। ১৮৫৪ সালে উপনিবেশিক ভারতে মূলত এটি তৈরি হয়েছিল, ১৯৬৯ সালে 'informal' বা অনানুষ্ঠানিক শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, নেহেরুর সময় এটা বিশেষত ছিল 'সরকার ও পার্লামেন্টের মধ্যে নিষ্ক্রিয় এবং একমুখী সম্পর্ক, এর উল্টোটা নয়' (2000:161-63)। নেহেরুর রাজনৈতিক মর্যাদার উৎকর্ষ এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান এবং অন্যদিকে সাধারণ সদসদের আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে এটি অনিবার্যই ছিল। এতদসত্ত্বেও এই সদসদের উপর নেহেরু আস্থা স্থাপন করেছিলেন, যা তাঁর উত্তরসূরিদের সম্বন্ধে বলা যাবে না। একজন সাম্প্রতিককালের ভাষ্যকার মন্তব্য করেছেন: 'পরামর্শ দানের কমিটির কোন ব্যক্তিত্ব বা দায়িত্ব নেই। সদস্যরা কেবল যে কাজটি করতে পারে তা হল মন্ত্রীকে সুপারিশ করতে পারে কিন্তু, মন্ত্রীর কোন দায় নেই যে তাঁদের সুপারিশ বা পরামর্শ মানার। অবশ্য, কমিটির সভাগুলি একটা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। যেহেতু সভাগুলির কার্যবিবরণী গোপন থাকে, সেইহেতু মন্ত্রীগণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ এখানে উপস্থিত করতে পারেন যা কোথাও প্রকাশ করা যায় না। মন্ত্রীরা এই সভাগুলিকে ব্যবহার করেন বিদেশনীতির কিছু কিছু অবস্থান সম্পর্কে সরকারের মতামতকে ব্যাখ্যা করার কাজে, যে বিষয়গুলি পার্লামেন্টের স্বার্থের ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে এই তথ্যাদি পার্লমেন্টের কাছে মূল্যবান, কারণ সংসদীয় বিতর্কে এবং তার কার্যবিধি ব্যবহারে অনেক বেশি বুদ্ধিদীপ্ত প্রেক্ষাপটে ও অনেক শক্তিশালী যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আলোচনা সম্ভবপর হয়' (Sita Ramachandram, 1996:25)।

৩.৫ বিদেশীতিতে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

এটা স্বাভাবিক যে, রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা যে কোন দেশের বিদেশনীতি গঠনের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। স্বৈরতান্ত্রিক, ফ্যাসিবাদী, একনায়কতান্ত্রিক অথবা সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যবস্থা বাদে যেখানে একটি মাত্র দল সমগ্র সরকারের পরিচালনায় এবং সিদ্ধান্তগ্রহেণর দায়িত্বে থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্রমোচ্চবিন্যস্ত স্তরের উচ্চাসীনে অবস্থান করে সেই সব দেশগুলি বাদ দিয়ে সর্বত্রই রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে সীমিতভাবে হলেও গুরুত্বপূর্ণ, যে ভূমিকা রাজনৈতিক দলগুলি পালন করে থাকে সেটি হল দলগুলি আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠায় যারা নেতা এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরকার এবং তার দলের অবস্থান সংসদীয় ব্যবস্থায় বদলায় না যতক্ষণ না ক্ষমতা থেকে ঐ দল এবং তার সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়ন করা হয়। আবার যখন রাষ্ট্রপতির প্রাক নির্বাচনী প্রস্তুতিতে বা দলীয় কনভেনশনগুলিতে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

হয়, তখন ঐ সম্ভাব্য প্রার্থীদের বিদেশনীতি বিষয়ক অবস্থানটি বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়। সংসদীয় ব্যবস্থাগুলিতে দলগুলির মধ্যেকার প্রতিযোগিতা প্রায়শই সরকার কি ধরণের বিদেশনীতি অনুসরণ করবে বা তার রূপরেখা কীরকম হবে তা নির্ধারণ করে দেয়? সরকারকে কেবল শাসক দলের বিদেশনীতি বিষয়ক মতামতটি বিবেচনার মধ্যেই রাখলে চলে না, বিরোধীদের মতামতকেও সমান গুরুত্ব দেয় (Frankel,: 81)।

যেসব দেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সব দেশগুলিতে দেশীয় নীতিগুলির ক্ষেত্রে তো বটেই বিদেশনীতিতেও মূল ইস্যুগুলিতে দুই দলের মধ্যে মতপার্থক্য ক্রমেই মুছে যাচ্ছে। ফলে, বিদেশনীতির ক্ষেত্রে তাদের মতপার্থক্যের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এই মতপার্থক্যহীনতার ব্যাপারটি গিলবার্ট ও সুলিভান অপেরার অমর সঙ্গীতের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। সঙ্গীতটি নিম্নরূপ:

'I often think it's comical
How nature always does contrive
That every boy and every gal
That's born into the world alive
Is either a little Liberal
Or else a little Conservative'

(W. S. Gilbert, *Lolanthe*, 1882, Act 2)

ইংল্যান্ডে লেবার পার্টির আগমনের আগে পর্যন্ত এরকম পরিস্থিতি ছিল। এর জন্মের পর রক্ষণশীল দলের সঙ্গে লেবার পার্টির আদর্শগত পার্থক্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তা তেমন বলার মত কিছু ছিল না। সত্য যে, আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রেণী সংগ্রামের সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের নিষ্ঠ রেখে শ্রমিক দল সর্বদাই নিজেদের একটা আন্তর্জাতিকতবাদী ইমেজ উপস্থিত করায় প্রয়াসী ছিল। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছেন যে, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বা সহানুভূতিতে তেমন উষ্ণতা ছিল না। ১৯৫০-এর দশকে রক্ষণশীল এবং শ্রমিক দলের বিদেশনীতি বিষয়ে মতপার্থক্য খুব তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রমিক দল ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সুয়েজ খাল দখলের সিদ্ধান্তকে তীব্র সমালোচনা করেছিল; কিন্তু আবার, ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মধ্যে ঐকমত্য দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক কালে, ইউরোপের সমাজবাদী দলগুলির সঙ্গে এই দলটি সম্পর্ক প্রয়াসি হয়েছে। এখানে, ইউরোপীয় পার্লামেন্টে খুব সহজেই Progressive Alliance of the Socialist and Democrats-এর সদস্য হওয়া সম্ভব। বিপরীতে, রক্ষণশীল দল অনেক বেশি আতলান্তিকবাদী ইমেজ প্রদর্শন করে থাকে; যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্পর্কে স্থাপন আগ্রহী যেমন তেমনি কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী এবং তাদের ভিতর একধরনের ইউরোপীয় সন্দেহবাদ বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি অনাস্থা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পার্থক্যটিকে একটু বাড়িয়েই দেখানো হয়েছে। কারণ, আমরা যদি টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বাধীন ব্রিটেনের 'নব্য' শ্রমিক দলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানোর সিদ্ধান্তের বিষয়টি মাথায় রাখি তাহলে দেখতে পাব ২০০৩ সালে সাদ্দাম হুসেনের আক্রমণের সময় ঐ দল ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে বলে গোটা দেশকে ভুল পথে চালিত করেছিল। এটাকে আমরা একটি যাচাইযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে ধরতে পারি। এই সিদ্ধান্তের পরে যখন শ্রমিক দলের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে শুরু করেছিল তখনও রক্ষণশীলরা এই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারেনি। লিবারাল পার্টি এ বিষয়ে সংরক্ষণশীল মনোভাব যা 'ইস্যু পাবলিক' এর গরিষ্ঠ অংশের উদ্বেগকে প্রতিফলিত করেছিল, তা কেবল টোরি সাংসদের

সংখ্যার মানুষের উৎকণ্ঠাকেই বৃদ্ধি করে নি যেখানে সমর্থক এবং দলীয় কর্মীদের অস্বস্তি ঘিরেও তাদের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠার ভাব দেখতে পাওয়া যায় যে খামোকা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ভাবে একটা যুদ্ধে তাদের দেশকে টেনে আনা হয়েছে। কিন্তু, ডানকান স্মিথ একজন রক্ষণশীল নেতা হিসেবে, যিনি পরে ডেভিড ক্যামেরনের মন্ত্রিত্বের সময় স্বরাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন, তাঁর দলকে হীন চক্রান্তের কোন সুযোগই দেন নি। ইরাকে গণ বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যাপারে টানি ব্লেয়ারের উদ্বেগের ভাগীদার হয়েছিলেন। কার্যত, ২০১১ সালে ওয়াশিংটন সফরের সময় আমেরিকার প্রশাসনে তাঁর সহচর যুদ্ধবাজদের কাছে এটা স্পষ্ট করে দেন যে, আফগানিস্তানের পর লক্ষ্যের তালিকায় ইরাক দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তাই, হয়ত অনেক টোরি সাংসদ ব্লেয়ারকে সমর্থন করে থাকতে পারেন, কিন্তু তা করেছিলেন, ক্যামেরনের ভাষায় 'গজগজ করতে করতে, অসুখি হয়ে এবং অনুৎসাহের সঙ্গে (Bale, 2011:172)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার প্রশ্নগুলিতে বর্তমানে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলের মধ্যে তেমন কোন মতপার্থক্য নেই। এটা অস্বাভাবিক নয় মোটেই। বস্তুত, ম্যানার্স এবং হুইটম্যান যেমন বলেছেন, সমগ্র ইউরোপেই 'বিদেশনীতির রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারে দলীয় রাজনীতির' প্রাসঙ্গিকতা ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইস্যুতে এবং বিদেশনীতির লক্ষ্য বিষয়ে একধরনের দলীয় রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের উদ্ভব একটি বাস্তবতা। যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা এর উদ্ভূত পরিস্থিতি নয়, যে দ্রুততার সঙ্গে সাড়ে তিন দশকে এই বিষয়টি একটা দৃঢ়ীকৃত রূপ পেয়েছে সেটাই বিবেচ্য। উল্লেখিত বিশেষজ্ঞরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'There are smaller political parties and groups on the far left and far right of domestic EU political spectra (for example, the Communist Party in Portugal and Freedom Party in Austria), which hold more extreme views on foreign policy and EU issues.' আমরা এখানে যোগ করতে পারি যে, ব্রিটিশ জাতীয়তবাদী দল এবং যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা দলের নাম। তবুও বড় দলগুলি বিদেশনীতির প্রশ্নে ঐকমত্য হলেও সরকারি ঘোষণার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। ম্যানার্স এবং হুইটম্যানের মতে এর তিনটি কারণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম, নব্য উদারনৈতিক মতবাদ বা বাজার মৌলবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব যা ১৯৭০ এর দশকের পর থেকে শুরু হয়। এই মতবাদিক প্রভাব দলগুলির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিশ্বাস সমূহকে ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনকে এবং বিকল্প আদর্শগত ও রাজনীতির অবসানকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এবং তৃতীয়ত, 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বৈত সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নেওয়া—যার মধ্যে বাহ্যিক সম্পর্ক এবং CFSP' অথবা সাধারণ বিদেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতি পড়ে; এবং এটিই ইউরোপের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির আশা এবং ধারণাকে বদলে দিয়েছিল (Manners and Whitman, 2000:255)। এই ব্যাখ্যাগুলি যুক্তিযুক্ত। যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কিভাবে ১৯৮০-র দশকে থ্যাচারের সংস্কার পূর্বের ঐক্যমত্যকে ভেঙে দিয়েছিল যা শ্রমিক পার্টি এবং রক্ষণশীল দলের মধ্যে অর্থনৈতিক নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ১৯৯০-র দশকে থ্যাচারকৃত অর্থনৈতিক সংস্কার নতুন ঐক্যমত্যের উৎস হিসেবে কাজ করেছিল, কারণ শ্রমিক পার্টি থ্যাচারের দ্বারা আনীত পরিবর্তনের প্রায় বেশিরভাগটিকেই গ্রহণ করে নিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিদেশনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা নির্ধারিত হয় দ্বিদলীয়তা বা 'bipartisanship'-এর ভিত্তিতে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হোয়াইট হাউসের এবং কংগ্রেসে গণতান্ত্রিকদের উপর রিপাবলিকানদের দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল তথাপি এই দ্বিদলীয়তার বিষয়টি আমেরিকার বিদেশনীতির ব্যাখার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। এই দ্বিদলীয় দৃষ্টিভঙ্গির উৎসটি খুঁজে পাওয়া যায় ১৯৪০

এবং ১৯৫০-এর দশকে আমেরিকা যে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল তার মধ্যে। এবং সেই কারণেই বৈদেশিক বাপারে একটা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল মূলত জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। ১৯৪৭ সালে আর্থার ভান্দেনবার্গের ভাবগর্ভ উক্তিটি স্মরণীয়। তিনি বলেন, 'Politics stops at the water's edge.' যা কিনা ট্রুম্যান প্রশাসন দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। এর অর্থ ছিল যে আমেরিকা তাদের দেশের ভিতর যত অনৈক্যই দেখাক অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তারা একটা শক্তিশালী সংঘবদ্ধ জাতি হিসেবে তারা নিজেদের তুলে ধরবে। উপরে উল্লেখিত বাক্যবন্ধটির যথার্থ এবং সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই, কিন্তু এতে দুটি সুস্পষ্ট অথচ পরিপূরক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। প্রথমটিতে 'বৈদেশিক ব্যাপারে ঐক্যের' পর বিদেশনীতি-উদ্যোগে কতদূর অবধি দুই দলের সমর্থন করছে তার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে এই ঐক্য আনার ক্ষেত্রে প্রথাসমূহ এবং পদ্ধতির ভূমিকাটিকে দেখা হয়েছে। ম্যাককবির্মিকের (McCormick) মতে এর অর্থ হল বিদেশনীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং পরিণামের এক সহযোগ।

ঠান্ডা যুদ্ধের শুরুর সময় থেকে আরম্ভ এই দ্বিদলীয়তার অর্থ ম্যাককর্মিকের কাছে নিম্নরূপ:

- ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান এই উভয় দলের কাছেই বিদেশনীতির অনুরূপ লক্ষ্য ছিল: এগুলি হল, শক্তিশালী জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈশ্বিক ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা, এবং আপোষহীনভাবে কম্যুনিজমের বিরোধিতা করা।
- এই দ্বিদলীয়তা সেই সব 'নীতি কর্মসূচীকে বা policy plan'-কে এর অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা প্রত্যেক দলই ঠান্ডা যুদ্ধের সময় জাতীয় প্ল্যাটফর্মে তা অনুসরণ করেছিল।

অবশ্য, উল্লেখিত দ্বি-দলীলয়তার ব্যাপারে অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। এমনকি আদর্শায়িত সমৃদ্ধির সময়ও দুই দলের সহযোগিতার ক্ষেত্রে বৈদেশিক, সামরিক সাহায্যের এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ও বিভিন্ন বাণিজিক ইস্যুগুলিতে একটানা বিভাজন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে দ্বি-দলীয়তা দেখতে পাওয়া যায়; এবং ১৯৮০-র দশকের থেকে এই বিভাজনটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও অ্যাকাডেমিক গবেষণাতেও এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, বিদেশনীতির পরিণামের ক্ষেত্রে এই দ্বি-দলীয়তা আদৌ করা হয়েছিল কী না। এবং যে সময়ের মধ্যে রোনাল্ড রেগন রাষ্ট্রপতি পদে বসেন, বিদেশনীতি পুরোপুরি দলীয় ভিত্তিতে মেরুকৃত হয়ে পড়ে। আবার, ৯/১১-এর পরে বিদেশনীতি নিয়ে সহমত তৈরি হয়েছিল। কিন্তু, ইরাক যুদ্ধের পরে এই সহমতটি জনগণের ভিতর ও কংগ্রেসের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজিত হয়ে পড়ে (McCormick, 2010:473-88)

আমরা আমেরিকার রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকার আলোচনা শেষ করব সেসিল ভি ক্র্যাবের উচ্চারণকে এখানে উদ্ধৃত করে: 'The two important factors that may be expected to favor the achievement of bipartisan cooperation in foreign affairs are the non-ideological nature of American political parties and the absesnce of strict party discipline in Congress' (King, 1986:87)। তবুও এই পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার বিদেশনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেটা মনে রাখা জরুরী।

যেসব দেশে রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শহীন নয়, সেখানে পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের। পুর্বতন জার্মানি অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় জার্মান প্রজাতন্ত্রে ব্রিটিশ অথবা আমেরিকার মত দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা নেই। প্যাটারসন যেমন দেখিয়েছেন, এর কারণটি লুকিয়ে আছে জার্মানিকে বাইরে থেকে চাপিয়ে বিভক্ত করে দেওয়ার মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

উত্তরাধিকারের ফলশ্রুতিতে জার্মানিকে দ্বিবিভাজিত করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে; সেজন্যই সেখানে দ্বি·····য় ব্যবস্থা গড়ে ওঠা অসম্ভব ছিল। পরপর ক্ষমতায় আসীন জার্মান সরকারগুলিকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে তা বিবেচনা এব পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে বারংবার। তাই, ১৯৫০-এর দশকে SPD (Social Democratic Party) দল পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা করেছিল। একইভাবে, ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে CDU/CSU (Christian Democratic Party of Germany and Christian Socialist Union of Bavaria) পূর্বের দেশগুলির সাথে চুক্তির বিরোধিতা করেছিল; তাদের যুক্তি ছিল এই যে, চুক্তিগুলো শুধু অন্যায়ভাবে প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমিকতা নষ্ট করে দিয়েছি এবং পুনরায় সংযুক্তির বিষয়টিকে অহেতুক জটিল করে তুলেছিল। এছাড়াও প্যাটারসন উল্লেখ করেন, 'জার্মান ইতিহাস রচনায় একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মতবাদ দ্বারা নির্ধারিত বিদেশনীতির এক দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে' (1981:227-29)।

আধুনিক ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশনীতিতে সহমতের বিরুদ্ধে এত বেশি লেখার পরেও এই লেখক যোগ করতে চান যে, দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে আনার জন্যই রাজনৈতিক দলগুলির বিদেশনীতিতে একটা স্থায়ী আগ্রহ রয়েছে। রবার্ট পাটনাম মন্তব্য করেছেন যে, বিদেশনীতি হল একটি দ্বিস্তরীয় খেলার মিলন বিন্দু যেখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের একটা দ্বিস্তরীয় স্তরে যুগপৎ নিয়োজিত রাখে। এই স্তর দুটি হল: অভ্যন্তরীণ সমষ্টিকৃত স্বার্থের দ্বারা ক্ষমতার সন্ধানে নিয়োজিত থাকা এবং আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে 'দেশীয় চাপগুলির সন্তোষজনক নিরসনের তাগিদে প্রয়াসের সর্বোচ্চ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ব্যাপারে ক্ষতিকর পরিণামের যথাসম্ভব লাঘব ঘটানো' (Putnam, 1988: 434)।

৩.৬ বিদেশনীতিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা

এই বিভাগে আমরা বিদেশনীতি গঠনে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। পার্লামেন্টে/কংগ্রেস/জাতীয় সভা অথবা অন্যান্য কেন্দ্রীয় আইনসভার বিপরীতে আমলাতন্ত্র শাসন বিভাগের একটি অস্ত্র স্বরূপ, এবং বিদেশনীতি সহ সব ধরনের নীতি-প্রণয়নে এর ভূমিকা আছে. ম্যাক্স হেবার আমলাতান্ত্রিক বিষয়ক তাঁর আলোচনায় যুদ্ধের কয়েক দশক পূর্বে বিদেশনীতির প্রণয়নে প্রাসিয়ার আমলাতন্ত্রের ভূমিকার সঙ্গে রাজনীতিক দ্বারা চালিত ব্রিটিশ বৈদেশিক কার্যালয়ের একটি তুলনা প্রতিতুলনা টেনেছেন। তাতে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ 'Parliament and Government'-এ শেষোক্ত সুবিধার কথা বিবৃত করেছেন। ১৯২১ সালে *Gesammetle Politische Schriften* or Collected Political Miscellanies-এ প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে হেবার দেখিয়েছেন যে, উল্লেখিত সময়কালে জার্মান বিদেশনীতিতে যেসব ভয়ঙ্কর ভুলগুলি হয়েছিল তার বীজ সুপ্ত ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার নেওয়া ভুল নীতির মধ্যেই, 'which promotes ment with the *outlook of officials* (Bureaucrats) to positions where independent political responsibility is needed' (Beetham, 1985:78)। আজকের দিনে অবশ্য বিদেশনীতিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা সম্পূর্ণতই ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে যা দাবি করে নীতিমানবাচক বা আদর্শ তাত্ত্বিক বা normative theory-র বাইরে বেরিয়ে এসে একবোরে ভিন্নধর্মী গবেষণার।

বাস্তব অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণার দীর্ঘ ঐতিহ্য-স্রোতে প্রথম তরঙ্গাভিঘাতটি (First Wave) প্রকাশ লাভ করে ১০৬০-এর দশকে রাজার হিলসম্যান, স্যামুয়েল হান্টিংটন, মিশেল ক্রোজিয়ার, রিচার্ড নুস্টাউট (Richard

Neustadt) এবং ওয়ার্নার সিলিং (Warner Schilling)-এর রচনায়। এঁরা আমলাতন্ত্রের উপর আলোকপাত করে একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে বিদেশনীতিকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াসী হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'কেমনভাবে এবং কোন কোন উপায়ে প্রক্রিয়া নীতির বিষয়বস্তু (content) নির্ধারণ করে, অথবা কীভাবে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয় এবং সিদ্ধান্তের ধরণগুলিকে নিয়ন্ত্রণই বা করা হয় কেমন করে—তদ্বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি' প্রদান করা। তাঁদের রচনা থেকে আর্ট (Art) মোট পাঁচটি সুস্পষ্ট প্রস্তাবনাকে একত্র করেছেন, যেগুলি বিদেশনীতির বাখ্যায় আমলাতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটের প্রভাবটি তুলে ধরে। এই প্রস্তাবনাগুলির প্রথম চারটি উঠে এসেছে অভ্যন্তরীণ 'কাঠামোগত পরিস্থিতি বা প্রতিবন্ধকতা' থেকে যা বিদেশনীতির গঠনে প্রভাব ফেলে এবং পঞ্চমটি হল পূর্বের প্রস্তাবনাগুলি থেকে উদ্ভূত যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত (lofical corollary) যা প্রক্রিয়া সঞ্জাত নীতির বিষয়বস্তুর উপরে আলোকপাত করে থাকে। আমরা এখানে আর্টের থেকে একটু ভিন্ন ভাষায় অর্থাৎ নিজেদের ভাষায় উল্লেখিত পাঁচটি প্রস্তাবনার মূল বক্তব্যের উপরে আলোকপাতে প্রয়াসী হব।

- রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে কোন একজন ব্যক্তিকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নেওয়ার সামর্থ্যকে বোঝায়; ঐ সামর্থ্য না করলে হয়ত সেই ব্যক্তি উদ্দিষ্ট কাজটি করত ন। রাজনৈতিক ক্ষমতার জাতীয় সরকারী স্তরে বিস্তৃতভাবে বণ্টিত থাকে। এই অর্থে, ওয়াশিংটনেই সার্বভৌম বা একচিটায় ক্ষমতা কোন একটি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত নেই। খুব বেশি হলে, 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে পারে (Neustadt)।
- এই 'আধা-সার্বভৌম ক্ষমতাগুলির' (Schilling) মধ্যে নীতি-প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন অংশীদার থাকে যারা কোন নীতির প্রশ্নে তাদের কোন ইচ্ছা পূরণে তারা নিজেদের নিয়োজিত রাখবে তা তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান দ্বারাই নির্ধারিত হয়।
- এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থান ও তাদের দক্ষতার উপরই নির্ভর করে তাদের ক্ষমতা ব্যবহারের সীমিত সামর্থ্য। যেহেতু কোন নেতারই হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা নেই, এবং এই ক্ষমতাটি 'মূলত বাধা দানের ক্ষমতা (blocking power)', ক্ষমতার অংশিদারী কোন ব্যক্তি-নেতা যদি তার ইচ্ছা পূরণে সচেষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি-নেতা অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস সরানোর দায়িত্ব নিয়ে থাকে যে, সে যা পরামর্শ দান করছে তা তাদেরও সর্বোত্তম স্বার্থকে পূর্ণ করবে।
- সুতরাং, 'সরকারে বিদেশনীতি গঠনের বিষয়টি মূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, এমনকি যখন সম্পূর্ণভাবে সরকারের অন্দরে এটা ঘটে থাকে ভোটারদের দৃষ্টির আড়ালে; এবং এমনকি যখন নীতিগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সরকারের একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের বা এজেন্সির মধ্যে ঘটে থাকে' (Hisman)। বস্তুত, এটা সম্পূর্ণভাবেই আন্তরপ্রাতিষ্ঠানিক সহমত গঠনের প্রয়াস এবং একটি নীতির সমর্থনে অন্যান্য অশীদারদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা যাতে তারা এই প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।
- এই নীতি-গ্রহণ প্রক্রিয়ার জন্মবৃত্তান্তই এর পরিণামের পরিচয়বাহী যা নীতির বিষয়বস্তুকে প্রতিফলিত শুধু করে না, কোন প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে এটা গঠিত হয়েছে বা পারস্পরিক চুক্তির জন্য কী ধরনের মূল্য দিতে হয়েছে এবং লব্ধ নীতির সুস্পষ্ট গুণাগুণই বা কী তাও চিহ্নিত করে।

এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টিগুলি পাঠকদের নীতি-প্রক্রিয়ার নির্যাস ও তার পরিণাম সম্পর্কে সংবেদী করে তোলে। একই সঙ্গে তাদের সতর্ক করে দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অন্যান্য দেশের অনুসৃত নীতির পরিণামের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভুল শুধু নয়, ঐ সব দেশগুলির প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়ার অর্থ খুঁজতে

যাওয়াও অনুচিত। এবং তাদেরকে বিদেশনীতির রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, দেশী পরিবেশে লক্ষ্য এবং তা অর্জনের মধ্যে যে সংঘাত ও তার ভিতর সামঞ্জস্য বিধান, দরকষাকষি, আলাপ-আলোচনা, আপোষ এবং সহমত নির্মাণের তাৎপর্য লক্ষ্য করতে হবে বা তাকে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। তাঁরা যদিও 'politics stops at the water's age'—এই বাক্যটিকে গুরুত্ব দেন, তথাপি এটা মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না যে, এখানে পৌঁছনোর পথে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কারণ পথটি কিন্তু ঝটিকাপূর্ণ।

তবে যাই হোক, বিশেষজ্ঞগণ যা বলেছেন তাতে যতটা নীরবতা রয়েছে ততটা উচ্চকিত উচ্চারণ নেই; তাঁর যা অনুক্ত রেখেছেন তাকে নিম্নলিখিত উপায়ে বর্ণনা করা যেতে পারে।

- লবির গুরুত্ব এবং তাদের প্রত্যাশিত কার্যাবলীর সাপেক্ষে কংগ্রেসের ভূমিকা যদিও কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনের নীতি-উদ্যোগের প্রতি প্রতিক্রিয়ামূলক, তথাপি বিদেশনীতিতে কংগ্রেসের প্রভাবকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।
- নীতি-গঠনে অংশীদারিত্ব যাঁদের রয়েছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতের ক্ষেত্র, বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান এবং নীতি বিষয়ক আসন্ন সংঘাত সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের থেকেই উৎসারিত। বরং বলা যায় যে, পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ তাদের কৃত্য সম্পর্কে যে মৌলিক পূর্বামানগুলি উপস্থিত করেন তার তাৎপর্য যথেষ্ট। অবশ্য, কিছু কিছু সংঘাতের বীজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত থাকে। কারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে সাধারণ বা মামুলি সমস্যার ক্ষেত্রেও ভিন্নধর্মী স্বার্থ এবং প্রেক্ষাপটের জন্ম দেয়।
- নীতি-প্রক্রিয়ার প্রকৃতির আন্তর্জাতিক পরিবেশের যে ইমেজ বা ছবি অংশগ্রহণকারীরা উপস্থিত করে একটি নীতি-পচ্ছন্দের জায়গায় অন্য আরেকটি নীতি-পছন্দকে গুরুত্ব দেন তা ঐ ইমেজকে গ্রাস করে না। কারণ, ইমেজটাই মৌলিক, প্রক্রিয়া সেখানে গৌণ।
- রাজনৈতিক নীতি-গঠন প্রক্রিয়ার পুরোটাই কখনও অনেকের বা সর্বাধিকের কাছে অনিচ্ছাকৃত নয়; যদিও একটা নীতিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য কি প্রয়োজন তা মাথায় রেখেই তাঁরা সচেনতভাবেই আপস করেন। বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীরা জানেন তাঁরা কি চান এবং তাঁরা একটি নীতরি পরিণামে কতটা বেশি পেতে পারেন, তা আলাদা বিষয়; এবং এইজন্যই সচেতনভাবে আপস করা হয়ে থাকে এবং প্রাথমিক চাওয়া বা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আপত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে অবিকৃত রাখেন।
- একটি নীতির রচনার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ামূলক দিকটিকে উপেক্ষা করতে পারেন না বিদেশনীতিতে দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলির প্রভাবের কথা ভেবে। এর মধ্যে নীতিকারদের নির্বাচনী প্রতিবন্ধকতা এবং নির্বাচকদের কাছে তাদের দায়বদ্ধতার বাপারটিও অন্তর্ভুক্ত (Art, 1973: 467-72)।

এই বক্তব্য এবং 'প্রথম তরঙ্গাভিঘাতের' নীরবতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্ট আমলাতান্ত্রিক পথে বিদেশনীতির প্রক্রিয়াগত দৃষ্টিভঙ্গির 'দ্বিতীয় তরঙ্গাভিঘাতের' মধ্যেকার নতুনত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এখানে যা বলা হয়েছে তার সবটাই নতুন না, সেইহেতু আমরা দেখবার চেষ্টা করব 'দ্বিতীয় তরঙ্গের' তাত্ত্বিকরা নিজেরা এব্যাপারে কী বলছেন। এই গোষ্ঠীর গবেষকগণ, যাঁরা ১৯৭০ দশকেই সর্বাধিক লেখালেখি করেছেন,তাঁরা টমাস কুনের (Thomas Kuhn) ভাষার বিদেশনীতির বিশ্লেষণকে 'স্বভাবিক বিজ্ঞান বা normal science'-এর পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তাত্ত্বিক বিবৃতির সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যাদি চিহ্নিত

এবং সাযুজ্যপূর্ণ করা হবে বলে ধরা হয়েছিল। কিউবার ক্ষেপণাস্ত্রর সংকটের উপর অলিসন লিখিত যুগান্তকারী গ্রন্থ 'Essence of Decision: Explainihg the Cuban Missle Crisis (1971)-এ এই নতুন তরঙ্গের সর্বোৎকৃষ্ট বিবৃতি মেলে। এই গ্রন্থে অ্যালিসন ঐ বিখ্যাত সংকটকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার কথা বলেচেন, যা একই সঙ্গে আমাদের সংবেদী ও অসংবেদনশীল করে তোলে এবং কতক ধরণের উপাত্তের প্রতি একধরনের ধারণাগত প্রায়ান্ধত্ব গড়ে তোলে। এর উদ্দেশ্য ছিল Rational Actor Model (RAM)-এর সীমাবদ্ধতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। এই Ratonal Actor Model-টি বিদেশনীতি বিশ্লেষণে সনাতনী, রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক অথবা একক হিসেবে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ বিবৃতি। 'বহু বিশ্লেষণ ও সাধারণ মানুষ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ঘটনাবলীকে একটি সংহত জাতীয় সরকারের কম বেশি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া হিসেবে... এবং তাদের লক্ষ্য ও পছন্দকে এর মধ্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য আরোপ করে দেখার' কারণে যে অসন্তোষ প্রকাশিত হয় এবং বিদেশনীতিকে 'সরকারী পছন্দ' হিসেবে দেখার প্রবণতার বিরুদ্ধে অ্যালিসন দুটি ভিন্ন বিকল্প উপস্থাপন করেছেন। এই বিকল্প দুটি বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিকেই বদলে দিয়েছিল। সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতাও যদি থাকে, তাহলে অ্যালিসন মনে করেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে বাতিল না করে তাঁরই দেওয়া সম্পূরক মডেল দিয়ে তত্ত্বটিকে জোরাল করা যেতে পারে। তাঁর এই তত্ত্বটি দু'নম্বর মডেল যা Organizational Process Mode (OPM) নামে পরিচিত এবং অপর মডেলটি অর্থাৎ মডেল নম্বর ৩ বা Bureaucratic Politics Model (BPM) নামে সুপরিচিত। শেষোক্ত মডেল দুটিতে দৃষ্টিকোণটি (frames of reference) সরকারি ব্যবস্থার প্রতি স্থানান্তরিত হয়েছে যেখানে স্নাইডারের আধুনিক পুনর্গঠিত সিদ্ধান্তগ্রহণ তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন সংগঠন এবং রাজনৈতিক এককসমূহ নীতি-প্রক্রিয়ায় সক্রিয়। দ্বিতীয় মডলেটি শুরু হয়েছে এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে যেখানে বলা হয়েছে যে, 'সরকার কতকগুলি আধা সামন্ততান্ত্রিক আলগা ভাবে সংযুক্ত সংগঠনের সমাহার যাদের প্রত্যেকের যথেষ্ট প্রাণশক্তি রয়েছে'। বিদেশনীতিকে এভাবে দেখলে বিদেশনীতি হল কেবলমাত্র 'কতকগুলি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের (নীতি-সিদ্ধান্তের) পরিণাম যারা একটা মান্য আচরণগত ধাঁচ মেনে তাদের কার্য নির্বাহ করে।' তারা কখনই সংহত সরকারি এককের যুক্তিযুক্ত বাহকযানের ভূমিকা পালন করে না। সমালোচকগণ যখন এই বলে আপত্তি করেন য মডেল২ এর সঙ্গে মডেল ৩-এর তেমন কোন পার্থক্যই নেই, তখন অ্যালিসন ১৯৭২ সালে মর্টন হ্যালপারিনের সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত 'Bureaucratic Polticis: A Paradigm and Some Policy Implications' শীর্ষক প্রবন্ধে পুর্বোল্লিখিত OPM মডেলটিকে BPM মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

সাংস্থানিক তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব যেখানে মডেল ২-এর মনোভঙ্গি ও অন্তর্দৃষ্টিকে নির্দেশ করে, অ্যালিসনের মডেল ৩, যাকে সরকারি অথবা আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক মডেল হিসেবে আখ্যাতি করা হয়ে থাকে, তার শিকড় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যেই প্রোথিত। RAM এর সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনা করে বলা যায় যে, BPM কেবলমাত্র একটি এককেন্দ্রিক যৌক্তিক এককের উপরই আলোকপাত করে না, একই সাথে অনেকগুলি একক অথবা কুশীলবের উপরে দৃষ্টি দেয় 'যারা কোন কেটি মাত্র কৌশলগত ইস্যুর উপর নজর না দিয়ে অনেক বিচিত্র আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি দেয়; কুশীলবদের কেউ কেউ কোন সামঞ্জ্যপূর্ণ একগুচ্ছ লক্ষ্যের ভিত্তিতে কাজ না করে জাতীয়, সাংগঠনিক এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যসমূহের বিভিন্ন ধারণার ভিত্তিতে তাদের কার্যপরিচালনা করে; (আবার) কোন কোন কুশীলব সরকারি সিদ্ধান্ত কোন একটিমাত্র যৌক্তিক পছন্দের মাধ্যমে না নিয়ে টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে, যাকে রাজনীতি বলা হয়, নিয়ে থাকে।' BPM অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি প্রচলিত পার্থক্যকে এড়িয়ে যায় এবং দাবি করে যে বৈদেশিক রাজনীতির মধ্যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বহু

চিহ্নিতকারী পাওয়া যায়। সেই জন্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক বৌদ্ধিক হাতিয়ার এবং দৃষ্টিভঙ্গি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সহজেই অনুমেয় যে, বিদেশনীতিকে এখানে সরকারি পছন্দ বা সাংগঠনিক পরিমাণ-কোনভাবেই না দেখে কুশীলবদের মধ্যে দরকষাকষির ক্রীড়া হিসেবে দেখে। অ্যালিসন মনে করেন, 'মডেল ৩ বিশ্লেষক' বিদেশনীতি দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় যখন তিনি বলেন, 'who did what to whom that yielded the action in question'.

এটা দেখা যেতে পারে, BPM এ বৃহৎ আমলতান্ত্রিক সংগঠনের সমাহারের সাথে একাধিক একক বা কুশীলব বিদেশনীতি তৈরি করে। বিদেশনীতিতে মূলত দুটি কারণে BPM প্রাসঙ্গিক:

- এঁরা তাঁরাই যাঁরা পরিণামের জন্ম দেয় যা পরিস্থিতিকে একটা আকার দিয়ে থাকে যেখানে নীতিকাররা সিদ্ধান্তগত ক্রীড়ায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে। এই পরিণামগুলি হল: সরকারকে আমলাতন্ত্রের যোগান দেওয়া তথ্য, সরকারের পছন্দ করবার মত বিদেশনীতির বিকল্পগুলির উপস্থাপনা; এবং মান্য কার্য নির্বাহী (standard operating procedures) পদ্ধতিগুলি যা বিদেশনীতি-সিদ্ধান্তের রুপায়ণের কাঠামো বা তার ধরণটি নির্ধারণ করে।
- আমলাতন্ত্রগুলির মধ্যে একটা সাধরাণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ইমেজ গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়, বিদেশনীতিকাররা কিভাবে একটা নীতি সম্পর্কিত প্রশ্নকে বা ঘটনাকে দেখবেন তা নির্ধারণে বিরাট ভূমিকা পালন করে। নীতি গঠনের ক্ষেত্রে কোন বিদেশনীতি বিষয়ক ঘটনাকে পর্যালোচনা করার সময়ে আমলাতন্ত্র নিয়মিতভাবে তাদের ঐ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইমেজের প্রিজম চাপিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একই ঘটনাকে ট্রেজারি বাজেটের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, প্রতিরক্ষা বিভাগ দেখে জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টভঙ্গি থেকে এবং বৈদেশিক সচিবালয় দেখে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এছাড়া, 'where do you stand depends on where do you sit'-বার বার উচ্চারিত সত্য কথনের—যা একজন আমলারই উচ্চারণ ট্রুম্যান প্রশাসনে থাকাকালীন, এবং বিখ্যাত Mile's Law অনুসারে আমলাতান্ত্রিক প্রভাবের উৎস হল রাষ্ট্র এবং সরকারের ক্ষমতা-কাঠামোয় তাদের অবস্থান থেকে। এইসব অবস্থানে থাকা আমলাদের কিছু অন্তর্নিহিত স্বার্থ থাকে, তা জাতীয় বা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বৃদ্ধিই হোক বা তাদের সম্পদ বৃদ্ধি হোক অথবা তাদের ঘোষিত লক্ষ্য পূরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি উদ্যোগ তাদের নিজেদের মধ্যে কদর বা সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এই স্বার্থগুলি সংগঠন হিসেবে আমলাতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে একই হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সেই জন্যই জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক স্বার্থের বৈরিতার সৃষ্টি হতে পারে বা তাদের স্বার্থ জাতীয় স্বার্থকে override করতে পারে। পৃথক পৃথক রাষ্ট্রের বিদেশনীতির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেই কেবল BPM প্রাসঙ্গিক নয়, আন্তর্রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও এটা প্রাসঙ্গিক (White in Taylor, 1984: 153-55; Alden and Ammon, 2012:31-33)।

প্রেস্টন এবং হার্ট নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে BPM এর কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

১) নীতি গঠনের আলোচনা পরিধির ক্ষেত্রে বহু আমলাতান্ত্রিক এককের উপস্থিতি (কাঠামো)

২) এই এককগুলির বিচিত্রধর্মী এবং সংঘাতময় স্বার্থ রয়েছে; তারা একে অপরের সঙ্গে বহু সংখ্যক খেলার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োজিত থাকে, যেখানে অনৈক্যের ক্ষেত্রগুলিতেও সহযোগিতা প্রয়োজন হয় ভবিষ্যতের নীতি মিথষ্ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার কারণে (কাঠামো)।

৩) এই এককগুলির মধ্যেকার ক্ষমতার সম্পর্কটি বিক্ষিপ্ত ধরনের; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কিছু কিছু

প্রাতিষ্ঠানিক, আমলাতান্ত্রিক, ক্ষমতার বৃত্তে থাকা এককরা নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রেক্ষিতে অন্যান্য এককদের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাবান। তারাই আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন ক্ষমতাশালী নন (কাঠামো)।

৪) এই মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে অনবরত 'টানাপড়েন এবং আকর্ষণ' ও দরকষাকষি চলতেই থাকে বিভিন্ন (গুচ্ছ গুচ্ছ) এককদের ভিতর (প্রক্রিয়া)।

৫) দর কষাকষি, কোয়ালিশন গঠন, এবং আপস তৈরির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত উপনীত হয় (প্রক্রিয়া)।

৬) সিদ্ধান্তের পরিণাম ক্ষণস্থায়ী বিচ্যুতের (উদাহরণ, সময়ের পার্থক্য এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে দেরি হওয়া) এবং নীতির বিষয়ের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির (উদাহরণ, নীতির বিষয়বস্তুতে সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে অদল বদল ঘটানো) ক্ষেত্রে একধরনের স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন করে থাকে (প্রক্রিয়া) (1999:55)।

BPM এর সবচাইতে ধ্বংসাত্মক আর অভিজ্ঞতাভিত্তিক সমালোচনাটি করেছেন আর্ট যাঁর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। অ্যালিসনের মডেলের ধারণাগত দিক হতে খামতিগুলির যে কথাগুলি তিনি বলেছেন তা আরো একটু বেশি করে জানার জন্য আমাদের একটু অগ্রসর হওয়া দরকার। কারণ, তাঁর যুক্তিশৃঙ্খল একটু জটিল প্রকৃতির। আর্ট অ্যালিসনের তৃতীট মডেলটির থেকে তিনটি প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছেন যা তার সমালোচনার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়।

- 'সাংগঠনিক অবস্থান নীতি অবস্থানকে নির্ধারণ করে, অথবা "where you tand depends on where you sit" [আমরা এর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি]।'
- 'বিদেশনীতিতে সরকারি সিদ্ধান্ত সমূহ এবং কার্যাবলী কোন একজন ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রকাশ করে না, বরং বলা যায় যে প্রধান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দরকষাকষি, টানাপড়েন এবং নানা ধরনের আকর্ষণ বিকর্ষণের অনিচ্ছাকৃত পরিণামই এগুলির পরিণতি প্রাপ্তি।' আরেকটি বিষয় যা এর পরিণতিতে ঘটে তা হল:

  'The sum of behavior of representatives of a government relevant to issue is rarely intended by any individual or group.'
- 'সাংগঠনিক রুটিন, SOPs, এবং কায়েমী স্বার্থ রাষ্ট্রপতির নীতি রূপায়নকে তার নীতি-গঠনের তুলনায় অধিক প্রভাবিত করতে পারে।

প্রথম প্রস্তাবনার ব্যাপারে আর্ট একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নটি হল: 'যদি প্রত্যেকটি ব্যক্তি "তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়", তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে অনুরূপ ক্ষমতা-অবস্থানে থেকেও কী অফিসের দায়িত্ব সম্পর্কে একই রকম ওয়াকিবহাল থাকবে? যদি তা না হয়, তবে নীতিগত অবস্থানে তাদের অবস্থানের আপেক্ষিক গুরুত্ব কি হবে? আমাদের সরকারি আমলাতন্ত্রে একেবারে উচ্চাসনে অবস্থানরত আমলাদের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এই অবস্থানগুলিই কী বাধার সৃষ্টি করছে? যদি 'প্রবীণ অংশগ্রহণকারীরা' নীতি প্রক্রিয়ায় সবথেকে শক্তিশালী অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকে, তথাপি যদি বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের অবস্থানের সঙ্গে সাংগঠনিক সংযুক্তির আন্তঃসম্পর্ক না গড়ে ওঠে তাহলে প্রথম প্রস্তাবনাটির বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎবাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা কিছু কি থাকে?

দ্বিতীয় প্রস্তবনার ক্ষেত্রে আর্টের মন্তব্য হল এই যে, 'একটা মৌলিক অর্থে আমাদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় যা ঘটতে থাকে তার বর্ণনা হল এই প্রস্তাবনাটি। কোন বিশ্লেষকই এটা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, কোন একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে প্রধান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে টানাপড়েন, দরকষাকষি বা প্রবল টানাটানি চলতেই থাকে।' কিন্তু যে প্রশ্নটির কোন উত্তর পাওয়া যায় না তা হল: 'এই টানাপড়েন, দরকষাকষি বা প্রবল টানাটানি

ঠিক কতটা পার্থক্য গড়ে দেয়; অথবা আরেকটু সতর্কতার সঙ্গে দেখলে, এটা বলা যায় ঠিক কোন পরিস্থিতিতে বা কোন কোন ইস্যুগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্ত (টানাপড়েন জনিত) বিশৃঙ্খলা বাস্তবকিই তাৎপর্যপূর্ণ পর্থক্য তৈরি করে'।

আর্ট আরও মন্তব্য করেছেন যে, বিদেশনীতি গঠনের ব্যাখ্যায় আমলাতান্ত্রিক প্যারাডাইমটি তখনই কেবল বেশি করে প্রয়োগযোগ্য হয়ে উঠবে যখন এটি পূর্বানুমান দিয়ে শুরু হবে যে, রাষ্ট্রপতির পছন্দ সমূহ এমন কিছু বিরাটভাবে প্রবীণ প্রশাসকদের নিজেদের পছন্দ বাছাইকে নিয়ন্ত্রিত করে না। কিন্তু, এই প্যারাডাইমটি কোন কাজেই আসবে না যদি আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কিত সংশোধনীগুলি এর মধ্যে খাপ খাইয়ে নিই। কারণ, যেই আমরা সংশোধনীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করি, সঙ্গে সঙ্গে একটা লজিক আমাদের দুটি অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করে যা দ্বিতীয় প্রস্তাবনার উপযোগিতাই নষ্ট করে। এই অনুসিদ্ধান্তগুলি হল:

- যখন প্রবীণ প্রশাসকরা নীতি অবস্থানগত দিক হতে বিভাজিত হয়ে পড়েন তখন রাষ্ট্রপতি এই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে তাঁর পছন্দমত কাজ করিয়ে নিতে পারেন এবং যথেষ্ট লাভ হাসিল করে নিতে পারেন।

আবার যখন প্রবীণ প্রশাসকরা নীতিগত অবস্থানের ক্ষেত্রে বিভাজিত হয়ে পড়েন তখন আমলাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন কি না তা বিবেচনা করবেন এই ভিত্তিতে যে, যে দাবিগুলি মেনে নিলে তাঁর রাজনৈতিক দিক থেকে কোন ক্ষতি হবে না।

প্রথম অনুসিদ্ধান্তে একটা পুরানো ভাগ কর এবং শাসন কর-এর অস্বস্তিকর প্রতিধ্বনি শোনা যায় যেখানে বিদেশনীতিতে রাষ্ট্রপতির নমনীয়তা রক্ষিত হয়। দ্বিতীয়টিতে এই বিষয়টিকে গুরত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় যে, প্রবীণ আমলাদের পছন্দগুলিই কেবল গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কংগ্রেসের কোন সদস্যগণ আমলাদেরকে সমর্থন যোগাচ্ছে তা চিহ্নিত করাই রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ। গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় আমলাতন্ত্রকে দ্বিতীয় প্রস্তাবে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শাসন বিভাগ থেকে রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন তার মাধ্যমে প্রথম প্রস্তাবনাটি দ্বিতীয় প্রস্তাবনার দাবিগুলিকেই অনিশ্চিত করে তোলে। এক্ষেত্রে, আর্টের মন্তব্যটি উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'By reminding us of the President's need to anticipate the Congressional reactions that stem from the sharing of powers, corollary two makes us dubious of the unintended aspect of proposition two.'

আর্ট দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটির অন্যান্য সমস্যাগুলির দিকেও নির্দেশ করেছেন যা আমাদের বাধ্য করে 'সরকারের অভ্যন্তরীণ কার্যবিধির' থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি বাহ্যিক বাধাগুলিকে কভীবে দেখছেন তা বিবেচনা করতে। এই প্রশ্নগুলি হল: (১) কত ঘন ঘন এবং কি ধরনের ইস্যুতে অংশগ্রহণকারীরা নীতিগত অবস্থানের বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন? (২) রাষ্ট্রপতির নীতি পছন্দের ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীরা প্রায়শই কি সমস্বরে প্রতিবাদ করে থাকেন? (৩) একটি নীতির রূপায়নের জন্য নেওয়া কার্যের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা কোন কোন ইস্যুতে এবং কত ঘন ঘন ঐক্যমত্যে পৌঁছন না? আর্টের মতে, এই 'জিজ্ঞাসাগুলি পুনরায় বিদেশনীতির গঠনে মানসিক গঠনের তাৎপর্যের প্রশ্নটি উত্থাপন করে। যদি নীতি সম্পর্কিত ইমেজটিতে প্রবীণ অংশগ্রহণকারীদের মতামতটিই কেবল গুরুত্ব পায়, এবং তা যদি প্রকৃতই যৌথ চিন্তার ফসল হয়,' তবে সেখানে 'এটা বলার কোন অর্থই হয় না যে, সরকারি ক্রিয়া টানাপড়েন, প্রবল টানাটানি এবং দরকষাকষির ফল।'

আর্ট উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলির বিমূর্ত উপায়ে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ বলে মনে করেন। কারণ, বিশেষ করে শেষ দুটির ক্ষেত্রে উত্তর দুটি বিশেষ পরিস্থিতির দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয় এই জন্য যে ঐ পরিস্থিতিতে নিহিত সিদ্ধান্তের প্রশ্নটি বিবেচনার মধ্যে থাকে। এতদসত্ত্বেও আর্ট তিনটি সাধারণ যুক্তি উপস্থাপন করেছেন একটি যথাযথ ধারণা কাঠামোর মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবনাটির তৎপর্য বোঝাতে চেয়েছেন। প্রথম যুক্তিটি হল এই যে, 'একটি নীতি পছন্দ কীভাবে রূপায়িত হচ্ছে তার চেয়েও প্রাথমিকভাবে পছন্দ করার কাজটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতির পছন্দ এবং সংগঠনগত রূপায়নের পরিণামের মধ্যেকার 'ফারাক বা slippage' যথেষ্ট সেই ইস্যুগুলিতেই হবে যেসব বিষয়ে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আগ্রহ নিতান্ত কম বা রাষ্ট্রপতি সেই ইস্যুগুলিকে প্রায় গুরুত্বহীন বলে বিবেচনা করেন। আর্ট দাবী করেন যে, এই যুক্তিটি হল তৃতীয় প্রস্তাবনাটির যৌক্তিক পরিণাম যার অর্থ হল 'সংস্থাগত পদ্ধতি ফারাক বা slippage ঘটাতে পারে, কিন্তু তারা স্বতঃই বা যান্ত্রিক উপায়ে এটা ঘটায় না।' বরং, যদি এটা ঘটিয়েই থাকে অথবা ঠিক কতদূর অবধি তারা এই বিষয়ের জন্য দায়ী থাকে তা প্রবল ভাবে নির্ভর করে 'রাষ্ট্রপতির দৃঢ়তার মাত্রার' উপর, মানে তিনি ঠিক কতটা ঐ ফারাক বা slippage-কে অনুমোদন করবেন। আর্ট দেখিয়েছেন, slippage-এর ব্যাপারটি 'is inversely correlated with a Presidential commitment to make his decision stick', এবং এটি অ্যালিসনের কিউবার ক্ষেপমাস্ত্র সংকটের উপর গবেষণায় প্রমাণিত; যেখানে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বিপরীত পারস্পরিক সম্পর্কের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় প্রশ্নের বিষয়ে আর্ট জোরের সাথে বলেছেন যে, সমস্ত ধরনের নীতি বিষয়ের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই রূপায়ণগত শৈথিল্য ক্ষতিকারক বা সমপরিমাণে পরিণাম নির্ধারণ নয়। ১৯৬৭ সালে লিন্ডন জনসন গৃহীত ABM system নিয়োগ করার সিদ্ধান্তের মত কিছু সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে সদর্থকভাবে বিবেচিত হয়েছিল। এখানে রূপায়নের খুঁটিনাটি গৌণ এবং slippage-এর প্রশ্নটি অপ্রসাঙ্গিক। কিন্তু আবার কিছু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রূপায়নের ফারাকটি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় যদি না রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু, উপরে উল্লেখিত তৃতীয় ধরনের সিদ্ধান্তের প্রশ্নে রাষ্ট্রপতিকে স্বেচ্ছায় রূপায়নের ক্ষেত্রে শৈথিল্যকে অনুমোদন করতে এবং সিদ্ধান্তের মধ্যে অস্পষ্টতা রেখে দিতে দেখা গিয়েছিল, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কেনেডি ও জনসনের বহুপাক্ষিক পারমাণবিক শক্তির বা MLF (Multilateral nuclear force) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে।

আর্ট এই দাবী করেন না যে, তাঁর উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ BPM এর প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবনাকে বাতিল বলে গণ্য করে, কিন্তু 'দৃষ্টিভঙ্গিটির অভ্যন্তরীণ যুক্তি শৃঙ্খলা এবং তার লজিকের তাৎপর্য বিষয়ে গুরুত্বর সন্দেহ জাগিয়ে তোলে।' যদি সত্য সত্যই যুক্তিগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তবে সমগ্র প্যারাডাইমটি উপর্যুক্ত দুটি দিক থেকেই দুর্বল বলে পরিগণিত হবে। সেইজন্য এই তত্বটি যাচাই করার জন্য 'it is necessary to examine the record of American foreign policy by issues area in order to determine the fit of the paradigm to the record.' এই প্রয়াসের মধ্যে না গিয়ে, আর্ট এখান যেটা করেছেন সেটি হল, (ক) ইস্যুগুলিকে তিনটি বর্গে পছন্দ করে ভাগ করেছেন: (১) 'সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত'; (২) 'সেইসকল সিদ্ধান্ত যা বড় ধরনের নীতি পরিবর্তনকে সূচিত বা চিহ্নিত করে'; (৩) 'মুখ্যত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা সিদ্ধান্ত সমূহ'। প্রথম বর্গে তিনি ১৯৫০ সালের জুন মাসে কোরিয়ার, ১৯৬১-৬৫ সালের মধ্যে ভিয়েতনামে, ১৯৬২ সালে কিউবার এবং ১৯৬৫-তে এপ্রিল মাসে ডোমিনিকাল রিপাবলিকে সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তগুলিকে রেখে আলোচনা করেছেন। এই সবগুলি ক্ষেত্রেই

রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমলাদের সম মানসিকতা লক্ষ্যণীয়; এই সম মানসিকতার বিষয়টি সিদ্ধান্তগুলিকে 'অসিদ্ধান্ত' বা 'non-decisions'-এ পরিণত করে। দ্বিতীয় বর্গে, আর্ট সেইসব সিদ্ধান্তগুলিকে রেখেছেন যেগুলি আমেরিকার বিদেশনীতিতে অতীত থেকে সরে এসে মৌলিক প্রস্থান বিন্দু সৃষ্টি করার এক তাৎপর্য মণ্ডিত সূচনাকে নির্দেশ করেছিল। এই সিদ্ধান্তগুলি হল:' 'ট্রুম্যান ডক্ট্রিন, মার্শাল প্ল্যান, ন্যাটো চুক্তি, ব্যাপক প্রত্যাখ্যাতের সিদ্ধান্ত, নমনীয় প্রতিক্রিয়া, ১৯৭২ সালের রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে দাঁতাত এবং SALT-I চুক্তি'; এর সঙ্গে স্পষ্ট হয়েছিল রাষ্ট্রপতির পছন্দের সঙ্গে আমলাদের সমজাতীয় মানসিকতা যা আসলে আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিকে অবান্তর ও তাৎপর্যহীন করে তুলেছিল। এই দুই ধরনের সিদ্ধান্তের বিপরীতে আর্ট তৃতীয় বর্গের সিদ্ধান্তগুলিকে রেখেছেন। সদ্যোল্লেখিত দুটি বর্গে রাষ্ট্রপতির এবং আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিদ্ধান্ত বিষয়ে একটা বড় ধরনের ঐক্যমত্য দেখা গিয়েছিল। আর্টের তৃতীয় বর্গে সেইসব সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে, 'those have direct, immediate, clearly predicatble results for the structural set-up of nstitutions and for their long term prosperity-those decisions which we may call the 'bead and butter choices' relevant for the long-term competitive position of an institution.' আর্ট এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার ক্ষমতার ভাগাভাগি খুঁজে পেয়েছেন। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে থাকে 'সামরিক চাকুরীর ভূমিকা ও লক্ষ্য,... বৈদেশিক চাকুরিতে অথবা সামরিক উর্দিতে উন্নতির সুযোগ, বাজেটে বণ্টনগত সিদ্ধান্ত অথবা সেইসব সিদ্ধান্ত যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানগুলি যারা তাদের দায়িত্বে থাকা কাজগুলি পালন করে থাকে; এই কাজগুলির মধ্যে পড়ে সামরিক পরিষেবার সঙ্গে সম্পর্কিত লক্ষ্য ও ভূমিকা পূরণে অস্ত্র ব্যবস্থাকে তৈরি রাখা'।

এই সব যুক্তির সাহায্যে আর্ট BPM-এর দুটি মৌলিক দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি হল 'কীভাবে একেবারে উচ্চতম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা বিদেশনীতিকে দেখেন এবং তাঁদের উপর প্রজন্মগত মানসিক গঠন ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির-এই উভয়ের প্রভাব কীভাবে পড়েছে'—এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করা হয় নি। দ্বিতীয়টি হল এর 'এলোমেলো, অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট' প্রকৃতি 'যা নির্মিত হয়েছে এর ব্যবহারকে কোনমতে উল্লেখযোগ্য করে তোলা'। আর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি হল, 'অ-আমলাতন্ত্রিক প্রকৃতির অতি বেশি বাঁধাগুলিকে' প্যারাডাইমটিকে সচল করার আগে অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে; এবং আর্ট মনে করেন, এটি করার পড়েও প্যারাডাইমটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাখ্যার কাজে তেমন কিছুই কাজে আসে না (Art, 472-86)।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞ গবেষকরাও BPM মডেলটির আমেরিকার প্রেক্ষিতে সমালোচনা করেছেন। স্টিফেন ক্রাজনার এই মডেলটিকে বিভ্রান্তকারী, বিপজ্জনক ও বাধ্যতাজনক বা compelling বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'বিভ্রান্তকারী এই কারণে যে, এটি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে অস্পষ্ট করে তোলে; একে বিপজ্জনক বলা হয়েছে এই কারণে যে, এই মডেলটি গণতান্ত্রিক রাজনীতির পূর্বানুমানগুলিকে উচ্চপদাসীন কর্মচারীদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়র উদ্দেশ্যে খাটো করে দেখে; একই সঙ্গে, এই মডেলটি ব্যবহার করে নেতারা তাঁদের ব্যর্থতা ঢাকার সুযোগ যেমন পেয়ে যেতেন, তেমনই আবার বিভিন্ন গবেষকরা অসংখ্য ধরণের ব্যাখ্যা পুনঃব্যাখ্যার এবং সেই সঙ্গে অগণিত প্রবন্ধ প্রকাশের সযোগ পেয়েছেন' (Krasner, 1972:160 and passim) লরেন্স ফ্রিডম্যান পদ্ধতিগত দিক থেকে বিবেচনা করে প্রশ্ন তুলে বলেছেন যে, মডেলটি লজিক ও রাজনীতির মধ্যে অনাবশ্যক বিভাজন রেখা টেনে RAM এবং BPM এর মধ্যে একটা ভ্রান্ত বা মিথ্যা পার্থক্য দেখিয়েছেন (1976:434-49)।

এতদ্‌সত্ত্বে, BPM মডেলটির সমর্থকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তেহেরানে আমেরিকার পণবন্দী উদ্ধার

লক্ষ্যের (American Hostage Rescue Mission) পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে যখন ছাত্র বিপ্লবীরা আমেরিকার দূতাবাস দখল করে নিয়েছিল, স্টিভ স্মিথ সংকটকালীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই মডেলটির প্রয়োগযোগ্যতা দেখিয়েছিলেন। তিনি দেখান, ১৯৮০ সালের ২২ মার্চ, ১১ এপ্রিল এবং ১৫ এপ্রিল—এই তিনটি সভায় একটি নির্বাচিত গোষ্ঠীর মানুষেরা যে সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিলেন, তা 'অংশগ্রহণকারীদের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় যে অবস্থান গ্রহণ করেন তার স্থানিকতাকে সূচিক করেছিল' (Smith, 1984-85:9-25)। একই সঙ্গে মডেলটিকে পুনঃসঞ্জাত করে আরও একটু সূক্ষ্ম করে তোলার মাধ্যমে বাস্তবের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করে তোলবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রেস্টন ও হার্ট ১৯৫০ সালে কোরিয়ার সংকটের সময় রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্তের বিষয়টিকে এই মডেলটি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই মডেলটির তাত্ত্বিক প্রয়োগযোগ্যতার অভাবের কথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার ক'রে এবং এই দুর্বলতার জন্য প্রধানত আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিকে স্বাধীন চল হিসেবে গণ্য করাকে দায়ী ক'রে স্মিথ আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিকে নির্ভরশীল চল হিসেবে দেখার জন্য দাবি তোলেন এবং মডেলটির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি দেবার জন্য সকলকে আর্জি জানান। তাঁর মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন গবেষক 'নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যের (নিয়ন্ত্রণ ও প্রেক্ষিতের প্রতি স্পর্শ কাতরতরা প্রয়োজনটি মাথায় রেখে) বিশেষ প্রশাসনের মধ্যে আমলতান্ত্রিক রাজনীতির প্রকৃতির উপর প্রভাবের বিষয়টি খুঁজে দেখতে পারেন'। তাঁর মতে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব পরিচালনা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের এবং মাত্রার আমলতান্ত্রিক রাজনীতির জন্ম দিয়ে থাকে। এটা দেখানোর জন্য, প্রেস্টন ও হার্ট একটা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়ে লিন্ডন জনসনের নেতৃত্বের ধরণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগ্রহণের উপর আলোকপাত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা দেখিয়েছেন কতদূর অবধি 'জনসনের পরিমাপযোগ্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য' 'পরামর্শদানমূলক ব্যবস্থা কাঠামো ও প্রক্রিয়া সমূহ'কে একটা রূপ দান করে, যা আবার গভীরভাবে 'তথ্য প্রক্রিয়াকরণ', ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ভিয়েতনামের ব্যাপারে পরামর্শদানের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃতি' (53-98)-কে প্রভাবিত করে।

কিছু BPM মডেলের সমালোচক যুক্তি দিয়েছেন যে, আমেরিকার বিদেশনীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই মডেলটি প্রয়োগযোগ্য হতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এই মডেলটির প্রায়োগিক দিক নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। আমরা আমেরিকার পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করেছি দুটি কারণে: বিদেশনীতি-সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমলাতন্ত্রের ভূমিকাটি সবচাইতে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় আমেরিকার ক্ষেত্রটিকে আলোচনা করলে।

- এমনকি অ্যালিসনের মডেলের সুপরিচিত সমালোচক ডবলু. ওয়ালাসও নীতি-প্রণয়নকারী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কাঠামোর নীতি অভিমুখের আন্তঃসম্পর্কটির' প্রতি নির্দেশ করেছেন। ওয়ালাস সেই প্রশাসনিক অঙ্গগুলির অনমনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন যা নীতিকে প্রভাবিত করে এবং সাংস্থানিক বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যা করলেন যা রাজনৈতিক দিক থেকে উপেক্ষিত এবং তার দিসার প্রতি প্রতিক্রিয়ার তীব্রতাকে লঘু করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে সাংগঠনিক আনুগত্য, দৃঢ় নিবদ্ধ রুটিন কাজ, ঐতিহ্য, এবং প্রবহমানতার প্রতি অনুরাগ, মর্যাদা সম্পন্ন কূটনৈতিক পরিষেবার অন্তর্নিহিত তাড়না এবং তদ্‌জনিত আচরণের বিধি যার থেকে জন্ম নেওয়া দৃপ্ত মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত। ওয়ালাস যখন এধরনের কথা বলেন, তখন তিনি আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির সম্পর্কে ন্যূনপক্ষে একটি নরম মন্তব্য করেন বিদেশনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকার ব্যাপারে। এটা বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি উল্লেখ করেন 'the high morale and prestige of the Beritish Civil Service, and its successfull resistance to they by-

passing of its regular procedures by political channels, makes the problem of organizational inertial particularly actue for policy-makers in Britain' (Wallace cited by White, 1974:154)।

৩.৭ বিদেশনীতিতে স্বার্থগোষ্ঠী সমূহের ভূমিকা

এই বিভাগে আমরা যে কোন দেশের বিদেশনীতিতে স্বার্থ গোষ্ঠাগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আমরা 'স্বার্থ গোষ্ঠী' এবং 'চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী'-র ধারণা দুটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই অর্থে ব্যবহার করব, কারণ বিদেশনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় অথবা এমনকি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বের আলোচনায় ঐ দুটি ধারণাকে একই অর্থেই প্রায়শই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যে কোন দেশের বিদেশনীতিতে স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকা আলোচনার ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় সমস্যা হল এর বিপুল সংখ্যা, বিচিত্রতা আরতার থেকে সৃ,ট শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা। এস ই ফাইনারের যুগান্তকারী গ্রন্থের শিরোনামটিই শ্রেণীবিভাজনের সমস্যাটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থটির শিরোনামটি হল 'Anonymlus Empire: A Study of the Lobby in Great Britain'। জেমস ম্যাককর্মিক বলেন যে, কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে তার একটি কারণ হল এই যে আমেরিকার বিদেশনীতি সাবেকী নিরাপত্তা জনিত সমস্যা থেকে সরে এসে অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক ইস্যুগুলিকে এর আওতাভুক্ত করেছে। এর ফলে, 'foreign policy interest groups have increased exponentially...because such groups often form, lobby, and then disband, it is diffuicult to track their exact number at any given time.' সেইজন্য, সংখ্যাগত তফাতটিও ব্যাপক। একটি হিসেব অনুসারে, গত দশকে ওয়াশিংটনে প্রায় ১১০০০ ফার্ম বা গোষ্ঠীকে বিভিন্ন লবি করতে দেখা গেছে এবং নীতি-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কাজে ১৭০০০ মানুষকে নিয়োজি থাকতে দেখা গেছে; এন জি ও গুলির বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ঐ সংখ্যাটিই ৫৬০০ থেকে ২৫০০০ এর মধ্যে, এবং এই সংখ্যাটি এমনকি এক লক্ষও হতে পারে, যদিও তাদের সকলের সঙ্গে বিদেশনীতির যোগ নেই (McCormick, 68-69)।

তবে যাই হোক, স্বার্ত গোষ্ঠীগুলির প্রকৃতির চূড়ান্ত বিচিত্রতা থাকা সত্ত্বেও এর শ্রেণী বিভাজন করাটা জরুরী। এবং এই শ্রেণী বিভাজনের সবচাইতে প্রথম তাত্ত্বিক প্রয়াসটি নিয়েছিলেন হ্যারল্ড স্প্রাউট। তিনি আমেরিকার বিদেশনীতিতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে দুটি বড় শ্রেণীতে বিভাজিত করেন। এগুলি হল: 'সরকারি বা official এবং 'অসরকারি' বা unofficial। এই সরকারি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যথেষ্ট তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির দাবী করে যেহেতু সাধারণভাবে আমরা সেইসমস্ত স্বার্থ এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির দিকে দৃষ্টি দিই যেগুলি সরকারের বাইরে থেকে তাদের প্রভাব কাটানোর চেষ্টা করে। কিন্তু স্প্রাউট মনে করেন যে, সরকারি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, বিদেশনীতি গঠনে তারা অপেক্ষাকৃতভাবে স্বাধীন ভূমিকা পালন করলেও 'একজন রাষ্ট্রপতি ও তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গকে নিরন্তর কংগ্রেসের লবির আর সরকারের প্রচারকের ভূমিকা পালন করে যেতে হয়।' এই জন্যই হোয়াইট হাউস এবং প্রশাসনিক বিভাগগুলিকে সংগঠিত প্রচার ব্যুরো গঠন ও তাদের অর্থ সাহায্য করে যেতে হয় প্রায়শই স্বরাষ্ট্র বিভাগের মধ্যেই। উদাহরণ দিয়ে স্প্রাউট উল্লেখ করেছেন, সাম্প্রতিক তথ্যের বিভাজনের বা Divison of Current Information-এর মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলা হয় 'জনমত তৈরির' জন্য। তাঁর চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সম্পর্কে

এই উদ্ভাবনী ধারণাকে আরও একটু প্রসারিত করে স্প্রাউট বলেন যে, 'একটি (সরকারি) প্রশাসনের অসরকারি চাপ সৃষ্টিকারীর উপর একটা কৌশলগত সুবিধা রয়েছে যা অদ্ভুতভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্ট।' আবারও উদাহরণ দিয়ে স্প্রাউট দেখিয়েছেন কেমনভাবে রাষ্ট্রপতি বা প্রধান শাসক এবং কংগ্রেস মতামতের উপর কঠোর সেন্সরশিপ বা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেজয় এবং প্রচার মূলক সংবাদ পরিবেশনে মনোযোগী হয়। তিনি প্রশাসনিক এবং আইনবিভাগীয় সাধারণ চাপের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং একই সহেগ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছেন, যদিও আমরা আমাদের আলোচনার গুরুত্ব লঘু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এখানে রাজনৈতিক দল নিয়ে আলোচনা করব না। পরিবর্তে, স্প্রাউটের বিদেশী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী যে Sub-type বা ছোট ধরণ—তার প্রতি নজর দেব সরকারি বর্গের মধ্যেই। ১৯৩০-রে দশকের প্রথামার্ধের আমেরিকার রাজনীতির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে স্প্রাউট মন্তব্য করেচেন যে ঐ বিদেশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যথেষ্ট প্রভাবশালী যার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় আমেরিকায় নাৎসি প্রচারের সরকারি এবং বেসরকারি কমিটির অনুসন্ধানের মধ্যে। স্প্রাউট মন্তব্য করেছেন আরও যে, 'সরকার থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসায়িক কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই বিদেশী চাপের উৎসগুলি রয়েছে', 'বিদেশী দূতাবাস বিদেশী কনস্যুলেট অফিস' থেকে শুরু করে বিদেশী 'সাংবাদিক, গবেষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ' প্রত্যেকেই বিদেশী চাপসৃষ্টিকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। স্প্রাউট বিদেশনীতিতে বিদেশী দূতাবাস এবং কনস্যুলেট অফিসের ভূমিকার বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। তাঁর কাছে অভ্যন্তরীণ দিক হতে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদেশী দুতাবাসগুলি ও কনস্যুলেট অফিশগুলি বিদেশী প্রচারের সুপরিচিত কেন্দ্র', তেমনি বিদেশী 'সাংবাদিকরা, স্কলাররা, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ' ও অভ্যন্তরীণ দিক হতে চাপ সৃষ্টি করে থাকেন; এমনিক 'আমেরিকার দূতাবাসের এবং কনস্যুলেট অফিসের আধিকারিকরা বিদেশী চাপের কেন্দ্রে থাকেন যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতামত ও নীতিকে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট থাকেন।'

কিন্তু স্প্রাউট যথার্থই ভেবেছেন যে, আমেরিকার বিদেশনীতি গঠনে চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বেসরকারি (unofficial) দেশীয় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির অনেক বেশি প্রাধান্য বজায় রাখতে সক্ষম, কারণ কেবলমাত্র সংখ্যার বিচার তারা স্বতঃই অধিক প্রভাব খাটানোর জায়গায় পৌঁছে যায়। এই বেসরকারি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা এতই বেশি আর তাদের ক্রয়ক্লাপের পরিমাণ এতই বিপুল যে, তাদের সম্পর্কে লিখতে গেলে অসংখ্য পৃষ্ঠা এবং কয়েক খণ্ডের প্রয়োজন হবে। সেই কারণেই স্প্রাউট কেবলমাত্র কয়েকটি বড় ধরনে তাদের ভাগ করে তাদের আলোচনা করেছেন। আমরা তাঁর আলোচনাটিকে নিম্নে উল্লেখ করছি।

- একটি 'সংগঠনের গোষ্ঠী যাদের মধ্যে কিছু অংশ অর্থনৈতিক দিক হতে সমৃদ্ধ এবং প্রচণ্ড প্রভাবশালী তারা হয় তাদের সম্পদের পুরোটা নতুবা একটা অংশ নিয়োজিত করে আমেরিকার আদর্শ ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার বা তার প্রতি শ্রদ্ধা লালন করার জন্য'। এইগুলি হল 'দেশাত্মমূলক সমাজ', 'প্রবীণদের সংগঠন', 'মূলত অর্থনৈতিক সংগঠন (যেমন, American federation of Labor)'. তারা বিভিন্ন প্রচারমূলক কাজে নিয়োজিত রাখে 'সাম্যবাদ এবং অন্যান্য বিদেশী মতাবদ'-এর প্রসার রোধের কাজে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যে কোনো ধরনের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বাধা দান, ক্ষতিকর, অ-আমেরিকান অধিবাসীদের নির্বাসিত করা, এবং বাইরের অনাহুত অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে শক্তিশালী অভিবাসন আইন জারি কররা পক্ষে সওয়াল করে থাকে।
- শিথিলভাবে সম্পর্কযুক্ত সংগঠনগুলি যাদের যৌথভাবে 'শান্তি আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তারা সাধারণভাবে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদ, সামরিক এবং নৌসেনার প্রস্তুতির সমালোচক।

তাদের কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।তাদের ভিতর কেউ কেউ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্যের মধ্যে একধরনের সামঞ্জস্য আনয়নের পক্ষপাতী।

- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, 'বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী সংগঠিত বা অসংগঠিত, যারা বিদেশে তাদের নিজ নিজ স্বার্থ পুরনের জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে,যদিও তাদের প্রকৃতিটি ধন্দ জাগায়'। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পড়ে আমদানি ও রপ্তানিকারকরা, ব্যাঙ্কার এবং উৎপাদকরা ফাটকা কারবারিরা জাহাজ শিল্পের সাথে যুক্তস্বার্থ গোষ্ঠীগুলি, এবং বিভিন্ন সমাজসেবামূলক ও মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান সমূহ'।
- এছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী সংঘ বা সংগঠন রয়েছে। জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলির মধ্যে 'একটা ব্যাপক সংখ্যক ব্যক্তি, ব্যববসায়িক কর্পোরেশনের এবং বাণিজ্য সংস্থার বিচিত্রধর্মী সমষ্টি বা সমবায়', যারা অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ছাতার তলায় একত্রিত হয়ে নানান শুল্ক হ্রাস ও অন্যান্য কৌশল গত কারণের প্রেক্ষিতে নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্যোগের স্বার্থকে বিদেশি প্রতিযোগিদের হাত তেকে রক্ষা করায় সচেষ্ট থাকে। এই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে আছে 'সংখ্যা গরিষ্ঠা পেশাদার অর্থনীতিবিদ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাহাজে মাল পরিবহনের স্বার্থবাদী ব্যক্তি বর্গ, আমদানি কারক এবং বৃহৎ উৎপাদনকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা যারা তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানিতে আগ্রহী'।
- 'নানা রকমের সমাজসেবী (প্রতিষ্ঠান) ও মানবিক স্বার্থ রক্ষাকারী সংস্থাগুলি রাষ্ট্রনায়কদের উপর চাপ তৈরি করে বিশ্বের তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন, গণতন্ত্র প্রতিতষ্ঠা এবং বস্তুবাদী সভ্যতার সুবিধা প্রদানের জন্য।'

এটা দেখা যাবে যে, স্প্রাউট যদিও ১৯৩০-এর দশকে এই বক্তব্য রেখেছেন, তথাপি অর্থনৈতিক উদারীকরণের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের ক্রমশ ম্লান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রকৃতি এবং গঠন মোটামুটি একই রয়ে গেছে। কেবল এর প্রকৃতিটি আরও বেশি জটিল হয়েছে। উদহারণ স্বরূপ বলা যায়, ম্যাককর্মক যখন বলেন যে, স্বার্থ গোষ্ঠীর সংখ্যা গত বিস্তারের বিষয়টি তদের ধরন বা প্রকৃতির বিচিত্রতার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এবং তিনি কতিপয় যে সংস্থার উল্লেখ করেন তার উল্লেখ করেছেন স্প্রাউটও। নিম্নের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

'Foreign policy interst groups include some traditional lobbying groups, such as business groups, labor unions, and agricultural interests, with their principal focus on internatonal trade issues (although increasingly these groups take stances on a broad array of other foreign policy concerns as well), and they now also include several newer groups that are active on foreign policy. These groups include religious communities, veteran organizations, academic think-tansk, ideological organizations (such as Americans for Democratic Action...AD), and single-issue inerest groups (e.g. United Nations Association of the United State, Union of Concerned Scientists and Americans against Escalation in Iraq).'

এই তালিকায় ম্যাককর্মিক সংযোজন করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভবত সবচাইতে প্রাচীন এবং সবথেকে প্রভাবশালী স্বার্থ গোষ্ঠীর নাম; সেই গোষ্ঠীটি হল জনজাতি ভিত্তিক স্বার্থ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলি প্রধানত চায় মার্কিন বিদেশনীতির অভিমুখ বদল করতে, যেখানে তাদের বা তাদের পূর্বসূরীদের উৎসভূমির স্বার্থ রক্ষিত হবে। প্রায়শই আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের অংশিদারিত্বের প্রশ্নটি দেশীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপূরক হয়ে ওঠে

এবং সরকার এই স্বার্থগুলি খুঁটিয়ে দেখলেও এর গুরুত্ব কমে না। কখনও বা আবার এও দেখা যায় যে, বিদেশের লবিগুলি সমমানসিকতা সম্পন্ন আমেরিকার জনজাতি গোষ্ঠীর কাছে এই আবেদন করছে তারা যেন তাদের দেশের বিদেশনীতির দিগনন্তকে আরেকটু প্রসারিত করে এই লবিগুলির মধ্যম্যাককর্মিক উল্লেখ করেছেন ইহুদীলবি, কিউবার লবি (আজকের দিনে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কিউবার সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে ওঠার পর এই লবিটি আর গুরুত্বপূর্ণ নেই), গ্রিক, তুর্কি, এবং আর্মেনীয় লবি আফ্রিকান-আমেরিকান লবি, ভারতীয় লবি ইত্যাদির (McCormic, 2012:68-85)। আমাদের এই স্বল্প পরিসরে আমরা কিভাবে আমেরিকার বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং সাফল্য লাভ করেছে তা আলোচনা করার অবকাশ পাব না; আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা এবিষয়ে বেশি জানার জন্য মডিউলের শেষে দেওয়া গ্রন্থ তালিকাটি দেখে তা পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু, একটি উদাহরণ অন্তত দেওয়া যেতে পারে: প্রত্যেকেই জানেন যে ইহুদী চাপের প্রতিক্রিয়ায় ইজরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আমেরিকার বিদেশনীতি ঠিক কি পরিমাণে নির্ধারিত হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সাধারণভাবে বিদেশনীতির গঠনে স্বার্থ গোষ্ঠীর ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে বিদেশনীতিতে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির কার্যকারিতার বিশ্লেষণ ভিত্তিতে হ্বিটকফ (Wittkopf) এবং অন্যান্যরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপন করেছেন:

- সাধারণভাবে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির অধিক প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় এবং বিদেশনীতির তুলনায় দেশীয় নীতিতে। তার কারণ হল বিদেশনীতির এলিট প্রণয়নকারীরা জাতীয় নিরাপত্তার দাবির জন্যই এখনও আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির নিরাপত্তা বলয়ে সুরক্ষিত থাকেন এবং দেশীয় রাজনীতির চাপের প্রতি তারা প্রায় নির্বিকার থাকেন।
- সংকটকালীন মুহূর্তগুলিতে তাদের প্রভাব নগণ্য; কারণ বিদেশনীতিতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সংকটের সময়ে এই ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
- স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায় বিদেশনীতিতে নিরাপত্তার ইস্যুর সম্পর্কে সম্পর্কিত রোইহত বিষয়, যেমন অর্থনৈতিক বিষয়ে যার দীর্ঘ কালীন প্রভাব রয়েছে।
- স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির প্রভাব ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে তাদের অধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
- স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসের আলোচনা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব খাটনোর চেষ্টা করে।
- স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় যখন তাদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কংগ্রেসের উদ্বেগও একটা গতি পায়।
- নির্বাচনের সময় স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়; এই সময়েই রাষ্ট্রপতি অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীরা স্বার্থগোষ্ঠীগুলির দাবিগুলির প্রতি সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে থাকেন।
- American Israel Public Affairs Committee-এর ডিরেক্টর চমৎকার ভাবে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির ভূমিকার দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন 'A lobby is a night flower', যা 'thrives in the dark and dies in the sun'। এই বক্তব্যের সত্যতা দেখতে পায়ো যায় এ ক্ষেত্রে স্বার্থ গোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বেশি দেখা যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে যেগুলি সমাজের খুব কম অংশকে স্পর্শ করে, ফলত পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারে না বা গণমাধ্যম দ্বারা প্রকাশিত খবরেও তেমন করে জায়গা করে

নিতে পারে না।

- সরকার এবং স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার প্রভাবের সম্পর্কটি পারস্পরিকতার দ্বারা আবদ্ধ যদিও সরকার প্রভাবতি যতটা না হয় প্রভাবিত করে তার থেকে অনেক বেশি।
- একটি মাত্র ইস্যুকে ঘিরে ব্যস্ত থাকা স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি বৃহৎ, বহু ইসু-ভিত্তিক, বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ নির্ভর স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অপেক্ষকৃত অধিক ক্ষমতা বা প্রভাব ভোগ করে থাকে, যদিও তাদের প্রভাবের ক্ষেত্রটি সীমিত থাকে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট নীতি বা ইস্যুর মধ্যে।
- প্রায়শই এটা লক্ষ্য করা যায় স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি নীতিকারদের মনকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে জনমতকেই পরিবর্তন করায় বেশী আগ্রহ প্রদর্শন করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এই কারণে যে জনমতকে পরিবর্তন করা বিচ্ছিন্ন কোন নীতির পরিবর্তন সাধানের তুলনায় অধিক কঠিন।
- কখনও কখনও এও দেখা যায়, স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি একধরনের নিষ্ক্রিয়া বা নীতি বিষয়ক স্থিতাবস্থা রক্ষা করে 'ভেটো গোষ্ঠী'-র ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাদের এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রভাব অনেক কম যেহেতু স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি পরিবর্তন বিমুখতার চেয়ে পরিবর্তন পন্থী হলে অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে।

কিন্তু হ্বিটকফ ও অন্যান্যরা যুক্তি দিয়েছন ঠান্ডা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বহুবিধ কারণে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলরি প্রভাবের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয়েছে। তাঁরা মাককর্মিককে উদ্ধৃত করে এই কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন:

- কংগ্রেসের ভিতর সংস্কার সাধনের ফলে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি পুনরায় উৎসাহিত বোধ করে কংগ্রেসের আলোচনা-প্রক্রিয়ায় তাদের অপ্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পথে প্রশস্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।
- আমেরিকার জনগণের মধ্যে সাধারণত ও আদর্শগত বিভাজনের বৃদ্ধির ফলে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলিও তাদের নিজেদের ঐ বিভাজিত গোষ্ঠীগুলির রক্ষাকর্তা বা চ্যাপিময়ন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।
- বিদেশী লবি, ধর্মীয় লবি, পরিবেশ বিষয়ক লবি, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং বিচ্ছিন্ন একক ইস্যু ভিত্তিক লবিগুলির মত নতুন নতুন গোষ্ঠীর বৃদ্ধির কারণে বিদেশনীতির সীমানা পরিবর্তনের সাথে সাথে বিদেশনীতি গঠন প্রক্রিয়ায় স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণের প্রকৃতিটিরও পরিবর্তন ঘটে।
- জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুরি যে দৃঢ় নিবন্ধটা ছিল তার পরিবর্তে ব্যবসা এবং বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ইস্যুগুরি প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি নতুন নতুন ইস্যু পেয়ে যায় তাদের লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য।
- সংকটের সময়ে যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করত তার থেকে দৃষ্টি সরে এসে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে নেওয়া কাঠামোগত সিদ্ধান্তগুলিতে আরও অনেকের বিজড়নে গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য এবং কৌশল সমূহের কথা বলা যায়।

৩.৮ সারসংক্ষেপ

সুতরাং, আপনারা দেখতে পেলেন যে আমরা এই এককে এ পর্যন্ত বিদেশনীতিতে দেশীয় উৎসগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। বিদেশনীতিতে জনমতের, পার্লামেন্টের এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় আইনসভার, রাজনৈতিক

দলগুলির, আমলাতন্ত্রের এবং সেই সঙ্গে স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা আলোচনা করে দেখিয়েছি। আমরা আপনাদের অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের উপরের পৃষ্ঠাগুলিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছি বিদেশনীতির ক্ষেতের দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ উৎসগুলির ভূমিকা বাহ্যিক এবং আন্তর্জাতিক উৎসগুলির ভূমিকার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি, এই এককে বা পূর্বের এককগুলিতে যা আলোচিত হয়েছে তা আপনাদের চূড়ান্ত এককে বিদেশনীতিগ্রহণ-প্রক্রিয়ার বিষয়গুলি ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।

৩.৯ প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তরমূলক প্রশ্নাবলী

১. বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে জনমত প্রকৃতই কি কার্যকরী? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।
২. আধুনিক গণতন্ত্রে জনমতের ওপর কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যার দ্বারা বিদেশনীতি নির্মাণে তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে?
৩. ব্রিটেনে বিদেশনীতি নির্মাণে সেখানকার সংসদ কি কোনো অর্থবহ ভূমিকা পালন করে?
৪. ব্রিটেনে বিদেশনীতি নির্মাণে ব্রিটিশ সংসদের ওপর কি প্রকার সীমাবদ্ধতা আছে?
৫. আমেরিকায় বিদেশনীতি নির্মাণে কংগ্রেসের ভূমিকা কি প্রকার?
৬. আমেরিকার কংগ্রেস কি ব্রিটিশ সংসদের তুলনায় বিদেশনীতি রচনার ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে?
৭. ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশনীতি রচনায় রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
৮. আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির কাঠামোবাদী মডেল মার্কিন প্রেক্ষিতে বিদেশনীতি রচনায় যে ভূমিকা তা বিশ্লেষণ করুন।
৯. আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক মডেলের যারা সমালোচক তাদের মূল্যায়ন করুন।
১০. রাজনৈকি অর্থে বিদেশনীতি প্রণয়নে স্বার্থগোষ্ঠী সমূহের প্রকারভেদ কী রূপ?

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. সরকার ও গণমাধ্যম দ্বারা প্রবলভাবে প্রচাতির সংবাদ কি জনমত গঠনে সক্ষম? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।
২. বিদেশনীতি নিয়ন্ত্রণে ব্রিটিশ সংসদ কি ক্যাবিনেটের কাছে পরাস্ত হচ্ছে?
৩. বিদেশনীতি প্রণয়নে মার্কিন কংগ্রেসের প্রেক্ষিতে 'দ্বিপক্ষ-সমঝোতার' বিষয়ে মন্তব্য করুন।
৪. বিগত তিনদশক ব্যাপী মার্কিন বিদেশনীতি প্রণয়নে কংগ্রেস কি ভূমিকা নিয়েছে?
৫. কংগ্রেসের মুখোমুখি মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিদেশনীতি নির্মাণে কি ভূমিকা নিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করুন।
৬. যেসব দেশে রাজনৈতিক দলগুলি মতাদর্শ-ভিত্তিক নয় সেখানে কি তাদের বিদেশনীতি সংক্রান্ত ভূমিকা নির্বাহে বাধাপ্রাপ্ত হয়?
৭. গ্রাহাম অ্যালিসনের আমলতান্ত্রিক রাজনীতি মডেল এর মূল বক্তব্যগুলি কী কী?
৮. রবার্ট জে আর্টের আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেলের সমালোচনাগুলি সংক্ষেপে লিখুন?
৯. কোনো দেশের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে স্বার্থগোষ্ঠী কেন বৃহৎ ভূমিকা থাকে ব্যাখ্যা করুন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. বিদেশনীতি রচনায় জনমতের ভূমিকা সম্বন্ধে সনাতনী মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করুন?
২. টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের ফলে কি জনমত আরো বেশি বিভ্রান্ত?
৩. স্বাধীন জনমত গঠনে কর্পোরেট চালিত গণমাধ্যম কি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?
৪. বিদেশনীতি নির্মাণে ফরাসী সংসদের ভূমিকার ওপর টীকা লিখুন।
৫. বিদেশনীতি নির্মাণে অন্য সংদের সাধারণভাবে দুর্বলতার প্রেক্ষিতে ভারতীয় সংসদ কি একটি ব্যতিক্রম?
৬. Gaul-প্রচারিত-সংসদীয় ধারণা কতদূর বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সংসদের প্রভাব সংকুচিত করেছে?
৭. ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল কি বিদেশনীতির ব্যানারে একটি সহমত-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উপনীত হয়েছে?
৮. মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ নিয়ে প্রথম যুগের চিন্তকগণের বিষয়ে মন্তব্য লিখুন?
৯. সমালোচনার মুখে পড়ে আমলাতান্ত্রিক মডেলের সমর্থকগণ কিভাবে নিজেদের অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করেন?

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Art, Robert J., 'Bureaucratic Politics and American Foreign Policy : A Critique', Policy Sciences 4:1 (December 1973): 467-90.
2. Bale, Tim , Conservative Party: From Thatcherto Cameron (Cambridge: Polity Press, 2011)
3. Browlie , lan, 'Parliamentary Control over Foreign Policy in the United Kingdom', Cassese, Antonio (ed.) , Parliamentary Control over Foreign Policy : Legal Essays (Germantown,Md.: Sijtoff & Noordhoff, 1980).
4. Holsti, Ole R., Public Opinion and American Foreign Policy (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004).
5. Leyton-Brown , David, 'The Role of the Congress in the Making of Foreign Policy' , International Journal 38:1 (Winter, 1982-83): 59-60.
6. Manners, lan and Richard Whitman, The Foreign Policies of European Member States (Manchester: Manchester University Press,2000).
7. McCormick, James, American Foreign Policy and Process (Boston, MA: Wadsworth Cengage Learning, 2010),http//https://books.google.co.in, accessed on 20 April 2015.
8. McCormick, James M. , 'Ethnic Interest Groups in American Foreign Policy', in McCormick (ed.) The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and Evidence (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2012).
9. Sprout, Harold H. /Pressure Groups and Foreign Policies', in Annals of American History and Political Science, Volume 179, Pressure Groups and Propaganda (May, 1935?) : 114-23, Sage Publications in Association with American Association of Political and Social Science , http:// www.jstor.org/ stable/1020286, accessed on 6 April 2015.

৩.১১ অন্যান্য গ্রন্থ উৎস সমূহ

1. Alden, Chris and Aran, Amnon, *Foreign Policy Analysis* : (Abingdon, Oxon;New York: Routledge,2012).
2. Baum, Matthew A., *Soft News Goes to War: Public Opinion and American Foreign Policy in the New Media Age* (Princeton: Princeton University Press, 2007)
3. Beetham, David, *Max Weber and the Theory of Modern Politics* (Oxford: Polity-Press, 1985).
4. Cot, Jean Pierre, 'Paliament and Foreign Policy in France', in Cassese, Antonio (ed.). *Parliamentary Control over Foreign Policy: Legal Essays* (Germantown, Md : Sijthoff & Noordhoff , 1980).
5. Entman, Robert M., *Projections of Power, Forming News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy* (Chicago: University of Chicago Press, 2009).
6. Frankel, Joseph, *The Making of Foreign Policy: An Analysis of Decision Making* (London, Oxford and New York: Oxford University Press, 1963/1971).
7. Freedman, Lawrence, 'Logic, Politics and Foreign Policy Processes: A Critique of the Bureaucratic Politics Model', *International Affairs* 52:(1976):434-439.
8. Fisher, Louis, Foreign Policy Powers of the President and Congress, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.499, Congress and the Presidency: Invitation to Struggle (Sep., 1988):148-159, Sage Publications in Association with the American Association of Political and Social Science, http://www.jstor.org/stable/1045825, accessed on 6 April 2015.
9. Hackett, Robert A., 'The Press and Foreign Policy Dissent: The Case of the Gulf War', in Abbas Malek(ecL), writes (Norwood, NJ:Ablex,1997).
10. Harold , Christine, *Our Space: Resisting Corporate Control of Culture* (Minnepolis: University of Minnesota Press,2007).
11. Hermann, Edward and McChesney, Robert *W.Global Media .: The New Missionaries of Global Capitalism* (London: Continumn,2001).
12. -Jean Louis de Lolme Memoirs pour servir a 1 ,liistoire de la France en matiS're *d'impots* (Brussels, 1779).
13. Larsonjames, F. ,*The Internet and Foreign Policy* (New York: Foreign Policy Association, 2004).
14. Merriam-*Webster's Dictionary of Allusions*, compiled by Webber, Elizabeth and Feinsilber, Mike(Springfield, Mass.:Merriam-Webster, 1999).
15. Miller, James, *Rousseau: Dreamer of Democracy* (New Haven: Yale University Press,1984).
16. King, Gary, 'Foreign Policy and political Parties : A Structuralist Approach', *Political Psychology* 7:1 (March 1986) : 83-101.
17. Leyton-Brown, David, 'The Role of the Congress in the Making of Foreign Policy', International Journal38:1)Winter ,1982-1983:(59-76.
18. Lindsay,James M.',Congress ,Foreign Policy ,and the New Institutionlaism International,' Studies Quarterly38:2 (Jun., 1994): 281-304.

19. Lindsay, James M.',Congress and Foreign Policy:Why the Hill Matters ,' *Political Science Quarterly* 107:4 (Winter,1992-93):606-28.
20. Miller, James, *Rousseau: Dreamer of Democracy* (New Haven: Yale University Press,1984).
21. Paterson, W.E.' Political Parties and the Making of Foreign Policy: The Case of the Federal Republic', *Review of International Studies* 7:4 (Octoberl981): 227-35.
22. Putnam, Robert, 'Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-level Games', *Internatinal Organization* 42:3 (Summer 1988): 427-60.
23. Preston, Hart Paul and Thomas't,' Understanding and Evaluating Bureaucratic Politics: The Nexus between Political Leaders and Advisory Systems, *Political Psychology* 20:1 (March 1999): 49-98.
24. Ramachandran,Sita, *Decision- making in Foreign Policy* (New Delhi: Northern Book Centre,1996).
25. Smith, Steve, 'Policy Preferences and Bureaucratic Position', *International Affairs,* 61-1 (Winter,1984-85).
26. Rosati, Jerel A. and Scott, James M., *The Politics of United States Foreign Policy* (Boston,MA: Wadsworth,Cengage Learning,2011).
27. White, B.P.', Decision-making Analysis ,'in Trevor Taylor *Approaches and Theory in International Relations* (London and New York: Longman,1984.)
28. Wittkopf, Eugene R.,Jones,Christopher,Kegley Jr.Charles, *American Foreign Policy : Pattern and Process* (Beltmon,CA: Thomson/Wadsworth, 2008).

একক ৪ ☐ বিদেশনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য সমূহ
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ একেবারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনার বয়ান নয়
৪.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিস্থিতিগত এবং জ্ঞানাত্মক দিকের সম্মিলন: স্নাইডারের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা
৪.৫ বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গঠনের বৌদ্ধিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানাত্মক দিক সমূহ
৪.৫.১ তথ্য সম্বন্ধীয় অথবা Cybernetic দৃষ্টিভঙ্গি
৪.৫.২ বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া
৪.৫.২.১ বিশ্বাস, ধারণাসমূহ, ইমেজ এবং বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াশীলতার সংকেত : সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এলিটদের জ্ঞানাত্মক মানচিত্রের নির্মাণ স্তম্ভ।
৪.৫.২.২ হোলস্টির পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ
৪.৫.২.৩ বিশ্বাস প্রণালীতে নিরবচ্ছিন্নতা এবং পরিবর্তন
৪.৫.২.৪ জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেল
৪.৬ কে বা কারা চূড়ান্তভাবে বিদেশনীতি নির্ধারণ করেন?
৪.৭ সারসংক্ষেপ
৪.৮ অনুশীলনী
৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী
৪.১০ অন্যান্য গ্রন্থউৎস সমূহ

৪.১ উদ্দেশ্য সমূহ

- এই এককে আমরা বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণকারীদের বা কেন্দ্রিয় চরিত্রগুলির তুলনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর বেশি জোর দেব।
- অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, কে বা কারা বিদেশনীতি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করছে তাদের আলোচনাই করব না। তারা কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন তার প্রতি বেশি মনোযোগ দেব।
- আমরা দেখানোর চেষ্টা করব যে এই প্রক্রিয়াটির, অর্থাৎ 'কীভাবে'-র বিষয়টিতে, দু'টি দিক আছে—একটি পরিস্থিতিনির্ভর বা situational, অপরটি জ্ঞানাত্মক বা congnitive, মনস্তাত্ত্বিক বা psychological। আমরা শেষোক্ত বিষটির উপর বেশি জোর দেব যদিও প্রথমটিকে উপেক্ষা করব না।
- আমরা বরং দেখানোর চেষ্টা করব যে কীভাবে 'কে বা কারা' 'কীভাবে'-র সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত।

৪.২ ভূমিকা

একক ১-এ বিদেশনীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিষয়টি বোঝার বিভিন্ন ধারণা কাঠামোগুলি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। একক-২-এ বিদেশনীতির নির্ধারকগুলি আলোচিত হয়েছে; একক ৩-এ বিদেশনীতির দেশীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্তমানে আমরা বিদেশনীতি 'বাস্তবে' কীভাবে রচিত হয় তার দিকে দৃষ্টি দেব, অর্থাৎ 'কে বা কারা বিদেশনীতির রচয়িতা'-র বিষয়টি থেকে 'কীভাবে তাঁরা এটি রচনা করেন'-এর দিকে আমরা আমাদের দৃষ্টি ঘোরাতে চাইব। সরকারের প্রধান যদিও বিদেশনীতি গঠনের প্রধান একক হিসেবে কাজ করে থাকেন, তথাপি পার্লামেন্ট, কংগ্রেস, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র এবং স্বার্থগোষ্ঠী সমূহের মত একক বা উপাদানগুলিও বিদেশনীতির পরিণামের জন্য দায়ী। জনমতও প্রায়শই এর মানদণ্ডগুলি ঠিক করে দেয়। তবুও একথা মানতেই হবে যে, বিদেশনীতি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের শাসনবিভাগের উপরই বর্তায়। এই এককে আমরা পূর্বোক্ত এককগুলির বা অন্যান্যদের প্রতি নজর দেবনা। এখানে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মানসিক প্রক্রিয়াগুলির প্রতি দৃষ্টি দেব যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই মডিউলের একেবারে প্রথমে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, আট খণ্ডের সুবিশাল সেজ প্রকাশিত *Handbook of Political Science*-এ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে খণ্ডে রয়েছে সেই খণ্ডে না রেখে বিদেশনীতিকে 'Policis and Policy Making'-এর খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই এককটি ভালো ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে কেন এমনটি হল।

৪.৩ একেবারে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনার বয়ান নয়

একথা শুরুতেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই এককে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করব না। এমনকি যদি পাঠকের পূর্বপাঠের অভিজ্ঞতা নাও থাকে এ বিষয়ে, তথাপি এটি এই তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র নয়। কারণ, সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; আমাদের উদ্দেশ্য হল সেই সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা, যারা মানব জাতির বৃহৎ অংশ, বিভিন্ন দেশের এবং মহাদেশের ভাগ্যও কখন সখনও পরিবর্তন করে দিতে পারে। সেই কারণেই শুধু এইটুকুই সংক্ষেপে উল্লেখ করবে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশ্লেষণে 'rational', 'rational-deductive' অথবা 'synoptic' দৃষ্টিভঙ্গিগুলি—যার প্রয়োগ জন ডিউই (John Dewey) থেকে আরম্ভ হয়েছিল, এবং উনিশ শতকের শেষদিকে ও বিংশ শতকের প্রথমদিকে এর সমর্থকও ছিল প্রচুর—আজকের দিনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রথমে লক্ষ্য বা লক্ষ্যসমূহ নির্বাচনের কথা বলা হয় এবং তারপর লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য উপায়ের সন্ধান করা হয়ে থাকে; এর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য অর্জনের উপায়ের জন্য ব্যয়ের হিসেব করা হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সবচাইতে কম ব্যয় কোনটা তা পছন্দ করতে হবে। বিংশ শতাদীর দ্বিতীয়ার্ধে হারবার্ট সাইমন তাঁর 'bounded rationality' এবং 'satisficing'-এর ধারণা দুটির সাহায্যে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে গড়ে ওঠা 'মিথ' টি ভেঙে দেন। যে গ্রন্থ দুটিতে সাইমন এই 'মিথটি' ভাঙেন সেই গ্রন্থ দুটি হল ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত Administrative Behavior এবং ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'Models of Man: Social and Rational'। আশা করি আপনারা এসব বিষয়ে সকলেই অবহিত, যেমন অবহিত এই ব্যাপারেও যে চালর্স ই লিন্ডব্লম (Charles E. Lindblom) সাইমনকে ছাপিয়ে গিয়ে কুড়ি বছরের ব্যবধানে রচিত দুটি

প্রবন্ধে উপায় আর লক্ষ্যের যে আপাত স্পষ্ট ছক তাকে ভেঙে চুরমার করে দেন। এই প্রবন্ধগুলি হল, 'The Science of "Muddling Through" (১৯৫৯) এবং 'Still Muddling, Not yet Through' (১৯৭৯)। এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত গ্রন্থ *The Policy Making Process* (১৯৬৮)-এর ভূমিকাটিও গুরুত্বপূর্ণ। এখন থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় 'marginal incrementalism' স্থান করে নিল যেখানে উপায় এবং লক্ষ্যের মধ্যেকার সময়ের বিন্যাসক্রমটি বাতিল বলে গণ্য হল এবং প্রতিটি 'ভালো' সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে পরিগণিত হল। এমনকি এই 'marginal incrementalism' এর মধ্যে যেটুকু যৌক্তিকতা রয়ে গিয়েছিল তাও লিন্ডব্লম তাঁর সহ লেখক ডেভিড ব্রেব্রুকের সঙ্গে ১৯৬৩ সালে লিখিত গ্রন্থ The Strategy of Decision-এ পুরোপুরি প্রতিবর্তন (obvert) ঘটিয়েছিলেন। প্রায়শই উপায়কে ব্যবহার করা হত লক্ষ্য নির্ধারণের কাজে। সমস্যার সমাধান কখনই এই কথায় যৌক্তিক ছিল না, বরং এর মধ্যে পুনঃপুনঃ আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল ও 'ছিদ্রানুসন্ধান' বা 'nibbling' ছিল এবং এই আক্রমণ আর 'ছিদ্রানুসন্ধান' বহু দিক থেকে বা কেন্দ্র থেকে আসত। উপায়রে মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারণের এবং যৌক্তিকতা বাতিল করার এই অসংগতি পরবর্তী কালে আইমতাই এতজিওনি (Amitai Etzioni) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Mixed Scanning: A "Third" Approach to Decision-Making' (১৯৬৭)-তে এই সমস্যাটির সমাধানে প্রয়াসী হয়েছিলেন; যেখানে তিনি আবহবিদ্যার প্রকরণকে কাজে লাগিয়ে যৌক্তিকতাবাদী এবং incrementalist দৃষ্টিভঙ্গি দুটির মধ্যে একটি সংশ্লেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন দৃষ্টিভঙ্গিগুলির দুর্বলতাগুলি এড়িয়ে এদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। এতজিওনি বলেন, 'একটি বৃহৎ দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন ক্যামেরা... আকাশের সমগ্র অংশ ছবিতে আনতে পারলেও সবটা অনুপুঙ্খভাবে ধরতে পারে না' এবং 'দ্বিতীয়টি', বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ সম্পন্ন বলে ধরে নিলে, সেই এলাকাগুলিতে মনোনিবেশ করে যা প্রথম ক্যামেরার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত কিন্তু তার অধিকতর গভীর পরীক্ষার প্রয়োজন।' এতজিওনির বিশ্বাস হল, 'While mixed-scanning might miss areas, in which only a detailed camera could reveal trouble, it is less likely than incrementalism to obvious trouble spots in unfamiliar areas' (Etzioni, 1967: 388-89)। আমরা সিদ্ধান্তগ্রহণ বিষয়ক আলোচনা সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে এতজিওনিকে উদ্ধৃত করলাম কেবলমাত্র এটা বোঝানর জন্য যে আমরা পরে দেখতে পাব অধিকাংশ এলিট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরাই 'mixed scanning' এর একটা প্রকার তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকেন হয় পরিস্থিতিগত কারণে নতুবা জ্ঞানাত্মক বাধার কারণে।

৪.৪ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিস্থিতিগত এবং জ্ঞানাত্মক দিকের সম্মিলন: স্নাইডারের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা

বিদেশনীতির কোন আলোচনাই শুরু হতে পারে না প্রথম তাত্ত্বিক আলোচনাকে বাদ দিয়ে যেখানে পরিস্থিতিগত এবং জ্ঞানাত্মক দিককে বিদেশনীতির বিশ্লেষণে একটি যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। স্নাইডার ও অন্যান্যদের বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর বীজগ্রন্থের মত মোনোগ্রাফ (Snyder, 1954)-এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত স্নাইডারের মূল তাত্ত্বিক উপস্থাপনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 'রাষ্ট্রকেন্দ্রিক', 'একক হিসেবে রাষ্ট্র', অথবা 'বিলিয়ার্ড বল'-এর মত সমসাময়িক মডেলগুলিকে চূড়ান্তভাবে আঘাত করেছিল, যাকে অনেক পরে অ্যালিসন যৌক্তিক একক মডেল বা Rational Actor Model (RAM)

বলে অভিহিত করবেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আলোচনা দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করা ছাড়া স্নাইডারের তাত্ত্বিক মডেলটি ঠিক কোন জায়গায় উদ্ভাবনী মূলক? এটা একমাত্র ব্যাখ্যা করা যেতে পারে উক্ত মোনোগ্রাফটি প্রকাশিত হওয়ার আগে বিদেশনীতির ব্যাখ্যায়।

বিশ্লেষণ পদ্ধতির দিকে নির্দেশ করে। ঐ সময়কালে নীতি বিশ্লেষকগণ একধরনের 'ঐতিহাসিক-বর্ণনা মূলক' পদ্ধতি সাহায্য নিতেন এবং মনে করতেন যে এটুকুর মধ্য দিয়েই তাঁদের রাষ্ট্রের বাহ্যিক আচরণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এই কর্তব্যের সমাপন ঘটে। র‍্যালফ পেটম্যান একে 'পরিপ্রেক্ষিতগত বাধ্যতা' নামে সহজেই অভিহিত করেছেন যা একটি দেশের ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এর অর্থ হল এই যে, এই বিশ্লেষকগণ এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতগত বাস্তবতাগুলিকে, বা অন্যভাবে বলা যায়, এই উপাদানগুলিকে একত্র করেছেন; আমরা এই বিষয়টি একটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতির নির্ধারক হিসেবে ইতোমধ্যেই আমাদের দ্বিতীয় এককে আলোচনা করেছি এবং সেখানেই এই আলোচনার থেকে সরে এসেছি ও এই বাস্তবতার প্রভাব যে কতটা তাও দেখিয়েছি। একটি রাষ্ট্রের আচরণ নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ উপাদানের তুলনায় বাহ্যিক উপাদনগুলিকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা হয়েছিল। তাই, একটা প্রেক্ষিত যেখানে একটা রাষ্ট্রের টিকে থাকাকেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়ে থাকে, সেখানে এই 'পরিপ্রেক্ষিতগত বাধ্যবাধকতা' জাতীয় ক্ষমতার উপাদানের একটা তালিকার জোগান দেয়। এই উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রীয় আচরণের সঙ্গে যুক্ত করলে প্রায়শই নির্ধারণমূক ব্যাখ্যার জন্ম দেয়। কেবলমাত্র স্থির চিত্রকে চলচ্চিত্র হিসেবে দেখানোর প্রয়াস দেখা যায় কোন স্থায়ী বা নির্দিষ্ট ভিশান (vision) ছাড়াই। রাষ্ট্রনায়কদের দেখা হয় অসহায় এজেন্ট হিসেবে যাঁরা বাহ্যিক সংকটের বাস্তবতার সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে বাধ্য হন। সুতরাং একজন বিশ্লেষক যদি বাহ্যিক উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন, তবে তাঁর একটি রাষ্ট্রের বিশেষ কোন আচরণ ব্যাখ্যার কাজটি করা হয়ে যায় বলে ধরে নেওয়া হয়। একটা প্রণালীগত ধারণা বা বোধ—যা বাস্তববাদের খুব কাছাকাছি—গড়ে উঠেছিল বাহ্যিক সম্পর্কের নিরিখে জাতি-রাষ্ট্রের একটা যান্ত্রিক এবং একমাত্রিক ধারণাকে ভিত্তি করে; এবং বিদেশনীতির আলোচনা—বয়ানে এই তাত্ত্বিক চিন্তাটিই প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। স্নাইডারের সিদ্ধান্তগ্রহণ দৃষ্টিভঙ্গিটি একে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং এর আমূল পরিবর্তন ঘটায়। বিস্তৃত অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে স্নাইডারের তাত্ত্বিক কাঠামোটি, জেমস রোজনাউ-এর ভাষায় (এটি) 'served to crystallize the ferment and provide guidance–if not legitimacy–for those who had become disenchanged with a world composed of abstract states with a mystical quest for single-cause explanation of objective reality' (Rosenau, cited in Taylor, 143)। স্নাইডার যদিও একবার স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান গুণটি লুকিয়ে রয়েছে এর 'heuristic value'-এর মধ্যে, তিনি যে কোন কারণেই হোক অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। প্রায়শই তাঁকে অভিযোগ করতে দেখা যায়, বিদেশনীতির বিশ্লেষকরা জানতেনই না যে তাঁরা কি করে চলেছেন; অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনিই সবথেকে ভালো জানেন যে তাঁদের কি করা উচিত ছিল।

তবে যাই হোক, ঐতিহাসিকভাবে এবং পদ্ধতিগতদিক থেকে আচরণবাদী আন্দোলনের মধ্যে এক শিকড় প্রোথিত ছিল বলে এটি রাষ্ট্রের বিমূর্তকরণ এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিশ্লেষণকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল; স্নাইডার তাই অতীব গুরুত্ব সহকারে মন্তব্য করেন 'State X as actor is translated into its decision-makers as actors'। যদিও তাঁদের 'মডেলটি একটি কল্পিত রাষ্ট্রের কথা বলে যার বৈশিষ্ট্যাবলী এমন যে আমাদের তা সমস্ত বাস্তব রাষ্ট্রের সম্পর্কে কিছু বিষয়ে কথা বলতে সাহায্য করে যদিবা কোন না কোন ভাবে তাদের ভিতর পার্থক্য থাকে'। তাদের রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে নির্যাসগত দিক হতে আমেরিকা রাষ্ট্রের একটা নীতি

কাঠামোর কঙ্কাল রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদিও বিভিন্ন লেখক মৌলিক রাজনৈতিক সংগঠন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা প্রণালীর ক্ষমতা এবং তাদের শক্তি ও দুর্বলতার নিরিখে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রকমফের নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার নিয়েছেন, তথাপি তাঁরা এই বিভিন্নকরণের কাজটি সম্পন্নের দায়িত্বটি অন্যদের জন্য রেখে দিয়েছেন। এখানে একটি মডেলের উল্লেখ করা যায়, যেখানে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিত আর বাহ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতের অনুপুঙ্খ ছবি দেখতে পাওয়া যায়; যে ছবিতে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তাদের পরিস্থিতিতে সংজ্ঞায়িত করার ব্যাপারে প্রভাবিত হন তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এই মডেলটি এমনই যে এর মধ্যে সকল প্রকার সামাজিক-অর্থনৈতিক বিচিত্রতাকে অস্বীকার করা হয়েছে যাতে বিশ্বের প্রত্যেক রাষ্ট্রই এই মডেলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এতদসত্ত্বেও, এই মডেলটি তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রের মিথটি ভেঙে ফেলে একে কেবল সরকারি সিদ্ধান্তকারীদের স্তরে আবদ্ধ করে। তাৎপর্য হল এই যে, এখন থেকে রক্ত মাংসের মানুষ এর বিশ্লেষণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যে মানুষ ভুল করে এবং তার ধারণা কোন বিমূর্ত ধারণা নয়; এবং এর ফলেই এই সম্ভাবনার পথ খুলে যায় যেখানে তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এবং সাধারণ আচরণ পদ্ধতিনিষ্ঠভাবে এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা সম্ভব হয়ে উঠবে। এগুলি ছাড়াও স্নাইডারের মডেলটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক যৌক্তিক একক মডেলটিকে (Rational Actor Model) সিরিয়াস চ্যালেঞ্জ জানায়। এই চ্যালেঞ্জ গুলি হল:

- বিদেশনীতি কতগুলি সিদ্ধান্তের সমষ্টি, যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেন কিছু চিহ্নিতকরণ যোগ্য 'সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী'।
- সুতরাং, আচরণগত ক্রিয়া যা ব্যাখ্যার দাবি করে তা সিদ্ধান্ত তৈরি করে।
- এই ব্যাখায় যে ধারণাটি প্রয়োজনীয় তা হল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নির্দিষ্ট পরিস্থিতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছে তার ধারণা।
- সেইমত বিশ্লেষণকারীকে বিদেশনীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের অভ্যন্তরীণ বা সামাজিক উৎসগুলির উপর জোর দিতে হয়। এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটির সিদ্ধান্তের উৎস হিসেবে স্বতঃই গুরুত্বপূর্ণ, স্বাধীন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিদেশনীতির বিশ্লেষণের সাবেকি বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিপরীতে, বিদেশনীতিকে কতকগলি বিচ্ছিন্ন যোগফল হিসেবে দেখাটা সত্যিকারেই একটা নতুন করে বিদেশনীতিকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি। স্নাইডারের বিখ্যাত বক্স ডায়াগ্রামে স্নাইডারের ধারণাগত কাঠামোর স্পষ্ট ছবি রয়েছে; জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সবচাইতে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলির উৎসগুলিকে 'অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবেশ বা 'setting' এবং 'বাহিক্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিবেশ বা setting-এ বিভাজিত করা হয়েছে যা আনুভূমিকভাবে সম্পৃক্ত এবং পারস্পরিকতার উভমুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। স্নাইডারের ধারণা কাঠামোয় তিনটি উপাদান হল: (১) 'অ-মানবিক বা nonhuman পরিবেশ'; (২) 'সমাজ'; (৩) 'মানবিক পরিবেশ সংস্কৃতি, জনসংখ্যা'। ঐ চিত্রেই তিনটি(?) সম্পর্কযুক্ত উপাদন হল: (১) 'অ-মানবিক বা nonhuman পরিবেশ'; (২) অন্যান্য সংস্কৃতি'; (৩) 'অন্যান্য সমাজ' এবং (৪) 'সেইসব সমাজ যা সংগঠনিকভাবে ক্রিয়া করে এবং রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করে'; 'সরকারি ক্রিয়া'। স্নাইডারকৃত চিত্রে 'সামাজিক কাঠামো ও আচরণের' কথা বলা হয়েছে, যা আবার (ক) 'বড় ধরনের মূল্যবোধ প্রবণতা', (খ) 'বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ধাঁচ বা ছক', (গ) 'সামাজিক সংগঠনগুলি বড় বৈশিষ্ট্য সমূহ' (ঘ) 'ভূমিকার পৃথিবীকরণ ও বিশেষীকরণ', (ঘ) 'সামাজিক সংগঠনগুলির বড় বৈশিষ্ট্য সমূহ', (ঙ) 'গোষ্ঠী: তাদের প্রকারভেদ

কার্যাবলী', এবং (চ) 'প্রাসঙ্গিক সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ'; এগুলি আবার নিম্নলিখিত ভাবে বিভাজিত। এই বিভাজনগুলি হল জনমত গঠন, (২) প্রাপ্ত বয়স্কদের সামাজিকীকরণ। উপর্যুক্ত বিষয়গুলি উর্দ্ধাভিমুখী এবং নিম্নভিমুখী চিহ্ন দ্বারা এমনভাবে চিহ্নিত করেছেন স্নাইডার যার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করা এবং প্রভাতি হওয়াকে বোঝান হয়েছে। স্নাইডারের ডায়াগ্রামের বক্স এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিম্নাভিমুখী চিহ্ন দ্বারা বি কে যুক্ত করা হয়েছে এবং বক্স সি-র নীচে অবস্থিত বক্স ডি যুক্ত যেখানে 'ক্রিয়ার' কথা বলা হয়েছে, যা আবার উর্দ্ধাভিমুখী এবং নিম্নাভিমুখী চিহ্ন দ্বারা বক্স সি এবং বক্স ডি-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। (Synder, 1954)।

এই ছবির তাত্ত্বিক প্রভাবটি কী ধরণের? যেখানে এই সাবেকী বিশ্লেষণ দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং বিদেশনীতির আরম্ভ বিন্দু হিসেবে ধরা হয় সেই বিন্দুকে যেখানে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সমাপ্তি ঘটে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলিকে বর্ণনাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক এই উভয় উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত বাধা হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। এই জন্যই বিলিয়ার্ড বলের 'hard shell' এর অন্দরে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন যাকে একসময় আলাদা আলাদা করে দেখানো হত। সেই মনোযোগ বিমূর্ত রাষ্ট্রের থেকে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দিকে স্থানান্তরিত হয়, তখনই বাহ্যিক উপাদানগুলি বা 'বাস্তববাদী' উপাদানগুলি একটা উপাদানের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে এক 'পরিস্থিতির' সৃষ্টি করে সামগ্রিকভাবে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের উক্ত পরিস্থিতিকে আঁচ করতে এবং সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে। স্বাভাবিকভাবে, এইগুলি এবং আভ্যন্তরীণ উপাদানগুলি দুটি (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) পরিবেশ বা 'settings' এর জন্ম দেয়। বিদেশনীতির আভ্যন্তরীণ উৎসগুলি পূর্বে কীভাবে নীতি বিশ্লেষকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল তা ব্যাখ্য করার সঙ্গে সঙ্গে স্নাইডার কতৃত বক্স ডায়াগ্রামটি এটাও দেখিয়েছিল যে, কেমন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটিকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ চল হিসেবে ব্যববাহ করা যায়; আবা কেমন ভাবেই বা এটি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশ এবং তার প্রতি সিদ্ধান্তজনিত প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা ছাঁকনি বা filter-এর কাজ করে। অবশ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পছন্দ বাছাই এর ক্ষেত্রে এবং গৃহীত সিদ্ধন্তগুলিকে একটি কাঠামো প্রদানের ব্যাপারে উল্লেখিত আভ্যন্তরীণ এবং সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়াকে দুটি পৃথক উদ্দীপক হিসেবে দেখা হয়েছিল, তা সত্য এবং এটি এযাবৎ উপেক্ষিত বিদেশনীতির ব্যাখ্যায় অন্তররাষ্ট্রীয় (intrastate) মাত্রা যোগ করেছিল এটাও সত্য, তথাপি স্নাইডারের ডায়গ্রামটির চূড়ান্ত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই কাঠামোটি তৃতীয় বর্গ (third category)-কে অর্থাৎ সেই অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। তৃতীয় বর্গের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পড়ে যেগুলি হল' জনমত, রাজনৈতিক দল, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, আইনসভা, সামরিক-শিল্পপতি জটিল সম্পর্কিত যৌগ (military-industrial complex), এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্ততপক্ষে এটা বলা যায়, তৃতীয় বর্গটিকে যথেষ্ট পরিণামে দ্বিতীয় বর্গ থেকে পৃথক করা হয় নি।

বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা হিসেবে স্নাইডারের তাত্ত্বিক কাঠামোটি কতগুলি দুর্বলতার শিকার:

সমস্ত দাবী সত্বেও স্নাইডারের মডেলটি রাষ্ট্র-কেন্দ্রিকতা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত নয়। একটা 'সামগ্রিক প্রাসঙ্গিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের' লম্বা দাবি সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আদতে একটা সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করা হয়েছে, যেহেতু 'কেবল মাত্র সরকারি পদাধিকারীদেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অথবা একক হিসেবে দেখা হয়ছে'। কিন্তু, হিলসম্যান (Hilsmman) (যাঁর কথা আমরা পূর্বের এককে আমলাতন্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি,) উল্লেখ করেছেন যে উক্ত 'স্বীকৃত পদাধিকারী'রা ছাড়াও বিদেশনীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই স্নাইডারের নিজস্ব ধারণা কাঠামোর চেয়ে তাঁর তত্ত্ব প্রকল্পের উপদানের প্রতি

প্রতিক্রিয়াটি বিদেশনীতি গ্রহণ প্রক্রিয়া বোঝার ও ব্যাখ্যার জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া, স্নাইডার তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোয় জোর দিয়েছেন পরিস্থিতি নির্ভর প্রেক্ষিতের বা situational context-এর উপর, কিন্তু তা আবার সীমিত। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৪ সালের পরে বিদেশনীতির প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণে বা তাকে বোঝার জন্য যে ভাবনা হচ্ছিল তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে কতগুলি 'অব-প্রক্রিয়ায় বা sub-processes'-এ বিভক্ত করা হয়। এই 'অব-প্রক্রিয়া'গুলির মধ্যে তিনটিকে চিহ্নিত করা যায়। এগুলি হল: 'বৌদ্ধিক', 'সামাজিক-সাংস্থানিক', 'রাজনৈতিক'। আমলাতন্ত্রের প্রসঙ্গে আমরা ইতোমধ্যেই 'সামাজিক-সাংস্থানিক', এবং 'রাজনৈতিক' প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছি; আপাতত আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৌদ্ধিক অব-প্রক্রিয়ার বিষয়ে কথা বলব।

৪.৫ বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গঠনের বৌদ্ধিক বা Cybernetic, মনস্তাত্ত্বিক, এবং জ্ঞানাত্মক দিকসমূহ

দু'জন বিশেষজ্ঞ বৌদ্ধিক অব-প্রক্রিয়াকে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটা বিশ্লেষণের দিক যা অনেকাংশেই ব্যক্তি ও গোষ্ঠী চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়'—এমনতর ধারণার অর্ন্তগত বলে মনে করেন (Robinso and Majak, cited in Taylor 152)। এই আলোচনার পরিসরটি মনস্তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানাত্মক মাত্রা যোগে ক্রমপ্রসরণমান আলোচনার ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা হয়ত মনে করতে পারবেন যে, মডিউলের একবারে প্রথম এককে যেখানে ধারণাগত কাঠামোগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে আমরা সংক্ষেপে মনস্তাত্ত্বিক এবং জ্ঞানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি দুটির উল্লেখ করেছি। আর এখন এই দৃষ্টিভঙ্গি দুটিকে নিয়ে আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

৪.৫.১ তথ্য সম্বন্ধীয় অথবা Cybernetic দৃষ্টিভঙ্গি (The Informational or Cybernatic Viewpoint)

মনস্তাত্ত্বিক অথবা জানাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনায় প্রবেশ করার আগে বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিত কার্ল ডব্লিউ ডয়েস (Karl W. Deutsch)-এর সাইবারনেটিক তত্ত্ব কাঠামোটির দিকে এক ঝলক দেখে নেওয়া যেতে পারে। ডয়েস এই ভাবে সতর্ক করে দিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন যে, আমরা যদি সত্যিই বোঝার চেষ্টা করি যে রাষ্ট্রগুলি তাদের নেতৃবৃন্দের স্থিরীকৃত লক্ষ্যগুলি অর্জন কেন করতে চায়, তাহলে এটা জানা অবশ্য কর্তব্য যে কীভাবে একটি রাষ্ট্র তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কারণ, ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণকারী মেকানিজম (mechanisms) প্রয়োজনীয় যা সাইবারনেটিক হিসেবে বিবেচিত হতে চায়। এখন এই সমস্ত 'আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্যে উল্লেখিত তিনটি তথ্য প্রবাহের নিরন্তর মিশ্রণ, বিশ্লেষণ এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে'; এই তথ্য প্রবাহের মধ্যে থাকে: (ক) 'বাইরের পৃথিবী থেকে আসা বার্তা প্রবাহ'; (খ) 'এককের নিজস্ব প্রণালী ও সম্পদ উদ্ভূত বার্তা প্রবাহ (যা তাঁর/তাঁদের মর্যাদার সূচক/ নির্দেশক)'; এবং (গ) 'স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা বার্তা প্রবাহ'। তাই, ডয়েসের কাছে যে কোন স্বাধীনতা স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে 'ক্রিয়াশীল তথ্য-প্রক্রিয়ার কাঠামো', অথবা 'চ্যানেল' থাকাটা জরুরি কেননা এই গুলিই বিভিন্ন বার্তার মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও ভারসাম্যের কাজটি করে থাকে। কেবল তখনই একটা স্বয়ং চালিত

ব্যবস্থা সংগঠনের নিম্নস্তর থেকে উচ্চ স্তর অবধি অর্থাৎ ব্যক্তিমূক ব্যবস্থা থেকে সরকারি স্তরে এই ভারসাম্য এবং সমন্বয়ের [redacted] করতে সমর্থ হয় ও এর মধ্যে 'খুঁজে পায় লাভ এবং স্বাতন্ত্র, আত্মপরিচয় ও স্বাধীনতা'। ডয়েসচ মনে হয় এর মাধ্যমেই বিদেশনীতিকে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্য হিসেবে এগুলিকে বিবেচনা করার কথা বুঝিয়েছিলেন।

যদি মূলগত দিক হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে নতুন তথ্যের সঙ্গে ধূসর স্মৃতির সংযুক্তির বিষয়টি থাকে, তবে আমাদের অবশ্যই বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রাসঙ্গিক স্মৃতিগুলির উৎস ও চরিত্র সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। ডয়েসচ যথার্থই বলেছেন যে, ব্যক্তির স্মৃতির সিংহভাগ যেখানে তাদের মস্তিষ্কের মধ্যেই থাকে, সেখানে রাষ্ট্রগুলির স্মৃতি ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন স্থানে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি সঞ্চিত থাকে হয় রাষ্ট্রপ্রধানদের মস্তিষ্কে নতুবা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের মস্তিষ্কে, বা রাষ্ট্রীয় এলিটদের মধ্যে ও রাজনৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। এখানে এই উক্তিটি কেবল প্রাসঙ্গিক নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে। 'But the really important memories are stored in the heads of the entire population, and in their culture and language'। আমাদের শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় স্মরণে রেখেছেন যে, দ্বিতীয় এককে বিদেশনীতির নির্ধারক সমূহ আলোচনার সময় আমরা একে রাজনৈতিক ঐতিহ্য হিসেবে অভিহিত করেছিলাম। এই 'শব্দ বা বাক প্রতিমার ভাণ্ডার, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পছন্দাপছন্দ সমূহ' এর মধ্যে সংগুপ্ত থাকে এক ধরণের গোঁড়ামি (prejudices) ও দ্বিধাদীর্ণ মনোভাব কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষেত্রে। এমনকি কখনও বা দেখা যায় নীতিকারদের অগোচরেই বা অজান্তেই বিশেষ কোন কোন বাহ্যিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পক্ষপাত অথবা পুর্বানুমানের ভিত্তিতে অবস্থান গ্রহণ করতে। তবে, এই সঞ্চিত স্মৃতির নিরাপদ অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়, 'মানচিত্রে, ছবিতে, স্মৃতিস্তম্ভে এবং গ্রন্থাগারে; কূটনৈতিক প্রতিবেদনে ও নীতি সম্বলিত মেমোরান্ডামে; বিভিন্ন সংগঠনে; বিবিধ আইনে এবং (সম্পাদিত) চুক্তিগুলিতে'। ডয়েসচ উল্লেখ করেছেন যে, সরকার অথবা CIA-এর মত বিশেষজ্ঞ সংস্থার কাছে এই বৃহৎ স্মৃতিচিত্রের ফাইল এবং স্মৃতি সম্পদ রক্ষিত আছে যার মাধ্যমে একে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা সহজ। এর ফলে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দ্রুততার সঙ্গে এবং নিখুঁত ভাবে চিহ্নিত করে উন্নততর সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজে করা যায়।

ডয়েসচ এমন এক পরিস্থিতির কল্পনা করেছেন যেখানে অন্য একটি দেশের অচিন্তিপূর্বক কোন রাজনৈতিক সংকটের ব্যাপারে বার্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে পৌঁছে যায়। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে একেবারে আক্ষরিক অর্থে না হলেও ঐ দেশের সংকট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত তথ্যাদির মধ্যে থাকে ঐ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, উক্ত দেশের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-সামরিক পরিস্থিতি, ব্যক্তিগত ও সরকারি বিনিয়োগের নিরিখে আমেরিকার স্বার্থের গুরুত্ব এবং তার পরিমাণ ও আমেরিকার বৃহত্তর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক হিসেবের মধ্যে সঙ্কটাপন্ন দেশটির গুরুত্ব; একই সঙ্গে, সামরিক ঘাঁটি সৈন্য, যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা, ক্ষেপনাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সামরিক সজ্জার বহর এবং সেই অঞ্চলে প্রকৃত ও সম্ভাব্য বন্ধুভাবাপন্ন দেশের ব্যাপারেও তথ্য সংগহ করাটা জরুরী। এখনে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সকল তথ্যাদি আহরণের পরেও ঐ আধিকারিক নিজে থেকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি এ'ব্যাপারে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক মতামতের সমর্থন, রাষ্ট্রপতির ও কংগ্রেসের এই ইস্যু সম্পর্কে অবস্থান, প্রাধান্যকারী স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির ঘোষিত পছন্দাপছন্দ এবং শেষতঃ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন বা অসমর্থনের বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হচ্ছেন।

ব্যক্তিগত স্মৃতির খামতিটুকু মেটানোর জন্য আধিকারিক পুরানো প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক ফাইলগুলি বের

করে দেখতে পারেন। সাম্প্রতিক নীতি সম্বলিত মেমোরান্ডার উপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন; অন্যান্য লিখিত উৎসগুলির সাহায্য নিতে পারেন এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং অন্যান্য সিভিল ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ ও আলোচনা করতে পারেন এবং এই বিষয়ে আমলাতন্ত্রের উচ্চ পদাধিকারীদের অবহিত করতে পারেন যাঁরা পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে এ ব্যাপারে সবিশেষ তথ্য সরবরাহ করবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর নিজের স্মৃতির এবং স্মৃতিধৃত তথ্যের কাছে ফিরে যাবেন এবং নিজস্ব চিন্তাভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাই হতে পারে চূড়ান্ত পরিণামী। এই সবগুলির মধ্যে সাধারণভাবে জনগণ সরকারের বাছাই করা স্মৃতিগুলি উদ্ধার করে স্মৃতিভাণ্ডার এবং সমাজ থেকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য। ১৯৫০ সালের কোরীয় সংকটের সময় এই স্মৃতিনির্ভর প্রক্রিয়াটি কিভাবে ক্রিয়া করেছিল তা পরখ করে নেবার পর ডয়েসচ আমাদের অন্য এক ধরনের জটিলতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। স্মৃতিতে রয়ে যাওয়া এই ঘটনাগুলি অনরূপ দিক নির্দেশ নাও করতে পারে যেমনটি দেখা গিয়েছিল কোরয়ী সংকটের সময়। বিষয়গুলিকে জটিলতর করে তোলে যখন আগত তথ্যাদির সঙ্গে সঞ্চিত বাকপ্রতিমা বা ইমেজগুলির সংঘাত ঘটে। অধিকন্তু, এইসব সাম্প্রতিক বার্তাগুলির সঙ্গে স্মৃতিধৃত ঘটনার আন্তরমিশ্রণের মাধ্যম পৌঁছানো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তগুলি কখনই অনিবার্য হতে পারে না, কারণ সিদ্ধান্তগুলি পরিস্থিতি নির্ভর। এমনকি যদিও কিছু কিছু সিদ্ধান্তের পরিণাম অন্যদের অপেক্ষা অনেক বেশি অনুরূপ, তথাপি সমগ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটিই মূলত 'probabilistic and combinatorial'। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডয়েসচ আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত উপাদনের বিচিত্রতা এবং বহুত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়টি আমরা তিন নম্বর এককে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। বিদেশনীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার তিনি যে তিনটি ইমেজ ব্যবহার করেছেন তা উদ্ধার যোগ্য। প্রথম ইমেজটি হল 'pinball machine'; দ্বিতীয় ইমেজটি হল 'random woak model'; এবং তৃতীয়টি হল 'gambler's ruin'। আমরা এখানে তাঁর প্রথম ইমেজ বিষয়ে বক্তব্যটি উদ্ধৃত করব: 'The making of foreign policy thus resembles a pinball machine. Each interest group, each agency, each important official, legisaltor, or national leader, is in the position of a pin, while the emerging dicision resembls the end-point of the path of a still-ball bouncing down the board frm pin to pin. Clearly, influence on the outcome of the game. But no one pin with determine the outcome. only thedistribution of the relevant pins on the board–for some of many pins may be so far out on the board as to be negligible-will determinethe distribution of the outcomes. The distribution often can be predicted with fair some pins will be placed more strategically than others and on the average they will thus have a somewhat greater confidence for large number ofruns,but for the single run-as for the single decision–even at best only some probability can be stated. To ask of a government of a large nation who "really" runs it–presumably from behind the scenes–is an in 'i' ve asking which pin "really" determines the outcome of the pinball game.'

কোন একজন বলতেই পারেন যে, কেন আমরা একে এখানে একটা মনস্তাত্ত্বিক ধরণের জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখাচ্ছি যেখানে ডয়েসচ বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিস্থিতিগত প্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এবং প্রশ্নটি এই কারণেও উঠতে পারে যে আমরা তো এখানে এই এককে এই বিষয়টি নিয়ে তেমন গভীরে আলোচনা করছি না। আমাদের যুক্তি হল এই যে আমরা এটা আলোচনা করছি এইজন্য যে ডয়েসচের কাছে একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মনটাও একটা পিনবল বোর্ডের মত. তিনি যেমন বলেছেন: similar

combinatorial process, resembling some ways our pinball game, also may be going on in the mind of any individual political leader or decision maker. He is likely to receive many different messages from the outside world, all bearing on the decision he must make; and he may recall many different items from memory–both memories of facts and memories of preferences–which bear on his decision. No outside observer,nor indeed the decision maker himself, may be able to say which single item recalled from memory, decisively influenced the way in which he finally made up his mind, and the course ofaction he chose.'

উদ্ধৃত ব্যাকাংশগুলি আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন বহিরাগত না বলতে পারে যে ঠিক 'কোন বাইরে থেকে আসা তথ্য' অথবা 'স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত ঠিক কোন তথ্যটি' সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রণোদিত করেছিল, বিদশে নীতির বিশ্লেষণটি গোড়াতেই হোঁচট খাবে। অবশ্য ডয়েস এখানে আমাদের নিশ্চিত করতে চেয়েছেন এই বলে যে, বহু মানুষের অংশগ্রহণের খেলায় এই পরিস্থিতিটি এতটা ঘোলাটে নয়। এ-প্রসঙ্গে তিনি আবার পিনবল মেশিনের কাল্পনিক চিত্রের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর মতে, 'Though it is difficult to predict the outcome of a single run on a pinball machine, it is not nearly so hard to predict the distribution of a series of such runs.' ডয়েস বলেন যে পরিস্থিতিটি ডাইস গেমের অনুরূপ যেখানে ডাইসের একবার ছোঁড়াকে সংখ্যা দিয়ে মূল্যায়ন করার ভবিষ্যৎবাণী করাটা অসম্ভব; কিন্তু যদি কেউ সমানে ডাইসটি ছুঁড়ে যেতে থাকে তবে অঙ্কের যৌক্তিক নিয়মানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে 'সর্ব মোট সময়ের এক ষষ্ঠাংশে সাতবারের বার এবং ঐ সময়ে একশ ছত্রিশ বারে দ্বাদশ সংখ্যার' ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎবাণী করাও যেতে পারে। তাই, ফাটকা বা জুয়ার খেলায় পরিণমের সম্ভাব্য ফলের বণ্টনে, যেমনটি এখানে পিনবল মেশিনের কথা বলা হয়েছে, কোন এক ব্যক্তিকে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে ফাটকা বা জুয়া খেলার যৌক্তিক কৌশল জোগান দিতেও পারে। এর থেকেও ডয়েস যুক্তি দিয়েছেন এমনকি সাদামাঠা, 'knowledge of the probability distribution of the decisioins of a political leader, or of a political organization, a government, or a nations, is to know something about what we call their political 'character'; এবং এটি জোগান দিতে পারে 'the basis of a rational strategy that could be pursued in regard to them in politics'।

ডয়েস সরকারকে একটা লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য দিতে অস্বীকার করেন না, কিন্তু একই সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, সরকার তার লক্ষ্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করে স্বেচ্ছায় এবং যন্ত্রের মত। উভয় ক্ষেত্রেই এটা করে সরল trial and error পদ্ধতিতে সদর্থক ও নঞর্থক feedback থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ব্যবহার করে। কিন্তু, ডয়েস উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে, বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অথবা স্বার্থগোষ্ঠীগুলির আচরণ সব সময়ে উদ্দেশ্যমূলক (purposive) নাও হতে পারে। এর কারণ হল এককভাবে বা যৌথভাবে মানবিক ক্ষমতার সসীমতা, অথবা সাইবারনেটিক্স এর ভাষায় ব্যবস্থার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা। বহু পূর্বে তাঁর ধ্রুপদী গ্রন্থ *Nerves of Government* এ feedback এর চারটি উপ-ধারণার অবতারণা করেছেন। এগুলি হল : 'load', 'lag' 'gain' এবং 'lead'। এর মধ্যে 'load' বলতে বোঝায় কোন এক নির্দিষ্ট সময়কালের ভিতর সার্বিক তথ্য গ্রহণের ক্ষমতা। 'load' এর সামর্থ নির্ধারিত হয় না কেবল 'গ্রাহক (receptors)' এবং 'কার্যনির্বাহক (effectors) -দের সামনে লভ্য চ্যানেলের সংখ্যা ও প্রকারভেদের মাধ্যমে, 'responsiveness fidelity', 'background notice' ইত্যাদির মাধ্যমেও তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ডয়েস বলেন :

'At all levels—among individuals, groups, and nations—the communication channels and messages direction them towards their goals are not the only ones that impinge on their behavior. Indeed several goals and several streams of messages from both without and within, may be competing for the limited available communication channels and for the time and the attention of the decision makers. Some of these coming inputs may be relatively random, and all of them may increase the confusion within the decision-making system and the overload on its channels, facilities, and personnel. This can result in making some part of its outputs relatively random, and hence, cause the whole input output cycle to be much less predictable in the distribution of its results.'

ডয়েস বলেন, এই সিদ্ধান্ত প্রণালীগুলির আচরণের এই randomness এর উৎসগুলির উৎপত্তি হল : ১) পরস্পর মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত ব্যবস্থা এবং অব-ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে কিছু কিছু অংশের বা সমগ্র অংশের আচরণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণীকরার অপারগতা, ২) বিভিন্ন এককের মধ্যেকার সংঘাত বা অসংগতি যাদের গৃহীত কৌশল একে অপরের অভীষ্টকে বিঘ্নিত করে এবং পরিণামে এমন সিদ্ধান্তের জন্ম দেয় যে তা কোন পক্ষের কাছেই কাম্য নয়, এবং ৩) ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার স্তরের মিথস্ক্রিয়ায় 'এক দেশের নেতার মেজাজ অথবা কোন বিষয়ে মাথা ব্যথা', 'অন্য দেশের জাতীয় শস্য উৎপাদনের ব্যর্থতার' সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়তে পারে, এবং এইসকল বিষয় আবার একত্র হয়ে 'বিশ্বব্যাপী ব্যবসা মন্দা বা অর্থনৈতিক সংকটের' সৃষ্টি করতে পারে।

বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত-গ্রহণ কে বা এর বিশ্লেষণকে যুক্তিসম্মত করে তোলার পক্ষে এই সব পদ্ধতি যদি যথেষ্ট না হয়, ডয়েস প্রদত্ত 'gambler's ruin'- এর তৃতীয় ইমেজটি সুনির্দিষ্টভাবে তা করে। ডয়েস বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমসাময়িক রাজনীতিতে যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণে ফাটকা বা জুয়ার অবকাশ রয়েছে, সেইহেতু 'বিদেশনীতিকারদের—একটি গণতন্ত্রে সক্রিয় এবং আগ্রহী নাগরিকরাও এর অন্তর্ভুক্ত—একটি মৌলিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন যেখানে একটা অন্তরলীন আঙ্কিক হিসেব থাকে যাকে 'gambler's ruin' নামে অভিহিত করা হয়'। যেহেতু সুযোগ বা chance এর দীর্ঘ খেলায় সেইসব জুয়ারি বা ফাটকাবাজদের সঞ্চয়ের পরিমাণ কম থাকে সেইজন্য খেলা শেষ হওয়ার অনেক আগেই তারা ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নিশ্চিত ভাবেই খেলার বাইরে চলে যায়, এবং ভবিষ্যতের কোন লাভজনক দৌড়ে শামিল হতে পারে না। ভাগ্য বিপর্যয়ে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাদের সম্পদ অপ্রতুল। খেলায় যত বেশি বিপত্তি থাকে খেলার ভাগ্যের বিচিত্রতা তত বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ধ্বংসের সম্ভাবনা তত বেশি হয়। এর থেকে ডয়েস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে একটি দেশ, এখানে একজন জুয়ারি, 'with the greater resources can afford more accidents and mistakes, and still stay in the game, while the gambler with scant reserves, must be very skilful, and indeed very lucky, to survive.' বাস্তবিকই যদি খেলা দীর্ঘ হয় যথেষ্ট, তবে নিশ্চিতভাবেই যে কোন পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভেঙ্গে পড়তে পারে। ডয়েস এই ইমেজটিকে প্রচলিত ও পারমাণবিক যুদ্ধ-এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করেছেন যেখানে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে স্পষ্টতই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

বিদেশনীতি গঠন প্রক্রিয়ায় এই ইমেজগুলি প্রয়োগ করে ডয়েস দায়িত্বশীল রাষ্ট্রনায়কদের 'এলব সীমাবদ্ধতাকে মাথায় রেখেই কাজ' করার কথা বলেছেন, এবং তাদের দেশগুলিকে পরামর্শ দিয়েছেন তাদেরকে অধিক 'সম্পদ ও সঞ্চয়ের জন্য প্রত্যাশিত এবং অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে' তা দেবার কথাই কেবল বলেন নি, বৃহত্তর নিরাপত্তার ভাবনাও ভাবতে বলেছেন। এর কারণ হল 'random walk model' এর থেকে শিক্ষা

এই যে, যদি কোন এককের অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সিদ্ধান্ত বিষয়ক পদক্ষেপ 'নিশ্চিতভাবে random হয়, তবে তিনি ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়ার থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন'। এছাড়াও, শত্রুপক্ষের গৃহীত নিক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় '... they can stay mindful of the imperfect knowledge and control and probable random elements among the actions taken by the other side ...'

আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে ডয়েস এখানে যেটা করেছেন তা হল একটা অনিশ্চয়তার আবহে feedback এবং load এর মত সাইবারনেটিক্সের ধারণা দুটি ব্যবহার করে বিদেশনীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একটি মডেলের স্কেচ বা ছবি। তিনি আশা নিয়ে দাবি করেছেন, 'Models of probabilistic processes can do more for the understanding and making of foreign policy than furnish us with general philosophical advice', যা আমরা এই এককে আলোচনার মধ্যে আনিনি। বরং বলা যায়, মডেলগুলি 'can tell us what initial facts, relationships, probabilities, and rates of change we need to know or need to estimate, what model of the process they imply, and, if the model should be reasonably realistic, what most-likely consequences ought to be expected and what less-likely-but-still-quite-possible alternative outcomes ought to be provided for' (Deutsch, 1989 : 81-96)।

৪.৫.২ বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে জ্ঞানাত্মক (cognitive) প্রক্রিয়া

যখন থেকে বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রটি পূর্বের ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত ক্ষেত্র সমীক্ষার পরিবর্তে একটি তাত্ত্বিক প্রয়াস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে, তখন থেকেই মনস্তাত্ত্বিক অথবা সমাজ মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে এক বিপুল পরিমাণ গবেষণামূলক কাজের উদ্ভব ঘটেছে। যেখানে প্রথম দিকের গবেষণায় প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, তার প্রায় অব্যবহিত পরেই গবেষণার মনোযোগ সরে যায় ঐ নীতিকারদের ব্যক্তিগত বোধ, ধারণা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরনের প্রতি। বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশ্লেষণে সরে যায় ঐ নীতিকারদের ব্যক্তিগত বোধ, ধারণা এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরনের প্রতি। বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশ্লেষণে 'জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার মডেলটি'র পক্ষে যুক্তি তুলেছিলেন সেই ১৯৭৬ সালে Ole Holsti। তিনি মূলত অ্যালিসনের BPM মডেলটির সমালোচনা করেছিলেন যা আমরা তিন নম্বর এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। Holsti অ্যালিসনের BPM মডেলটির যে সমালোচনা করেছেন তা হল এই যে মডেলটি আমলাতান্ত্রিক ভূমিকার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাৎপর্যপূর্ণ আন্তরসম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেন নি। এখানে তাঁকে উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন : 'Whether or not a leader defines a situation as a 'Crisis', perhaps depends on at least in part on basic beliefts about the political universe and these will not always correspond to or be predictable from his role.' এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মনোভঙ্গী বা 'mind sets' -এর নিবিড় আলোচনার প্রয়োজন। Holsti দেখিয়েছেন যে, বহু বিশেষজ্ঞই এই 'Cognitive process model' টিকে আমলাতান্ত্রিক রাজনৈতিক মডেলের তুলনায় বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে অনেক বেশি সাফল্যের সাথে ব্যবহার করেছেন।

বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে এলিটদের মনের 'জ্ঞানাত্মক মানচিত্র' নির্মাণের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেই সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি উঠেছে। এই মডেলটির বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হল এই যে, এখানে বেশিরভাগ

ক্ষেত্রেই বিদ্যমান গবেষণা একজনমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারীর বিষয়ে আলোকপাত করে। কিন্তু Holsti করেছেন যে, কিছু গবেষণা আবার এলিটদের অপেক্ষাকৃত বড় ধরণের নমুনা গ্রহণ করে গবেষণা চালিয়েছেন। এই মডেল বিষয়ে আর একটি আপত্তি হল এই যে এর প্রবক্তারা প্রণোদনা বা motivation নিয়ে আলোচনা করেছেন যাকে মর্গেনথাউ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Politics among Nations- এ পারদের মত পিচ্ছিল বা কুহকময় ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে বাস্তববাদী তাত্ত্বিকরা যতই প্রণোদনা কে অধৃতিযোগ্য বা অস্পশনীয় বলে মনে করুন না কেন এই ধারণাটি একেবারেই ব্যাখ্যার অযোগ্য কিন্তু নয়। কারণ, স্নাইডার এবং সহ গবেষকরা তাঁদের ধারণা কাঠামোয় প্রণোদনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি বড় নির্ধারক হিসেবে দেখেছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা 'setting' বা 'পরিবেশের' সঙ্গে 'এককের' একটা উৎকৃষ্টতর যোগসূত্র স্থাপনের কথা বলেছেন : এবং ব্যক্তিত্ব, ধারণা, মূল্যবোধ, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। কিন্তু এখানেও বিশ্লেষণটিকে এত সামান্যীকৃত স্তরে রেখেছেন, যে এই প্রনোদনামূলক বিশ্লেষণের কাজটি কীভাবে করা যায় তা অব্যাখ্যাতই থেকে যায় (Snyder in Rosenau, 247-53)। যদিও মূল সিদ্ধাত গ্রহণ কাঠামোটি কোরীয় সিদ্ধান্তের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক চলগুলির প্রয়োগ ঘটিয়েছিল, তথাপি এটা স্বীকার করতেই হবে যে, দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রটির প্রয়োগযোগ্যতা ঢের বেশি ছিল (Holsti, 1976 : 24)।

৪.৫.২.১ বিশ্বাস, ধারণাসমূহ, ইমেজ এবং বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াশীলতার সঙ্কেত (Operational Codes) : সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এলিটদের জ্ঞানাত্মক মানচিত্রের নির্মাণ স্তম্ভ বা building blocks

এখানে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রথমেই সতর্ক করা উচিত এই বলে যে, এমনকি 'জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেল'-টির পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার আগে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি গুলির মধ্যে থাকা বিভিন্ন উপাদান এবং ধারণাগুলি এই মডেলটি ব্যবহার করত যাকে 'জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেল'—এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বোল্ডিং (১৯৫৫) তাঁর 'ইমেজে'র ধারণাটি এবং হোলস্টি (১৯৬২) 'বিশ্বাস প্রণালী বা belief system এর ধারণার প্রবর্তন করেন এটা দেখানোর জন্য যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ধারণাগুলি বিদেশনীতির পছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনা ক্ষেত্রে এই নূতন ভাবনা এমনভাবে ছড়িয়েছিল যে, এই যুক্তি একটি অতি সরলীকৃত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা 'বাস্তব' পৃথিবীর প্রতি বিমুখতা দেখিয়ে কেবল এর 'ইমেজ'-এর প্রতিই দৃষ্টি দেন, যদিও এই ইমেজের সঙ্গে বাস্তবের যোগ নাও থাকতে পারে। জারভিস, যিনি সম্ভবত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধারণার গুরুত্ব বিষয়ে সবথেকে মান্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে, এমনকি যুক্তিসম্মত ভাবনাও ভুল ধারণার হাত থেকে কেন একজনকে মুক্তি দিতে পারে না। এখানে তাঁকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'The process of drawing inferences in light of logic and past experience that produces rational cognitive consistency also cause people fit incoming information into pre-existing beliefs and to preserve what they expect to be there' (Jervis, 1976 : 143)। অন্যত্র তিনি বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, আবারও তাঁর উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে : 'Actors must remember that both they and others are influenced by their expectations and fit incoming information into pre-existing images'। এর ফলে 'এককের' এই প্রভাবের সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তা তাকে 'অপরিপক্ক বা অপরিণত

অবস্থায় অন্যান্য বিকল্প ধারণাগুলিকে বাদ দিয়ে তার নিজের মতামতের বিষয়েই অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী করে তোলে ...।' অধিকন্তু, জারভিস উল্লেখ করেছেন, 'because people underestimate the impact of established beliefs and predispositions, they are slower to change their minds than they think they are'। সেই কারণেই এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে 'অন্যান্যদের আচরণের বিচিত্রতার প্রতি স্পর্শকাতরতার মাত্রা এবং কত সহজে তারা তাদের সম্বন্ধে সৃষ্ট ইমেজকে প্রভাবিত করতে পারে', তাকে বড় করে দেখানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পক্ষে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে যখন 'পূর্ব হতে বিদ্যমান বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণাকে গড়ে তোলে'। এর কারণ হল, 'the success of an actor's efforts to convince others to accept a desired image of him and his behavior will be in direct proportion to the degree to which this image is compatible with what others already believe' (Jervis, 4)। আমাদের শিক্ষার্থীরা এই বাক্যটির সম্পূর্ণ গুরুত্ব বুঝতে পারবেন যদি তাঁরা ইরাক আক্রমণের পর রাষ্ট্রপতি বুশ (জুনিয়র) এর গণতান্ত্রিক ইমেজ পুনরুদ্ধারের উভয় সংকটটির কথা স্মরণে রাখেন।

'জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেল'—এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে দুটি ধারণার—যা উক্ত মডেলটির আগে সৃষ্ট—জন্ম হয়েছিল, যার সঙ্গে হ্যারল্ড এবং মার্গারেট স্প্রাউটের নাম জড়িত। এই দুটি ধারণা হল, একজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ যাকে 'psycho milieu বলা হয়েছে, এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশ বা 'operational milieu'। এই দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে স্প্রাউট ও স্প্রাউট মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলতে বুঝিয়েছেন সেই 'পরিবেশকে যেখানে একজন বিশেষ ব্যক্তি ঐ পরিবেশের প্রতি তার ধারণা এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন'। এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশ বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন 'ব্যক্তির সামগ্রিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সৃষ্ট পরিবেশকে, যেখানে পরিবেশ ব্যক্তির কাছে এমনভাবে প্রতিভাত হয় যে বিশেষ ঐ ব্যক্তিটি সবকিছুই দেখতে পায় এবং সবকিছু সম্পর্কেই সবিশেষ জ্ঞাত' (Sprout and Sprout, 1965 ; 136)। গত শতকের মধ্য ষাটের দশকেই স্প্রাউট দম্পতি বিদেশনীতির বিশ্লেষণে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যেকার গভীর পার্থক্যটি বুঝে গিয়েছিলেন। তাঁরা লিখেছেন :

'Instead of drawing conclusions regarding an individual's probable motivations and purposes, his environmental knowledge, and his intellectual processes linking purposes and knowledge, on the basis of assumptions as to the way people are likely on the average to behave in given social context, the cognitive behavioralist—be he narrative historian or systematic social scientist-undertakes to find out as precisely as is possible how specific persons actually did perceive and respond in particular contingencies' (ibid, 118)।

এখানে স্প্রাউট এবং স্প্রাউট স্পষ্টতই বিদেশনীতির বিকল্প হিসেবে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়াটির গুরুত্বকে আন্দাজ করেছিলেন। কিছু পাঠ্য পুস্তক রচয়িতা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলির আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং খুঁটিয়ে আলোচনার অন্যান্য প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের নানান গৃহীত সিদ্ধান্ত বা পরিমাণগত এবং গুণগত বিশ্লেষণ সম্পর্কিত উদ্ধৃতি, পর্যবেক্ষণ ও দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে এবং যার মধ্য দিয়ে তাঁদের ধারণা বা perceptions এর প্রকাশ ঘটেছে। এর মধ্যে আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিস্থিতির প্রতিবেশ বা simulation মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার নেওয়া, এবং তাঁদের মনস্তত্ত্বের নিখুঁত পর্যবেক্ষণও আলোচনার আওতায় এসেছে (Taylor, 148-49)। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় হোলস্টির জন ফস্টার ডালাসের 'belie system' কে নিয়ে বিখ্যাত আলোচনার কথা, যেখানে ডালাস একাই ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ সাল অবধি

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন বিদেশনীতিটি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হোলস্টি এই আলোচনাটি প্রথমে একটি প্রবন্ধে এবং পরে একটি আস্ত গ্রন্থে (1962) বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে আমেরিকার ঠাণ্ডা যুদ্ধকালীন বিদেশনীতিটি অন্যান্য অনেক বিস্তারিত ঐতিহাসিক আলোচনার চেয়ে ভালোভাবে করেছেন। হোলস্টি তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে কুইন্সি রাইটকে উদ্ধৃত করেছেন। হোলস্টি কর্তৃক উদ্ধৃতাংশটি নিম্নরূপ : 'The relationship of national images to international conflict is clear : decision-makers act upon their definition of the situation and their images of states—others as well as their own. These images are in turn dependent upon the decisio-maker's belief system, and these may or not be accurate representations of 'reality'. Thus it has been suggested that international conflict is not between states, but rather between distorted images of states'.

তাই, হোলস্টি ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ডালাসের দেওয়া ৩৫৮৪ টি উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ করে প্রথমে ৩৫৮৪ টিকে 'মূল্যনিরূপক (evaluative) বক্তব্যের' তালিকা প্রস্তুত করেছেন, এবং তারপর তাদের শ্রেণীবিভাজন চারটি শ্রেণীর একটি হিসেবে। এগুলি হল : ১) 'সোভিয়েত নীতি : বন্ধুত্ব বিরুদ্ধতার বিরামহীন সম্পর্কের ভিত্তিতে মূল্যায়িত' (এর ভিতর ২,২৪৬ টি এই সম্পর্কিত বক্তব্য রয়েছে), ২) 'সোভিয়েত সামর্থ্য : শক্তি ও দুর্বলতার বিরামহীন নিরিখে মূল্যায়িত' (৭৩২ টি উদ্ধৃতি), 'সোভিয়েত সাফল্য : সন্তুষ্টি—হতাশার যতিচিহ্নহীনতার নিরিখে মূল্যায়িত' (২৯০ টি উদ্ধৃতি), ৪) 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মূল্যায়ন : 'ভালো-মন্দের বিরামহীনতার বিচারে মূল্যায়িত' (৩১৬ তই উদ্ধৃতি)। এই মূল্যানিরূপক উদ্ধৃতিগুলির নির্গলিতার্থ বিশ্লেষণ করে হোলস্টি সোভিয়েত ইউনিয়মের ডালাসীয় ইমেজটি নির্মাণ করেছিলেন। ডালাস সোভিয়েত ইউনিয়নের ইমেজটি গড়ে তুলেছিলেন নাস্তিকতাবাদ, সামগ্রিকতাবাদ, এবং সাম্যবাদের ভিত্তিতে। হোলস্টি দেখিয়েছেন যে, ডালাস গভীরতভাবে বিশ্বাস করতেন যে কোন স্থায়ী ব্যবস্থাই উপর্যুক্ত তিনটি ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। (Holsti, 1962 : 244, 246-47, passim)।

পরবর্তী সময়ে, হোলস্টি 'operational code' -এর ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন ডালাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়াটির রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে। 'operational code' -এর ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন কাঠামো—কার্যকারণবাদী (structural-functionalist) -সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট কে মর্টন তাঁর ধ্রুপদী প্রবন্ধ 'Bureaucratic Structure and Persobality' তে ১৯৪০ সালে। নাথান লিটেস (Nathan Leites) যথাক্রমে ১৯৫১ এবং ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত দুই খণ্ড— The operational code of Politburo এবং A Study of Bolshevism-এ রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের আলোচনা ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করেন। আরও পরের এক গ্রন্থে তিনি মর্টন ব্যবহৃত operational code-এর অর্থকে আরেকটু প্রসারিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেন মনস্তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপাদানগুলিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে। এর দেড় দশক পড়ে আলেকজান্ডার জর্জ তাঁর ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত একটি সমালোচনা প্রবন্ধ—The 'operational code' : A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-making -এ Leites -এর প্রবন্ধটির বিস্মৃতিতে চলে যাওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এই উপেক্ষার জন্য অবশ্য তিনি তাঁর যুক্তির চূড়ান্ত জটিলতাকেই দায়ী করেন। জর্জ দৃষ্টিভঙ্গিটির সরলীকরণ করেছেন এবং একে পাঁচটি দার্শনিক প্রশ্ন ও পাঁচটি জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নে বিভক্ত করেছেন। আমাদের এই পরিসরে এটি আলোচনার অবকাশ নেই, যদি থাকতও তথাপি শিক্ষার্থীদের অযথা ভারাক্রান্ত করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় বলে মনে করি। বরং আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে অবহিত করব যে, হোলস্টি জর্জের লিটেসের 'operational

code' -এর ধারণার সরলীকরণের ব্যাপারটি আলোচনায় এনেছিলেন এটা দেখাতে যে কীভাবে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া ছাড়াও, পরিস্থিতিগত বৈশিষ্ট্যাবলী সেইসব বিশ্বাসের জন্য একটা জায়গা রেখে দেয় যেগুলি বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত আচরণকে প্রভাবিত করে। অস্পষ্টতা, তথ্যের অপ্রতুলতা এবং এর জটিলতার কারণে বিভিন্ন পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্নভাবে যেহেতু ব্যাখ্যাত হতে পারে, এবং সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তাদের বিশ্বাসের কারণে বিভিন্ন বিকল্পকে চিহ্নিত করার কাজ ও তা বাছাই করে থাকে, সেইহেতুই হোলস্টি 'operational code' -এর ধরন বা প্রকার নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন যা নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলিতে একটি জ্ঞানাত্মক পারম্পর্যের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব রয়েছে। এখানে বিশ্লেষণের প্রধান এককটি হল কোন একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা তার বিশ্বাসের প্রণালী (belief system) দ্বারা সীমাবদ্ধ। মৌলিক ধারণাগুলি হল দার্শনিক, যান্ত্রিক (instrumental)-বিশ্বাস, বিশ্বাস প্রণালী এবং বিদেশনীতি বিষয়ক strategy বা উদ্ভাবন দক্ষতা ও কূটকৌশল, একই সঙ্গে অনুমানের সুপরিচিত পদ্ধতিটি হল যৌক্তিক পারম্পর্যের নীতিসূত্র। এর দুটি অনুসিদ্ধান্ত হল : ১) একটি বিশ্বাসের আর একটি বিশ্বাসকে নিশ্চিত করে এবং ধীরে ধীরে তা একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রণালীতে শিলীভূত হয়, এবং ২) সুসংজ্ঞাত বা সুপরিচিত পরিস্থিতিতে বিশ্বাসগুলি পছন্দের পাল্লাকে নিয়ন্ত্রিত করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রূপ নেয়।

Walker বলেন যে, জর্জের operational code -এর তত্ত্ব পুনর্বিন্যাস করে হোলস্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনায় ১৯৬৯ সালে জর্জেরই প্রবন্ধ-চিন্তা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে এর সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন, একই সঙ্গে জ্ঞানাত্মক পারম্পর্য, এর মনস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা, এবং operational code-এর আচরণগত পরিণামের বিষয়ে নতুন ধরণের অনুসন্ধানের পথটি চিহ্নিত বা সংজ্ঞাত করেন। আমেরিকার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা, যাঁদের ক্ষেত্রে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা হয়েছিল যে তাঁরা জর্জ লিখিত প্রবন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তালিকায় রয়েছেন : জন ফস্টার ডালাস, ফ্র্যাঙ্ক চর্চা, আর্থার ভ্যান্ডেরবার্গ, ডিন অ্যাচিসন, হেনরি কিসিঞ্জার, জেমস এফ বায়ার্নস, জে উইলিয়াম ফুল ব্রাইট, এবং মার্ক হ্যাটফিল্ড। হোলস্টি এই ক্ষেত্র সমীক্ষাগুলিকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এটা নির্ধারণ করার জন্য যে, যে সমস্ত তথ্যদি এগুলি থেকে উঠে এসেছে তার দ্বারা পারম্পর্য বজায় রেখে বিশ্বাস কাঠামোগুলি operational code -এর প্রকারভেদগুলিকে যথাযথভাবে সাহায্য করে কী না। কিন্তু যেহেতু এই ক্ষেত্রসমীক্ষা গুলির কোনটাই বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের পরিমাণবাচক প্রকৌশল যথেষ্ট ভাবে ব্যবহার করে নি, সেইহেতু হোলস্টিকে প্রামাণিক উপস্থাপনার জন্য অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যবহার করেই তৃপ্ত থাকতে হয়েছিল (Walker, 1990 : 403-10)।

৪.৫.২.২ হোলস্টির পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ

হোলস্টির পরবর্তী সময়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টির বিশ্লেষণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে সমাজে এলিটদের বিশ্বাস প্রণালীর উপরই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন, কিছু কিছু মনস্তত্ত্ববিদ এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে অচল বলে অভিহিত করেছিলেন। কারণ, সেই ১৯৭০ এর দশক থেকেই মনস্তত্ত্ববিদগণ তাঁদের নিজস্ব তাত্ত্বিক কাঠামোকে (schemas) বিদেশনীতির বিশ্লেষণে অনেক বেশি ফলপ্রসূ বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁদের মতানুসারে, এই তাত্ত্বিক কাঠামোগুলি বিদেশনীতির বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে, যা কেবল মাত্র বিশ্বাস প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কারণে আলোচনা বিশ্লেষণের বাইরে থেকে যায়। ডেবোরা ওয়েলচ লারসেন (Deborah Welch Larson) যুক্তি দিয়েছেন, মনস্তাত্ত্বিকদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বিদেশনীতির বিশ্লেষণে উন্নততর দেখার চোখ তৈরি করে দেয়, যেহেতু একটা অধিনির্মাণ (metaconstruct) হিসেবে এর তাত্ত্বিক অবস্থানটি 'বিশ্লেষণের উচ্চতর স্তরে (এবং) এটি বিশ্বাস প্রণালীগুলির সাথে সাথে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট উদাহরণ এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা (analogies) সমূহকেও বিশ্লেষণে সমর্থ। সেই মত, এই তাত্ত্বিক কাঠামোগুলি জ্ঞানাত্মক কাঠামোর গবেষণায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সামাজিক মনস্তত্ত্বের মধ্যে যে ফাঁক তা পূরণ করার মাধ্যমে একটা সেতুবন্ধনকে সম্ভব করে তোলে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বিশ্বাস প্রণালীর সঙ্গে এই তাত্ত্বিক কাঠামো বা shema গুলির পার্থক্যটি কোথায়? লারসন, মিল্টন রোকিচ (Milton Rokeach) কে উদ্ধৃত করে বিশ্বাস প্রণালীটির সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞানুযায়ী বিশ্বাস প্রণালী হল 'একজন ব্যক্তির প্রাকৃতিক পৃথিবী, সামাজিক জগত এবং আত্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের সামগ্রিক বিশ্ব জগত'। বিপরীতে, 'operational code' সম্পর্কিত বিশ্বাস প্রণালীটি হল একগুচ্ছ বিশ্বাসের সমাহার, যেখানে রাজনৈতিক বিশ্ব সম্পর্কে বিশ্বাস থাকে, এর মধ্যে আবার রাজনীতির প্রকৃতি বিষয়ে দার্শনিক বিশ্বাসসমূহ ও কোন একজনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম উপায় বিষয়ে যান্ত্রিক বিশ্বাসও (instrumental beliefs) অন্তর্ভুক্ত।' অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই তাত্ত্বিক কাঠামোগুলি যেখানে বিশ্বাস প্রণালীগুলির তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে কিছু সাধারণ এবং অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের সাযুজ্য রয়েছে, বিশেষ করে বিশ্ব জগত সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যের ক্ষেত্রে। লারসন বহু মনস্তত্ত্ববিদকে উদ্ধৃত করে এই যুক্তি দিয়েছেন যে, schema-কে বরং একধরণের জ্ঞানাত্মক কাঠামো হিসেবে দেখা যেতে পারে, যা একটা ধারণা বিষয়ক জ্ঞান বা উদ্দীপকের প্রকারভেদের সঙ্গে তুলনীয়, এবং এর মধ্যেকার বৈশিষ্ট্যবলী ও তাদের অন্তঃস্থিত সম্পর্কটিও এর বিবেচনাধীন। বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে, 'It is an abstraction from experience with a subject, rather than a definition or collection of cases'. লারসন এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, 'Schemas may differ from belief systems not only in organization but in content. Schemas include specific instances, exemplars, and analogies as well as the more abstract knowledge found in belief systems'. এর বিশিষ্টতা রয়েছে এই স্বীকৃতির মধ্যে, 'সাধারণ মানুষ প্রায়শই সমস্যার সমাধান খোঁজে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উদাহরণ থেকে, কোন বিমূর্ত প্রতিপাদ্য থেকে নয়'। উদাহরণ হিসেবে লারসন রাজনৈতিক ইস্যু এবং সমস্যাগুলিকে সাধারণ গল্পের অথবা স্ক্রিপ্টের স্তরে নামিয়ে এনেছেন, যেখানে তিনি 'হলিউড ছবির বিভিন্ন প্রযোজকদের সঙ্গে সোভিয়েতগুলির তুলনা টানতে পছন্দ করেন, কারণ তিনি Screen Actors Guild এর প্রধান হিসেবে কাজ করেছিলেন।'

লারসন ঐতিহাসিক সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনাগুলিকে তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোর (schemas) মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন, কারণ কখনও কখনও স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদেরকেও ঐতিহাসিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা অথবা সরলীকৃত স্লোগানকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। রবার্ট ম্যাকনামারার মত প্রবীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকেও প্রায়শই ঐতিহাসিক তুলনার ব্যবহার করতে দেখা গেছে ভিয়েতনাম পরিস্থিতিকে তরল করে দেখানোর জন্য। এই প্রবণতাটি ম্যাকগেওর্গ বুন্ডি, ডিন রাস্ক, ওয়াল্ট রস্টো, আর্থার স্লেসিংগার এবং জেমস টমসনের মত উচ্চাসীনে থাকা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যেও দেখা গেছে। ঐতিহাসিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার প্রতি তাঁদের এই আনুগত্যটি উঠে এসেছে এই ঘটনা থেকে তাঁরা প্রত্যেকেই সুবিখ্যাত অ্যাকাডেমিশিয়ান ছিলেন। তাঁদের বিষয় ছিল হয় ইতিহাস নতুবা রাজনীতিশাস্ত্র, পরে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর দায়িত্ব নেন। সেই জন্যই তাঁরা প্রায়শই ভিয়েতনাম এবং কোরিয়া, মিউনিখ এবং মালয়ের সঙ্গে অযথার্থ ও অস্পষ্ট তুলনা টানতেন (Larson, 1994 : 17-21)।

৪.৫.২.৩ বিশ্বাস প্রণালীতে নিরবচ্ছিন্নতা এবং পরিবর্তন

আমরা যেহেতু আমাদের বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে এলিটদের ভূমিকার জ্ঞানাত্মক মানচিত্রটির আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, সেইহেতু এখানে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের এই বলে সতর্ক করব যে, তাঁরা যেন বিশ্বাসসমূহ এবং তার বিশ্বাস প্রণালীকে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে না নেন, ধরে নিলে, এবং তাদের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতা বা নিরবচ্ছিন্নতার বিষয়টি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এবং এর পরিণতিতে তাঁরা একটি বিকৃত চিত্র পাবেন। জেরেল রোসেটি (Jerel Rosati) দেখিয়েছেন যে, যেখানে অনেক বিশ্লেষক রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, কার্টার প্রশাসনের 'আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার কোন সুসংবদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ ইমেজ' ছিল না, সেখানে অন্যান্য বিশ্লেষকরা যুক্তি দিয়েছেন যে, কার্টার প্রশাসনের সর্বদা একটি বিশ্বাস প্রণালী ছিল, আমেরিকার সম্পর্কে বা অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্কেও এই প্রশাসনের নির্দিষ্ট ইমেজ ছিল, কিন্তু তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল মাত্র। কার্টার প্রশাসন, 'বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে আশাবাদী এবং জটিল ধারণা' নিয়ে শুরু করলেও পরে তা তিক্ত ও হতাশাপূর্ণ (cynical) হয়ে ওঠে মুখ্যত : 'সোভিয়েত প্রসারনবাদের' স্পষ্ট প্রকাশের কারণে। রোসাটি রাষ্ট্রপতির, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জিগ্নিউ ব্রিজিজিন্সকির (Zbigniew Brzezinski) এবং স্বরাষ্ট্র সচিব সাইরাস ভান্সের (Cyrus Vance) 'image dissensus' -এর নিরিখে বিশ্বাস প্রণালীর পরিবর্তনটি ব্যাখ্যা করেছেন (Rosati, 1988)।

৪.৫.২.৪ জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেল : নীতি অভিমুখ এবং আরোহীমূলক জটিলতার কারণে ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তন (Cognitive Process Model : Policy Orientation and Back to Future for Inductive Complexity)

জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেলের আলোচনাটি শেষ করার আগে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের দুটি চূড়ান্ত কথা বলে নিতে চায়। প্রথমটি হল এই যে, এই মডেলটির লক্ষ্য কেবল এলিট সিদ্ধান্তকারীরা কীভাবে তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছন তার প্রক্রিয়াটির রেখচিত্র অঙ্কন করা নয়, এর সঙ্গে তাঁরা নীতি অভিমুখ বা লক্ষ্য স্থির করেন এবং কিছু ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাও বলেন। নীতি অভিমুখ নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের কথা যথেষ্ট স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন স্যাপিরো ও বনহাম (Schapiro and Bonham) : 'The choice of a cognitive process approach to foreign policy decision making is based only partly on the expectation that is a way to build a comprehensive theoretical framework which will allow us to explain and predict decision makers' responses to international events, including crisis decision-making and some situations that involve the dynamicy of planning and anticipation. A variety of theoretical orientations, perhaps even a personality trait approach, might also yield predictive accuracy. The choice of a cognitive process approach is related to our long-range goal for research—namely, recommendations for policy planning and execution in international politics'.

ভবিষ্যৎবাণীর উপাদানটি বা 'ভবিষ্যতে প্রত্যাবর্তনের বা back into the future, (আমরা এখানে জন মিয়ারশেইমারের ধারণাটি ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ধার করেছি)—এর ধারণাটি বনহাম ও শাপিরো কর্তৃক উল্লেখিত হোলস্টির উদ্ধৃতি থেকে এসেছে। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ ঃ

'Essentially, then, it is by projecting past experience into future decisions that human being make decisions, and statesmen, in this respect, are not exceptions. Foreign policy decisions, like other human decisions, imply not only an abstraction from history, but also the making of 'predictions'- the assessment of probable outcomes.'

বনহাম এবং শাপিরো মনে করেন, অভিজ্ঞতার আরোহীমূলক অনুসন্ধান যা এই মডেলটিতে অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত তা এই বোধ সঞ্জাত যে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা নতুন নতুন ঘটনার বিষয়ে দৃঢ় কোন বিশ্বাসের অনুপস্থিতির জন্য অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখান।' সেই জন্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা পূর্বে যাঁরা অ্যাকাডেমিসিয়ান ছিলেন তাঁরা যখন ভিয়েতনামের সঙ্গে কোরিয়ার আর মিউনিখের সঙ্গে মালয়ের তুলনা করেন তখন লারসন বিস্ময় প্রকাশ করেন (৪.৪.২.২ দেখুন)। এ ধরনের তুলনা যখন তাঁরা করেন তখন আদৌ অস্বাভাবিক কিছু করেন না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের বলব সেটি হল এই যে, জ্ঞানাত্মক জটিলতা বনাম সরলতার ইস্যুটি জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার মডেলটির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে শুরু করলে এটা বলা যায়, জ্ঞানাত্মক জটিলতা সদর্থক অর্থে 'কোন ব্যক্তির জনগণের আচরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎবাণী'র সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ, 'ধারণাগত ঝাড়াই বাছাই যত জটিল হবে, ভবিষ্যৎবাণী ততই ভালো হবে।' বনহাম এবং শাপিরো এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন : 'to the extent ... an individual is more complex or differentiated in the way he views the power configuration in the international system, he is apt to consider a broader range of approaches to conflict management' (Bonham and Schapira, 1973 : 147-74)।

৪.৬ কে বা কারা চূড়ান্তভাবে বিদেশনীতি নির্ধারণ করেন?

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা জানি যে, বিদেশনীতি গ্রহণের প্রক্রিয়ার আলোচনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিগত প্রেক্ষিত থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞানাত্মক প্রেক্ষিতের দিকে সরে এলেও আপনারা জানতে আগ্রহী যে, কে বা কারা চূড়ান্ত পর্যায়ে শেষ অবধি বিদেশনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। আপনারা প্রত্যেকেই অবহিত যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ব্যাপক বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাগুলিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে বোঝার ক্ষেত্রে যে বিচিত্র ও ব্যাপক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থিতি এবং একেকটি দৃষ্টিভঙ্গির একেক ধরণের ঝোঁকের উপর গুরুত্ব প্রদানকে মাথায় রাখলে, এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তবুও কিছু গবেষক এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। হারমান ও হারমান (১৯৮৯) অত্যন্ত অভিনব এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এর উত্তর খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরা দাবি করেন যে, বিদেশনীতি বিশ্লেষণের যে বিস্তৃত লেখাপত্র রয়েছে তাতে মোট তিনটি বড় বিকল্প চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এককের (decision units) ধরণকে চিহ্নিত করা যায়। এগুলি হল : ১) 'প্রাধান্যকারী নেতা', অর্থাৎ একজন নেতার হাতেই বিরোধীদের আমল না দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে, ২) 'একটি মাত্র গোষ্ঠী', যেখানে একটি মাত্র সংস্থার সদস্যরা যৌথভাবে প্রত্যক্ষ বাস্তব মিথস্ক্রিয়ায় কার্য পরিকল্পনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং অন্যদের আনুগত্য আদায় করে, ৩) 'বহুবিধ স্বাতন্ত্র্যযুক্ত একক', অর্থাৎ একটি সিদ্ধান্ত-গুচ্ছ বা decision-set যেখানে, প্রাসঙ্গিক এককেরা, 'separate individuals, group, or coalitions, which, if some or all concur, can

act for the government, but no one of which by itself has the ability to decide and force compliance on other, moreover, no overarching authoritative body exists in which all the necessary parties are members'.

হারমান এবং হারমান বিশ্লেষকদের উপর এই দায়িত্ব চাপিয়েছেন যে, তাঁরা যেন অবশ্যই বিদেশনীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যাঁরা এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাঁদের উপর্যুক্ত তিনটি বর্গের একটিতে শ্রেণীবিভাজন করে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা অবশ্য এপ্রসঙ্গে আমাদের এটা মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেখানে কিছু কিছু দেশে সমস্ত বিদেশনীতি বিষয়ক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রণালীটি একই রকম, সেখানে অন্য অনেক দেশেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককের প্রকৃতিটি নির্ভর করে কোন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তার উপর অথবা শাসন প্রকৃতিতে কি ধরণের পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে কিভাবে তা সম্পর্কিত তার উপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাষ্ট্রপতি কোন সাংবাদিক সম্মেলনে অস্বস্তিকর বা অদৃষ্টপূর্ব কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন স্বাধীনভাবে ও স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে। এখানে তিনিই প্রধান নেতা (predominant leader)। কিন্তু, সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে, প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন সামরিক বাহিনীর জয়েন্ট চীফব স্টাফ, যে সিদ্ধান্তটি পরে নিয়মতান্ত্রিক ক্ল্যান্ডার-ইন-চীফের কাছে প্রেরিত হয়ে থাকে। (এতই single group এর উদাহরণ)। আবার অন্য কিছু ক্ষেত্রে, যেমন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রপতি, শাসন বিভাগের উপদেষ্টা ও সেনেটের সঙ্গে যৌথ পরামর্শের ভিত্তিতে (এখানে বহু ধরনের স্বতন্ত্র একক থাকে)। একটা সংহত বৃক্ষের আদলকে মাথায় রেখে তাঁরা একটা অভিনব পন্থা বের করেছেন যার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান নেতা, একটিমাত্র গোষ্ঠী, অথবা বিবিধ স্বতন্ত্র এককদের চিহ্নিত করা যায়।

এই অভিনব পদ্ধতির প্রথমটি হল, বিশ্লেষককে প্রথমেই তাৎক্ষণিক মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে যা শাসকের বা বিদ্যমান regime —এর দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে (প্রথম পদক্ষেপ)। তারপর তাঁকে দেখতে হবে যে, ঐ শাসনকালের নেতৃত্বে একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা/ কর্তৃত্ব রয়েছে কী না বিবেচনাধীন ব্যাপারে সামরিক শক্তি প্রয়োগ বা তা হেফাজতে রাখার, যেখানে বিরোধীদের মতামত কী সে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না (পদক্ষেপ দুই)। এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হলে বিশ্লেষকের আর এগোনর প্রয়োজন নেই। আর যদি উত্তরটি ইতিবাচক হয়, তবে বিশ্লেষক দেখবেন যে, অতীতে ঐ নেতা বিদেশনীতি বিষয়ক ইস্যুগুলিতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন কি না বা ঐ ইস্যুগুলিতে বাস্তবে জড়িত ছিলেন কি না (পদক্ষেপ তিন)। আবার যদি এই প্রশ্নের উত্তরটি নেতিবাচক হয় তবে, বিশ্লেষক খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন সাম্প্রতিক বিদেশনীতির ইস্যুটি রেজিম বা সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কি না, এবং এর মোকাবিলার জন্য 'উচ্চ স্তরের কূটনীতি এবং প্রোটোকল রক্ষা' করার দরকার কি না (পদক্ষেপ চার)। এই প্রশ্নের উত্তরটিও যদি নেতিবাচক হয়, তবে বিশ্লেষককে পুনরায় খুঁজে দেখতে হবে যে, তাৎক্ষণিক ইস্যুটি কোন পরিচিত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না, যে ইস্যুটির সাথে ঐ নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা লাভের বিষয় জড়িত (পদক্ষেপ পাঁচ)। এক্ষেত্রে, প্রশ্নটির উত্তর নেতিবাচক হলে বিশ্লেষককে প্রধান নেতার চিহ্নিতকরণের কাজটি স্থগিত রাখতে হবে। কিন্তু, উত্তরটি ইতিবাচক হয়, তবে বিশ্লেষককে অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে হবে, প্রশ্নটি হল : উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ নির্দেশাবলী দেওয়ার পর তিনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়মিত ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন (পদক্ষেপ ছয়)? এক্ষেত্রেও যদি উত্তর নেতিবাচক হয়, তাহলেও বিশ্লেষকের প্রধান নেতার সন্ধান কাজে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু যদি উত্তরটি ইতিবাচক হয় তবে, বিশ্লেষককে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, সারাটা সময় জুড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় উক্ত নেতা তাঁর এজেন্ডার ঐ ইস্যুটিকে

রেখেছেন কি না নিয়মিতভাবে তাঁর পছন্দের ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে বা ঐ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের ভেটো ক্ষমতা প্রদান করেছেন কি না (পদক্ষেপ সাত)। এই পদক্ষেপটি এতই চূড়ান্ত যে, এর উত্তর নেতিবাচক না ইতিবাচক তা বিবেচ্যই নয়, সেই কারণেই, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রধান নেতার হাতেই থাকে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এককটি একটি মাত্র গোষ্ঠী না বিবিধ স্বতন্ত্র এককের হাতে ন্যস্ত কি না তা জানার জন্য বিশ্লেষকদের ভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সাহায্য নিতে হবে। বিবিধ স্বতন্ত্র এককের চিহ্নিতকরনের জন্য বিশ্লেষক উল্লম্ব শৃঙ্খলায় (vertical order) কতিপয় প্রশ্ন রাখতে পারেন। এগুলি হল : চিহ্নিত সমস্যাটি 'একটি কেবল পরিচিত প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী একটি ইস্যু ক্ষেত্রের' অংশ কি না (পদক্ষেপ আট)। যদি কোন এক সময়ে একটি বৈদেশিক অথবা প্রতিরক্ষার সমস্যা রেজিম বা সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন বিশ্লেষক দেখতে পাবেন যে সমস্যার মোকাবিলায় সম্পদ কাজে লাগান হবে কি হবে না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত একটি মাত্র গোষ্ঠীর হাতেই ন্যস্ত থাকে (পদক্ষেপ নয়), যদি 'নীতি-সিদ্ধান্তকারী গোষ্ঠীগুলি তাৎক্ষণিক সমস্যায় নিশ্চিত ভাবে জড়িত থেকে' এমন ক্রমোচ্চবিন্যাস্ত সম্পর্কে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত যে, আমরা দেখতে পাই 'নির্দেশ শৃঙ্খলার কোথাও না কোথাও একটি গোষ্ঠী' রেজিমের সম্পদ ব্যবহার বা অব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে কতৃত্বব্যঞ্জক পছন্দ গ্রহণ করে থাকে (পদক্ষেপ দশ) এবং যদি দেখা যায়, 'দুই বা ততোধিক একক (গোষ্ঠী, সংগঠন) যারা একটি এককে সংযুক্ত নয়', তবে এই এককগুলি কেউই একপাক্ষিকভাবে, অর্থাৎ 'এক বা আরও অনেকের সহমত ব্যতিরেকে' সমস্যার মোকাবিলায় রেজিমের সম্পদ ব্যবহার বা অব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না (পদক্ষেপ চোদ্দ)। পদক্ষেপ এগারো পর্যন্ত সব প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক এবং কেবল চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক। স্পষ্টতই এখানে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এককটি পাই তা বিবিধ ও স্বতন্ত্র বা স্বাধীন এককের সমন্বয়ে গঠিত।

কিন্তু যদি ৮ এবং ৯ নম্বরের পর্যায়ে প্রশ্নগুলির উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে ১০ নম্বর পর্যায়ে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়ে থাকে তা হল : 'সাম্প্রতিকের সমস্যাটিকে কি কঠিন বা জটিল বলে মনে করা হয়?' যদি এই প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়, তবে বিশ্লেষককে সঠিক উত্তর পাবার পুনরায় এই প্রশ্নটি উত্থাপিত করতে হবে ১১ নম্বর পর্যায়ে। আর যদি প্রশ্নটির উত্তর হ্যাঁ বাচক হয় তাহলে, ১২ নম্বর পদক্ষেপে তুলে রাখা প্রশ্নটি করতে হবে। প্রশ্নটি হল : 'কোন তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য একটি রেজিমের সমস্ত সম্পদ ব্যবহার বা তা না ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের সমর্থন কি জরুরী? অর্থাৎ, গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত বাহ্যিক বিরোধিতা ব্যতীত কী সহজেই পরিবর্তন করা যায় না?' যদি এই প্রশ্নটির উত্তর হ্যাঁ হয়, এবং ১৪ নম্বর পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর যদি 'না' হয়, তবে ১৩ নম্বর পদক্ষেপের জন্য রেখে দেওয়া প্রশ্নটি এখানে করা প্রয়োজন। প্রশ্নটি এরকম : 'যে ইস্যুর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটিকে তাৎক্ষণিক সমস্যা বলে মনে করা হয় এবং যা এর একটি অংশ সেখানে বিদ্যমান রেজিমটি বা ব্যবস্থাটি কি বাহ্যিক কোন বৈদেশিক সত্ত্বার অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল? যদি এই প্রশ্নের উত্তরটি নেতিবাচক হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটিমাত্র এককই রয়েছে। কিন্তু যদি উত্তরটি ইতিবাচক হয়, তবে আমাদের বিবিধ এবং স্বতন্ত্র এককদেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে ধরে নেওয়ার বিষয়টিতে ফিরে যেতে হবে (Herman and Herman, 1989 : 363-73)।

৪.৭ সারসংক্ষেপ

এই চতুর্থ এককে আমরা প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে যৌক্তিকতাবাদী (rationalistic) তত্ত্বগুলি হয়ে mixed-scanning এর বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনাকে ছুঁয়ে গেছি। তারপর আমরা স্নাইডারের তাত্ত্বিক কাঠামোর বিস্তারিত আলোচনা করেছি যেখানে বিদেশনীতির আলোচনায় পরিস্থিতিগত ও জ্ঞানাত্মক দিকগুলিকে সমন্বিত রূপ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর বাধাজনক পরিস্থিতিগত নির্ধারণবাদ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলার পর আমরা আমাদের আলোচনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশ্লেষণী দিকের প্রতি সরিয়ে নিয়েছি, অর্থাৎ এর মনস্তাত্ত্বিক ও জ্ঞানাত্মক দিকের উপর আলোকপাত করেছি। সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞানাত্মক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা কার্ল ডয়েসের সাইবারনেটিক তাত্ত্বিক কাঠামোটি বিদেশনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে আলোচনা করেছি, যেখানে বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্মৃতি এবং বিভিন্ন নিহিত বার্তার যোগসূত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বা insights প্রদান করে থাকে। বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে 'জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া মডেলটি' বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি কেমন ভাবে এলিটদের মনের 'জ্ঞানাত্মক মানচিত্র' (cognitive mapping) অঙ্কনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। আমরা এ'প্রসঙ্গে বিশ্বাস, ধারণা, ইমেজ এবং operational codes এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এলিটদের জ্ঞানাত্মক মানচিত্র নির্মাণটি কীভাবে হয়েছে তাও দেখিয়েছি। এর সাথে এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কীভাবে বিশ্বাস থেকে তত্ত্ব কাঠামোয় স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণে এটি উন্নততর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। আমরা আপনাদের বলেছি, বিশ্বাস প্রণালীতে নিরবচ্ছিন্নতা এবং পরিবর্তনের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব তার প্রতি মনোযোগের কোনরকম অভাব দেখা দিলে তা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। চূড়ান্তভাবে আমরা আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করেছি যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদেশনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে কে বা কারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা খুঁজে দের করার উপায়।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এটা ঠিক যে, এখানে আলোচিত চারটি মডিউলই যেন একটু বেশিই কঠিন। কিন্তু এই কাঠিন্য কতকটা ইচ্ছাকৃত। কারণ, সহজপাচ্য কোন কিছুই কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কোন পাঠ্য বিষয়ের পক্ষে ভালো নয়, এর ফলে কঠিনকে ভালোবাসার স্পৃহা কমে যায় এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা অব্যবহৃতই থেকে যায়। আপনাদের আমি যেসব গ্রন্থ পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছি, তার বাইরেও আকর গ্রন্থগুলি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। তবে, এ দাবি করাই যায় যে শুরু হিসেবে এই মডিউলটি খুব মন্দ নয়।

৪.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে Snyder scheme-এর উপর সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন।
২. বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী রচনাসমূহের উপর ভিত্তি করে Richard Snyder-এর মূল্যায়ন করুন।
৩. বিদেশনীতির সিদ্ধান্ত গঠন তত্ত্ব হিসাবে Holsti-তাত্ত্বিক কাঠামো মূল্যায়ন করুন।
৪. বিদেশনীতির সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রেক্ষিতে Karl W. Deutsch-এর সাইবারনেটিক কাঠামোর প্রধান দিকসমূহ আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী

১. Synder Scheme-এর box diagram ব্যাখ্যা করুন।
২. বিদেশনীতি সিদ্ধান্তগ্রহণে বিশ্বাস, ইমেজ এবং বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াশীলতার সঙ্কেত-এর ভূমিকা লিখুন।
৩. ক্রিয়াশীলতার সঙ্কেত হিসাবে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এলিটদের জ্ঞানাত্মক মানচিত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১. স্কিমা (schema) বলতে কী বোঝেন?
২. বিশ্বাস সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সিদ্ধান্ত গঠনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?
৩. বিদেশনীতির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হিসাবে Synder scheme-এর দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করুন।
৪. সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এলিটদের জ্ঞানাত্মক মানচিত্রের উপাদান হিসাবে বিশ্বাস ও স্কিমার পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

1. Deutsch, Karl, W., *The Analysis of International Relations* (New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1989).
2. Etzioni, Amitai, 'Mixed-Scanning: A "Third" Approach to Decision-Making', *Public Administration Review* 27:5 (December 1967): 385-392.
3. Herman, Margaret, G., and Herman, Charles, F., 'Who Makes and How: An Empirical Inquiry, *International Studies Quarterly* 33:4 (December, 1989): 363-387.
4. Holsti, Ole, 'Foreign Policy making Viewed Cognitively', in Robert Axelrod, *The Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976).
5. Snyder, R.C., Bruck, H. W., and Sapin, B., *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics,* Monograph No. 3 of the Foreign Policy Analysis Project Series, 1954, pp. 32-43, 92-97, 103-09, reprinted in James N. Rosenau, *International Relations and Foreign policy: A Reader in Research and Theory* (New York: The Free Press, 1968), pp. 34-39, 57-58, 50-66, and 118-20.
6 Walker, Stephen, G., 'The Evolution of Operational Code Analysis', *Political Psychology* 11:1 (June, 1990): 403-18.

৪.১০ অন্যান্য গ্রন্থউৎস সমূহ

1. Bonham and Schapiro, Cognitive Process and Foreign Policy Decision-making', *International Studies Quarterly* 17:2 (June, 1973): 147-174.
2. Holsti, Ole, 'The Belief System and National Images: A Case Study', *Journal of Conflict Resolution 6* (September 1962): 244-52.

3. Jervis, Robert, *Perception and Misperception in International Politics* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1976).
4. Larson, Deborah, Welch, 'The Role of Belief Systems and Schemas in Foreign Policy Decision Making', *Political Psychology,* Special issue, Political Psychology and the Work of Alexander L. George (March, 1999): 17-33.
5. Mukhopadhyay, Amartya, 'Theories of Foreign Policy Decision making: Indian Context', in *Socialist Perspective* 12:1-2 (June-September, 1984): 37-49.
6. Rosati, Jerel, A., 'Continuity and Change in the Foreign Policy Beliefs of Political Leaders: Addressing the Controversy over the Carter Administration', *Political Psychology* 9:3 (September 1988): 471-505.
7. Sprout, Harold and Sprout, Margaret, *The Ecological Perspective on Human Affairs: With Special Reference to International Politics* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1965).

পর্যায়—৪
ভারতবর্ষের বিদেশনীতি

একক ১ ❑ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব বিস্তার ঃ কারণ সমূহ

একক ২ ❑ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গঠন

একক ৩ ❑ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন

একক ৪ ❑ ভারতের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্ক

একক ১ ☐ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব বিস্তার ঃ কারণ সমূহ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ ভূমিকা
১.৩ পররাষ্ট্রনীতি—অর্থ, বিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গি
১.৪ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির গঠনে ভৌগোলিক/কৌশলগত প্রভাব
১.৫ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারিক পরিসর
১.৬ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি—একটি পারিপার্শ্বিক আর্বতের সংকলন
১.৭ সারাংশ
১.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নসূচী
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এক এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা ও পররাষ্ট্রনীতি আলোচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।
- পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করার ভৌগোলিক/ কৌশলগত কারণসমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির ব্যবহারিক পরিসর সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সহায়তা করা।
- ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারিক পরিসর বিষয়ে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা।

১.২ ভূমিকা

নীতি বলতে কোন ক্রিয়ার কাঠামোগত নির্দেশলিপিকে বোঝায় যার মধ্যে সেই ক্রিয়াসম্পন্ন হবে, আর পররাষ্ট্রনীতি বলতে একটি দেশের নিজের সীমানার বাইরে অন্য কোন দেশের বা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক তৈরির কাঠামোগত নির্দেশিকাকে বোঝায়। পররাষ্ট্রনীতি যে কোন দেশের একটি জরুরী ক্রিয়া, কারণ প্রতিটি দেশকেই অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় যদি সেই দেশ অন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে স্বাবলীলভাবে টিকে থাকতে চায়, বিশেষ করে বর্তমানের প্রভূত বিশ্বায়নের যুগে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট নির্দেশলিপি থাকা উচিত অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক আর্থিক লেনদেন ও অন্য ধরনের সম্পর্ক

স্থাপনের জন্য। যে কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে বাহ্যিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মেলবন্ধনের মুহূর্তকে বোঝায়। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞ Resenau (১৯৮৭) পররাষ্ট্রনীতিকে একটি 'সম্পর্ক স্থাপনকারী বিষয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন যার মধ্যে 'অসীম সীমানা' আছে ও যার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে 'অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ের পৃথকীকরণের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের চলমান ক্ষয়িষ্ণুতা যা অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ঘটে কিন্তু যার প্রভাব বাইরের বিশ্বেও দেখা যায়। এই প্রেক্ষাপটে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থ, সুরক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী বলে সরলীকৃত ব্যাখ্যা করলে হবে না, একে বুঝতে হবে একটি জটিল সিদ্ধান্তে গ্রহণকারী প্রক্রিয়া হিসাবে যা নেওয়া হয় প্রতি মুহূর্তে বদলমুখী অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে। তাই পররাষ্ট্রনীতি একই সাথে নীতি ও সিদ্ধান্ত। পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় একটি দেশের 'দর্শন', 'সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য' বা 'সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি'। পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অন্যদিকে হচ্ছে গৃহীত কাঠামোগত নির্দেশলিপির মধ্যে থেকে হঠাৎ করে নেওয়া কিছু পদক্ষেপ অন্যদেশের হঠাৎ পরিবর্তিত ব্যবহারের মোকাবিলা করার জন্য। এইভাবে পররাষ্ট্রনীতির দুটি পর্যায় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—ব্যবস্থাগত বিশ্লেষণ (আন্তর্জাতিক) ও আধা-ব্যবস্থাগত বিশ্লেষণ (অভ্যন্তরীণ)।

প্রথমটি আলোচনা করে নির্দিষ্ট বিষয়ের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয়টি আলোচনা করে দেশের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতিকে নিয়ে। প্রথমটির লক্ষ্য 'পরিবর্তন' আর দ্বিতীয়টি লক্ষ্য 'প্রবাহমানতা'। ১৯৬৮ সালে F.S. Northedge তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Nature of Foreign Policy'-তে লিখেছেন যে পররাষ্ট্রনীতি আসলে একটি অন্তহীন আলাপচারিতার পরিবর্তনকামী ক্ষমতার সাথে প্রবাহমানতার ক্ষমতা। পররাষ্ট্রনীতি বহুকাল যাবৎ বিশ্লেষকদের আলোচনার বিষয় এবং এই ক্ষেত্রে James Rosenau একজন স্বনামধন্য নাম যিনি সর্বপ্রথম বোঝার প্রয়াস করেছেন পররাষ্ট্রনীতির গঠনে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকের 'যোগসূত্র ও জটিলতাকে'। পররাষ্ট্রনীতির আলোচনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল একটি দেশের নাগরিক চেতনার দৈনন্দিন পরিসরে তার স্থান আছে কিনা তা নিয়ে। পররাষ্ট্রনীতিকে বিশেষজ্ঞদের একটি কাজ হিসেবে দেখা এটাই রীতি এবং বর্তমানে দেশে পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই কাজ সম্পাদন করে। তাই পররাষ্ট্রনীতি বিষয় নিয়ে নাগরিক চেতনায় কোনো উৎসাহ নেই, যতক্ষণ না সেটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্ক ভিত্তিক বিষয় হয়। তাই পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে নাগরিক চেতনায় উদ্দীপনা জাগ্রত হয় যখন বাইরে থেকে দেশে হামলা করা হয় বা যখন তার সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্র জড়িত থাকে। অন্যসময় সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি বিশেষ করে অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে নাগরিকরা বেশি চিন্তিত, পররাষ্ট্রনীতি বিষয় নিয়ে নয়। তাই ব্যবস্থাপক/ বৃহত্তর পরিসরে এবং আধা ব্যবস্থাপক ক্ষুদ্র পরিসরে পররাষ্ট্রনীতি 'মেলবন্ধনের' জটিলতাকেই বুঝতে চায়—প্রথমক্ষেত্রে এটি 'অভ্যন্তরীণ' ও 'বাহ্যি'ক-এর মেলবন্ধন আর দ্বিতীয়টি ক্ষেত্রে এটি 'বিশেষজ্ঞ' ও 'সাধারণ নাগরিক'-এর মেলবন্ধন। তাই পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা অত্যন্ত জটিল কারণ এর মধ্যে পররাষ্ট্রনীতির গঠন সংক্রান্ত সমস্ত প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

১.৩ পররাষ্ট্রনীতি-অর্থ, বিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গি

পররাষ্ট্রনীতি একটি আলোচনা ধর্মী প্রক্রিয়া যা নির্ভর করে ক্রমাগত যোগাযোগ ও মতামত প্রেরণের মধ্যে। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা কোনো নতুন বিষয় নয়। সুদীর্ঘ সময় ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক একক (political unit) অন্যান্য রাজনৈতিক এককের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং বিদেশী বা বাইরের গোষ্ঠী ও দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রভূত চিন্তা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টি আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক কেন্দ্রীক, তুলনামূলক রাজনীতির বিষয় হল নির্দিষ্ট দেশের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব আলোচনা। পররাষ্ট্রনীতির বিষয়টি এই দুটি বিষয়ের সংমিশ্রণ—যেখানে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব আভ্যন্তরীণ পরিসরকে প্রভাবিত করে আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কিত পরিসরের ব্যবহারিক বাহ্যিক পরিসর তৈরি করে। পররাষ্ট্রনীতি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয়কেই নিয়েই আলোচনা করে।

পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—মনোজ্ঞচর্চার দিক থেকে কিন্তু বিষয়বস্তু চর্চার কোন পরিবর্তন হয় না। সামগ্রিকভাবে পররাষ্ট্রনীতি চিন্তিত থাকে সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দৃঢ়তাকে বোঝায় সেই সুবিধা বা অসুবিধা মোকাবিলার ক্ষেত্রে। Kenneth Waltz বলেছেন যে পররাষ্ট্রনীতিতে যা দরকার তা শুধুমাত্র কিছু সোজা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ নয়... দরকার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভারসাম্য—কল্পনা ও বাস্তবতায়, দৃঢ়তা এবং শীথিলতা, প্রত্যয় ও মানিয়ে নেওয়ার, যে নীতি ভালো সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আবার আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই নীতিকে বদল করার প্রয়াস, নীতির পরিবর্তন সামগ্রিক দেশের দর্শনের গণ্ডির মধ্যে।' পাঁচটি বৈশিষ্ট্য পররাষ্ট্রনীতিকে অলঙ্কারিত করে—স্বচ্ছতা, প্রবাহমানতা, পরিবর্তনশীলতা, মানিয়ে নেওয়ার সদিচ্ছা, একমুখীনতা—যার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা যায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বা একটি দেশের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে।

Roy C Macridis-এর কথায় 'ফরাসী বিপ্লবের সময়কাল থেকে পশ্চিম দুনিয়ায় পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত দুটি স্ববিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। একটি মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে বহির্বিশ্বের দেশগুলির সাথে একটি দেশের নীতি বলতে বোঝানো হয় তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পররাষ্ট্রনীতিকে বিভাজন করা হয় তিনভাবে—গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারি, উদারপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় ও অগ্রাসী। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি হল বিশ্লেষণ ধর্মী। এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল যে, দেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হল বিভিন্ন উপাদান যেমন দেশের ইতিহাস, ভেগোলিক অবস্থান, জাতীয় স্বার্থ জাতীয় প্রয়োজন ও সুরক্ষা। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি পররাষ্ট্রনীতিকে আধা ব্যবস্থাপক আঙ্গিক থেকে দেখে দেশের অভ্যান্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং কী ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে পররাষ্ট্রনীতি তৈরির ক্ষেত্রে। অপরদিকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ—বাস্তববাদী, উদারনৈতিক ও মার্কসবাদী—পররাষ্ট্রনীতিকে বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থাপক/ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে। বাস্তববাদী পররাষ্ট্রনীতি প্রাধান্যকারী ক্ষমতার প্রতি একটি অন্তহীন অন্বেষণ, উদারনৈতিক পররাষ্ট্রনীতি শান্তির পক্ষে সাওয়াল করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে এবং মার্কসবাদী পররাষ্ট্রনীতি অসাম্যের ধনতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতির প্রকোপকে রুখতে চায় বৈপ্লবিক সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে মানবিক ও সাম্যের পৃথিবী তৈরি করতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি পররাষ্ট্রনীতির অভিমুখ তৈরি করে, পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে এবং সেই লক্ষ্যপুরণের পন্থা তৈরি করে। পরাষ্ট্রনীতির জটিলতাকে সামগ্রিক ভাবে বুঝতে এই দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রয়োজন। পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্র

পরিচালনার একটি ক্রিয়া। পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির জটিলতার অনুসন্ধানে পররাষ্ট্রনীতিকে পররাষ্ট্র বিষয় সংক্রান্ত কৌশল বলে অভিহিত করা যেতে পারে এবং কূটনীতিকে সেই কৌশলের একটি বিশেষ পন্থা হিসেবে দেখা যেতে পারে। পররাষ্ট্র বিষয়ক কৌশলকে নির্দিষ্ট করে দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি আর কূটনীতির প্রকৃতি নির্ধারণ করে প্রথম ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিগুলি। এই নীতি থেকে কৌশলের (policy to strategy) পরিবর্তন পররাষ্ট্রনীতি চর্চাকে আরও বেশি আকর্ষনীয় করে তোলে সাধারণ সার্বজনীন দার্শনিক মূল্যবোধ ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতির চর্চা থেকে।

১.৪ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির গঠনে ভৌগোলিক/ কৌশলগত প্রভাব

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'পররাষ্ট্রনীতি কখনও একটি বা একগুচ্ছ কারণের দ্বারা গঠিত হয় না। এটি গঠিত হয় বিভিন্ন কারণের যৌথ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে যা পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে। এর মধ্যে কিছু কারণ সমূহ প্রাকৃতিক নিয়মেই নির্দিষ্ট এবং তাকে পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণকারিগণ জরুরী, অপরিবর্তনীয় এবং প্রাথমিক কারণ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য।' ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা বেশ উল্লেখযোগ্য। যে ভৌগোলিক বিশাল পরিসর প্রাকৃতিক ভাবে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল তা ক্রমান্বয় বিভাজিত হয়ে যায় দেশভাগের কারণে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে যার মধ্যে ভারত অন্যতম। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক যে কারণগুলি গুরুত্বপূর্ণ তা হল দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশ এবং ভারতীয় মহাসাগরের ভূরাজনীতি ও হিমালয় পর্বতমালার বিশালতা।

ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ দেশ। ভারতের বিশালতা, জনসংখ্যা, সম্পদ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার, বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের অগ্রগতি সামরিক শক্তি তুলনামূলক স্তরে দৃষ্টিকটুভাবে অসাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যদেশগুলির তুলনায়। ভারতবর্ষ এই অঞ্চলের ৭৬% জায়গা নিয়ে উপস্থিত। ভৌগোলিক পরিবেশ ভারতবর্ষকে দিয়েছে এই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় অবস্থান যার ফলে ভারতবর্ষ সব দেশের সাথে সীমানা বন্টন করে—৪০৯৬ কিলোমিটার বাংলাদেশের সাথে, ৩৩১০ কিলোমিটার পাকিস্তানের সাথে, ১৭৫২ কিলোমিটার নেপালের সাথে ও ৫৭৮ কিলোমিটার ভুটানের সাথে শ্রীলঙ্কার সাথে যথাক্রমে নদীপথে ও সমুদ্র সীমানা রয়েছে। ভুটান ছাড়া ভারতের আর সব প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমানা নিয়েই অসন্তোষ ও বিরোধ রয়েছে কমবেশি। ভারত ছাড়া এই অঞ্চলের আর অন্য কোন দেশের সাথে সীমানা নেই, বর্তমানে ভারতের বিশালতা, প্রাধান্য ও প্রভাবশালী উপস্থিতি প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে ও তাদের কাছে আর কোনো বিকল্প রাখে না ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখা ছাড়া এবং এইরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবেশিদের সাথে সম্পর্কের সাধারণ গণউন্মাদনা ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণের পরিপন্থী। প্রবাদ আছে যে, 'যা কাছে তা খুবই নিজের' এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ আপ্তবাক্য। ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি একই ধরনের সভ্যতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির থেকে গড়ে ওঠার ফলে এদের ভাষা, ধর্ম, আচার আচরণ, উপস্থাপনা এবং রীতিনীতি প্রায় এক। ভৌগোলিক ও ইতিহাসভিত্তিক নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবিরাম সন্দেহের বাতাবরণ রয়েছে।

ভারত মহাসাগর ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর পৃথিবীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জল-পথ হয়ে উঠেছে যেখানে বাইরের অঞ্চলের ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলি নৌ-ঘাঁটি সাজাচ্ছে, চিনের উপস্থিতি এই জলপথে বহুচর্চিত কিন্তু

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার কৌশলগত নিশানার মধ্যে এনেছে এই জলপরিমণ্ডলকে তাই এখানে ভারতের ভূমিকা খুবই জরুরী অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্যকে রক্ষা করার জন্য। ভারতের পদধ্বনি বিশ্ব রাজনীতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশেষ করে ভারতীয় মহাসাগর ও তার সন্নিকটবর্তী দেশগুলিতে। চিন একটি 'String of Pearls' নীতি গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে ভারতকে চক্রাকারে ঘিরে ফেলা যাবে এবং এই নীতিকে সাহায্য করছে চিন ও পাকিস্তানের 'সকল ঋতুর বন্ধুত্ব'। এছাড়াও এই নীতির ফলে চিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির বিস্তার এই মহাসাগরে ঠেকাতে পারবে ও ভারতের তুলনায় সামরিক শক্তিতে এগিয়ে থাকবে। খুব সম্প্রতি চিন বঙ্গোপসাগরে ও আরব সাগরে তার উপস্থিতি বাড়িয়েছে এবং ভারত মহাসাগর চিনের নৌকৌশলে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ভারত এই উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করছে ভারত মহাসাগর সন্নিকটস্থ সকল দেশের সাথে কূটনীতি গত সৌহার্দ বৃদ্ধি করে ও তার সামরিক ও নৌশক্তির উন্নতির মাধ্যমে যার ফলে সহজভাবে ভারত তার ক্ষমতার বিচ্ছুরণ করতে পারবে।

হিমালয় পর্বতমালা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণবশত ভারতের একটি প্রাকৃতিক সীমানা। কিন্তু বিজ্ঞান ও কৃৎ-কৌশলের উন্নতির ফলে এই পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ব্রিজ, হাইওটে ও সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে চিন এটা করছে। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর উচ্চ শৃঙ্গগুলি এবং কারাকোরাম পর্বতের কিছুটা ভারত ১৯৬৭-৬৮ সালে চিন ও পাকিস্তানের কাছে হারায় ও তার ফলে এই দুই দেশ এই দুর্গম অঞ্চলে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে যার প্রতিফলন কারাকোরাম-এ মহাসড়ক নির্মাণে তাড়া দেখিয়েছে যেটি ভারত পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারক অক্ষরেখা বা Line of control এর খুবই কাছে। এই মহাসড়ক (highway) এবং আকসাই-চিন (Aksai-Chin) অঞ্চলে চিনের তৈরি করা সড়ক ভারতের বিরুদ্ধে চিন ও পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সমঝোতা সহজ করে তুলেছে। সড়কও রেল যোগাযোগের পাশাপাশি বেজিং (Beijing) ও ইসলামাবাদ (Islamabad) উদগ্রীব হয়েছে একটি তেল ও গ্যাস পাইপ লাইন তৈরির যা কারাকোরাম পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে গদ্দর বন্দরের সাথে সংযোগ করবে চিনের জিং জিয়াঙ্গ অঞ্চলকে। বেজিং চাইছে তার সম্প্রতি তৈরি করা গোলমুণ্ডা ইহাসা রেল লাইনটিকে ইহাসা অঞ্চলের দক্ষিণ অঞ্চলের Xigaze অবধি বাড়াতে এবং সেখান থেকে চুম্বি উপত্যকার ইয়াতুং অঞ্চলে যা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নাথুলা পাস থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভারত, চিনের সিকিম কেন্দ্রিক কৌশলি রাজনৈতিক নীতিকে বুঝতে পেরে তৎপর হয়েছে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত সিকিমের সাথে রেল সংযোগ তৈরিতে যা আশা করা যাচ্ছে ২০১৪-২০১৬ অর্থবর্ষে শেষ হয়ে যাবে।

আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে ভৌগোলিক/কৌশলগত বৃত্ত ভারতের জন্য বেশ কিছু অসুবিধা তৈরি করেছে। আর পররাষ্ট্রনীতির কাজ হল সেই সব অসুবিধার মোকাবিলা করা আর অবিরাম আলোচনার মাধ্যমে সেই অসুবিধাগুলোকে সুবিধায় পরিণত করা। তবে এখনও অবধি ভারতের বিশালতা আর দক্ষিণ এশিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সথে বিদ্বেষ অনাস্থার সম্পর্ক তৈরি করেছে আর ভারত মহাসাগর ও হিমালয় পর্বতমালা তৈরি করেছে এক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ করে চিনের সাথে। এটা মনে রাখা দরকার যে ভারত সর্বদা পশ্চিমপ্রান্তে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সমীকরণ নিয়ে চিন্তিত থাকে আর উত্তর প্রান্তে চিনের অগ্রাসনের আশঙ্কা তাড়া করে ভারতকে। এমতাবস্থায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন অত্যন্ত সুচতুর ভাবে করতে হবে সামগ্রিক ভৌগোলিক ও কৌশলগত পারিপার্শ্বিকতাকে মাথায় রেখে কারণ যে কোনো ভুল ভেগৌলিক পরিচালনের পদক্ষেপ ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক অঞ্চলের ভূরাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে।

১.৫ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ ও বাহিক ব্যবহারিক পরিসর

G. Modelsky-এর মতানুসারে পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ ও আলোচনার মূল লক্ষ্য হল সেই সমস্ত প্রক্রিয়াকে আলোকিত করা যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের আচরণকে পরিবর্তন করতে চায় ও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। জোসেফ ফ্র্যাঙ্কেল (Joseph Frankel)-এর কথায় 'পরিবেশ (বা সুবিধার্থে পরিপ্রেক্ষিত) বলতে সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রভাবকারী পরিমণ্ডলকে বোঝায়।' তাত্ত্বিকভাবে পররাষ্ট্র নীতি সিদ্ধান্ত গহণের পরিবেশ অসীম যা সমগ্র জগৎকে নিয়ে গঠিত। যে কোনো অভ্যন্তরীণ বিষয় পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে ও তাকে পরিবর্তিত করতে পারে। আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে তাদের প্রাসঙ্গিকতার উপর নির্ভর করে—সহস্র উপাদান সমূহ নজর এড়িয়ে যায়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে চিহ্নিত ও উপলব্ধি করা হয় কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দ্বারাই আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অধস্তন কর্মীদের দ্বারা, আর সবশেষে যখন একটি নির্দিষ্ট বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের কাছে পরিবেশ সংকুচিত হয়ে যায় সেই উপাদনগুলির মধ্যে যেগুলি বিষয়টির সাথে যুক্ত।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের অভ্যন্তরীণ পরিসর বলতে বোঝায় দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে—তার ইতিহাস এবং রাজনৈতিক বিকাশার্থ (যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা, ধর্মীয় বিভাজন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, গণতান্ত্রিক পরিবেশ) ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা। অন্যদিকে বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিসরের উপাদানগুলি হল বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য (ঠাণ্ডা লড়াই ও তার পরে ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর পরিস্থিতি, ৯/১১ ঘটনা এবং তৎসহ বিশ্বক্ষমতার সমীকরণের বদল 'সন্ত্রাসবাদী' ও 'গণতন্ত্রবাদী'দের মধ্যে, এছাড়া উদ্ভূত নতুন বহু ক্ষমতাকেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও নীতিসমূহ (সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং পরিবেশদূষণ নিয়ে বিশ্বজননী দুশ্চিন্তা), পারমাণবিক বিষয়, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে বহিঃ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ভূমিকা আন্তর্জাতিক সংহতিবাদী আন্দোলন ও মঞ্চ (NAM, G-77, BRICS, IBSA, SCO)। এই পরিবেশগুলি পর্যায় ক্রমে বদলাতে থাকে আর সেই সাথে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির দিক নির্দেশিকাও বদলেছে।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিকাশপথে উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক প্রভাবশালী উপাদান হল কৌটিল্যের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্রাট অশোকের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই আবর্তের মধ্যে পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর ক্রিয়াকলাপে ঢুকে পড়ে আর একটি উপাদান—অহিংসা। তবে সামগ্রিক সহিষ্ণুতা ও শান্তির বাণীর প্রভাবে স্বাধীন ভারত তার পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি বলে চিহ্নিত করে 'আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'। ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে নিয়ে আসে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, বর্ণ বৈষম্য—বিরোধিতা ও গণতন্ত্র প্রসারের উদ্যোগ। এই প্রাথমিক উপাদানের ভিত্তিতে ভারত সমগ্র ঠাণ্ডা লড়ায়ের সময়কালে 'নির্জোট আন্দোলন' পন্থা-অবলম্বন করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য। একটি বহু ধর্মী ও বহু সংস্কৃতি ভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ার দরুন ভারত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তেরি করেছে একদিকে আরব ও মুসলিম বিশ্বের সাথে আবার অন্যদিকে তার পারিপার্শ্বিক বৌদ্ধ রাষ্ট্রের সাথে (শ্রীলঙ্কা, ভূটান) ও হিন্দু রাষ্ট্রের সাথে (নেপাল)। ভারতের সাথে পাকিস্তান ও ইজরায়েল এর সম্পর্ক খুবই স্পর্শকাতর বিষয় বিশেষ করে উগ্র জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় জনতা দলের (B.J.P) আভ্যন্তারীণ রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির প্রেক্ষিতে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বহুদিন ধরেই শ্রীলঙ্কার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরিতে

অন্তরায় হয়েছে তার কারণ তামিলনাড়ুতে বসবাসকারী তামিল নাগরিকদের নিয়ে রাজনীতির জন্য আর খুব সাম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক অগ্রগতির পথ আটকাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি গঠিত হয় যেসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে তাদের আভ্যন্তরীণ চাপ, কাঠামো ও মতাদর্শের ভিত্তিতে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দল (I.N.C) সাধারণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে নেহেরুর 'নির্জোটিতা' ইন্দিরা গান্ধীর 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি দুর্বলতা' রাজীব গান্ধীর 'ব্যক্তিগত প্রাধান্য', নারসীমা রাও এর 'অর্থনৈতিকতা', মনমোহন সিং এর 'এশিয়তা' দ্বারা আর এর প্রভাবে, 'স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি' প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছে। ভারতীয় জনতা দল (B.J.P) ক্ষমতায় এসেছে ১৯৭৭ সালে জনতা দলের মোড়কে, ১৯৯৮ সালে N.D.A এর সংঘবদ্ধতায় ও সম্প্রতি ২০১৪তে নিজেদের একক ক্ষমতায়। B.J.P ১৯৭৭ সালে সত্যিকারের নির্জোট নীতিগ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঝুঁকে থাকার মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ চুক্তি করা ও ইজরায়েলের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে। পরবর্তী সময় তারা একটি নতুন পারমাণবিক নীতি রূপায়ন করে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে যায় ১৯৯৮ সালে এবং বর্তমানে তারা প্রতিবেশি দেশগুলির সাথে সম্পর্কের তিক্ততা মুছতে ব্যস্ত। ভারতের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিষ্ট দলগুলি স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে পুরো সময়টা প্রায় বিরোধী ভূমিকায় কাটিয়েছে শুধু মাত্র ১৯৯৬ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের U.P.A-I সরকারের আমল ব্যতীত। এই দলগুলি সবসময় পক্ষে থেকেছে ভারতের একটি 'স্বতঃসিদ্ধ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির' এবং ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী সময় তাদের দাবি 'নেহেরুর নির্জোটিতা' কাঠামোকে ফিরিয়ে আনা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদাঙ্ক অণুসরণ বন্ধ করা। উল্লেখ্য যে 'স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণে দাবিতে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের' স্বোচ্চার হয়েও বিপরীত পথে হেঁটেছে। অন্য দিকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রাও অনেকাংশে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণকে প্রভাবিত করেছে। যেখানে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ উন্নয়নে প্রাধান্য দিয়ে ভারত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময় বিশ্ব জোট রাজনীতির বাইরে থেকে, ১৯৮০র দশক থেকে তার বাণিজ্য ঘাটতি তাকে জোর করেই 'কাঠামোগত সংস্কার নীতি' (SAP) গ্রহণে বাধ্য করছে আর অচিরেই বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির যেমন (I M F) মুখাপেক্ষী হয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব বাজারের জন্য উন্মুক্ত করে উদারীকরণের পথে যেতে বাধ্য করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধ্যবাধকতার জন্য ভারতকে চিনের সাথেও সম্পর্ক জোরাল করতেও বাধ্য করেছে, চিনের ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলে আগ্রাসনকে সাময়িক ভুলে গিয়ে। আবার একই সাথে কূটনৈতিকভাবে সঠিক জায়গায় থাকার জন্য ভারত সম্পর্ক রেখেছে স্ফীত অর্থনীতির (BOOMING ECONOMIES) সাথে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, স্থিতিশীল অর্থনীতির (Stable Economies) সাথে যেমন রাশিয়া ও উদীয়মান অর্থনীতির (Emerging Econimis) সাথে যেমন ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া।

বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিবেশ যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ স্বাধীনতার সময় থেকে নেহেরুর নেতৃত্বের গুণে ভারত বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে বিশ্বরাজনীতিতে (আগের দিনে মূল্যবোধের কারণে আর এখন অর্থনীতির কারণে)। প্রথমে ঠাণ্ডা লড়াই এর দ্বিমেরু পৃথিবী (১৯৪৫-১৯৮৯) ভারতকে বাধ্য করে নির্জোটের পন্থা অবলম্বন করতে, পরবর্তী সময়ে এবং মেরু পৃথিবীতে (১৯৯০-২০০১) ভারত বাধ্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সংযোগ বাড়াতে এবং বর্তমানে নির্মীয়মান বহুক্ষমতাকেন্দ্রিক বিশ্ব (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ২০০১ এর ৯/১১-র হামলা থেকে আজ অবধি) ভারতকে বাধ্য করেছে তার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের—পরিধিকে বাড়াতে

আর আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সাথেও (যেমন ASEAN, EU) সম্পর্ক বৃদ্ধিতে। তাই বিশ্ব ক্ষমতার ভারসাম্য ও বিন্যাস ভারতের পররাষ্ট্রনীতির দিক নির্দেশ করেছে অনেকাংশে। ভারত নেহেরুর নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের দেশগুলিকে নিয়ে সংগঠিত মঞ্চ তৈরিতে উদ্যোগী হয়—যার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে নির্জোট আন্দোলন (NAM) এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির গোষ্ঠী G-77 গঠন। ভারত একটি শান্তিপ্রিয় দেশ এবং সে কারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা অভিযানের সঙ্গী হয়েছে এবং ভারত তার শক্তি ও সামর্থের নিরিখে সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদের জন্য উদ্‌গ্রীব। ভারতের ঘোষিত পারমাণবিক নীতি হল যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে 'প্রথম ব্যবহার না করা' (No first use) আর অন্য সময়ে এই শক্তিকে মানবিক কাজে ব্যবহার করা। ২০০৪ সালে ভারত মার্কিন পারমাণবিক চুক্তি (যা 123 Agreement বলেও পরিচিত) কেন্দ্র করে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ চুক্তির একটি ধারা অনুসারে ভারতের সবকটি পরমাণবিক শক্তিস্থানগুলি সরাসরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বিশ্ব পরমাণবিক উপাদান সরবরাহকারী সংস্থার (NSG) যার নেতৃত্বে রয়েছে বিশ্ব পরমাণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি খুবই প্রভাবিত হয়েছে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী উপস্থিতির জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের 'নীরব সৌহার্দ্য ও চীনের লক্ষ্য ভারতকে ঘিরে ফেলার তার 'String of pearls' কৌশলে (যার মাধ্যমে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে বন্দর নির্মাণকে বোঝায়) যা ভারতের পক্ষে অবাঞ্ছিত যন্ত্রণা। ভারতকে সবসময় তৈরি থাকতে হয় এই দেশগুলির নীতি পরিবর্তনের দিকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তন হল সম্প্রতি বুশ সরকারের 'Af-Pak' কৌশলে এবং ভারতকে 'উদীয়মান ক্ষমতা' রাখার থেকে 'উদীত ক্ষমতার' স্বীকৃতির মধ্যে। চীনের কৌশল পরিবর্তীত হল Hu Jintao এর 'নরমপন্থী ক্ষমতা' (soft power) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে Xi Jingping এর 'অগ্রাসী ক্ষমতার' (hard power) দিকে আবার পাকিস্তানের প্রতি স্বহৃদয় থাকার ও অরুণাচলকে নিজেদের মনে করে সীমানা অঞ্চলে আগ্রাসনের-নীতি একই থাকলো। একটি অস্থির প্রতিবেশী পরিস্থিতি যে কোন রাষ্ট্রের কাছে চিন্তার আর ভারতের মতো বিশাল মাপের দেশের কাছে তা, আরোই অবাঞ্ছিত যা প্রভাব ফেলে ভালো পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের দিকে মননিবেশ করতে এবং এই ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের কাশ্মীর সংক্রান্ত বিরোধ এবং তার থেকে যুদ্ধ ও ছায়া যুদ্ধ আর ভারতের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী হামলা (২০০১ এ সংসদ ভবনে ও ২০০৪ এ মুম্বাই এ হামলা স্মরণীয়) আর ভারত বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষীর সমস্যা South Block এর (ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মস্থল) কাছে মাথাব্যাথার কারণ।

দেখা যাচ্ছে যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারিক পরিসর—ভালোমত প্রভাব ফেলেছে কিন্তু মাত্রার নিরিখে কোন একটি কারণকে অন্য কারণ থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যাবে না। কারণ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক খুব জটিল ভাবে সংযুক্ত একে অপরের সথে। Rorenan বলেছেন যে সংযুক্তি (linkage) বলতে বোঝায় বিশ্লেষণের ভিত্তির একক (unit) যা কোন পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার যার উৎস একটি স্তরে আর প্রভাব অন্য স্তরে Policy out puts বলতে সেই পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারকে বোঝায় যার উৎস অভ্যন্তরীণ পরিসরে এবং যা শেষ অবধি পরিসরকে মেনে নেয় বা বদলে দেয়। অন্যদিকে Environmental inpots বলতে সেই পর্যায়ক্রমিক ব্যবহার কে বোঝায় যার উৎস বাহ্যিক পরিসরে এবং যার প্রভাবে অভ্যন্তরীণ নীতি রূপায়িত হয়। Environmental outputs বলতে সেই পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারকে বোঝায় যার উৎস বাহ্যিক পরিসরে এবং যার গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয় বা অস্বীকার করা হয় অভ্যন্তরীণ পরিসরে। অন্যদিকে Policy inputs বলতে সেই পর্যায়ক্রমিক ব্যবহারকে বোঝায় যার উৎস অভ্যন্তরীণ পরিসরে যার পরিপ্রেক্ষিতে বাহ্যিক

পরিসরের জন্য নীতি রূপায়িত হয়। সাধারণ ভাবে কিছু outputs কেই পররাষ্ট্রনীতি বলে অভিহিত করা হয় যার দ্বারা অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার থেকে কিছু আচরণ বা ব্যবহার আশা করা যায়। এগুলিকে direct policy outputs বা direct environrmental outputs বলা হয় যার উপরে নির্ভর করে তা হলো আন্তর্জাতিক আচরণটি অভ্যন্তরীণ পরিসরের জন্যই হয়েছে নাকি তার বাহ্যিক পরিসরের উপাদানের জন্য নাকি উভয়ের জন্য।' তাই বোঝা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু প্রভাবশালী উপাদান থাকে যে কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে, আর ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এই সাধারণ নিয়মের বাইরে নয়।

১.৬ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি—একটি পারিপার্শ্বিক আবর্তের সংকলন?

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির যে কোনো আলোচনা শুরু বা শেষ হয় নির্জোট নীতি নিয়ে। এই ধারণাটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রবাহমান দর্শন, নির্দেশমূলক কর্মসূচি ও কাঠামো হয়ে উঠেছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই নির্জোট নীতি কতটা উদ্ভাবনীয় (Innovative) আর কতটা পরিকল্পিত (Planned)। উদ্ভাবনীয়তার থেকেও এই নীতি আসলে সমকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার একটি বিশেষ পন্থা। এই নীতির একমাত্র প্রশংসনীয় জায়গা হল পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকার বাসনা। পরবর্তী সময় বহু আলোচিত প্রতিবেশী পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণে 'যতটা দিচ্ছি ততটাও না পাওয়ার আশার' (non reciprocity) গুজরাল নীতি (Gujral-Doctrine) সার্বিকভাবে নেহেরুর নির্জোটতার পরিমণ্ডলে থেকেই সেইসময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মনে আশঙ্কা দূর করার একটি পন্থা। বিশ্লেষকদের মতে ভারতের চিন নীতি আছে, মার্কিন নীতি আছে, পাকিস্থান নীতি আছে কিন্তু সার্বিক পররাষ্ট্র নীতিটাই নেই। একটি ভালো পররাষ্ট্রনীতি তিনটি অবিচ্ছেদ্য জিনিসকে পূরণ করতে চায়—দেশের সুরক্ষা, সমৃদ্ধি ও সম্মান। এই মাপকাঠির ভিত্তিতে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি একটি ব্যর্থ পররাষ্ট্রনীতি আর তার কারণ সন্ত্রাসবাদী হামলায় ও অনুপ্রবেশের ফলে তার সুরক্ষা প্রশ্নচিহ্নের মুখে, দেশের সমৃদ্ধি দৃষ্টিকটু ভাবে সমাজের উঁচুতলার কিছু অংশের প্রতি নিয়োজিত, আর দেশের সম্মান শুধুমাত্র মূল্যবোধ ও অতীতের বেড়া জালে আটকে রয়েছে রাজনৈতিক সম্মান ও সমাদর এমনও পর্যাপ্ত ভাবে পাওয়া যায়নি বিশ্ব রাজনীতির দরবারে, বিবর্তনমূলক দৃষ্টিকোন থেকে বলা যেতে পারে যে ভারতীয় পরবাষ্ট্রনীতির কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নেই ও এই নীতির কৌশলগত সুদৃঢ়তাও নেই। এই পররাষ্ট্রনীতি আসলে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সম্মুখে কিছু তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের (Adhoc decisions) সমষ্টি।

১.৭ সারাংশ

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন হয়েছে স্বাধীনতার উত্তরকালে তার—ভৌগোলিক অবস্থান, বিশালতা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারিক পরিসরের প্রভাবে। ভৌগোলিক প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান অপরিবর্তনীয় হলেও অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারিক পরিসর পরিবর্তনশীল যেখানে ভৌগোলিক পরিসর ভারতকে একটি কৌশল গত সুবিধা প্রদান করেছে সেখানে পরিবর্তনশীল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারিক পরিসর ভারতীয়

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের বাধ্য করেছে বারে বারে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে একটি দেশ ও অঞ্চল থেকে অন্য দেশ ও অঞ্চলের প্রতি। ইতিহাস ও সাবেকিকতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, দলীয় কাঠামো, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা হল কিছু অভ্যন্তরীণ উপাদান যার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিকে রূপায়িত হতে হয় ভারতে। অন্যদিকে বিশ্ব ক্ষমতা কাঠামোর মেরুকরণ, বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, গুরুত্বপূর্ণ দেশের সাথে সম্পর্ক, অস্থির প্রতিবেশী অঞ্চল, পারমাণবিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরি করে বাহ্যিক পরিসর যেখানে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিকে নিজের উপস্থিতি জাহির করতে হয়। যেখানে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল্যবোধকে বিশেষ করে নির্জোট নীতিকে বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হতে হয় আবার একই কারণে এই নীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিকে সমালোচিত হতে হয় কারণ, এই নির্জোট নীতির প্রাধান্যে ভারতবর্ষ আর নতুন বিকল্প নীতি গ্রহণ করতে পারেনি আজকের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যদিওবা নির্জোট নীতির গ্রহণের সময়কাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নকারীরা অভ্যন্তরীণ পরিসরে আশা করে সমর্থন আর বাহ্যিক পরিসরে আশা করে প্রশংসা ভারতের ক্ষেত্রে এই দুটি পরিসর এতটা চাহিদা মুখী যে তার ফলে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি শুধু মাত্র কিছু নির্দিষ্ট কৌশল হয়ে থেকেছে, কখনই তা সময়ের চাহিদার নিরিখে সুদূর প্রসারী লক্ষ্যের সংকলন হয়ে ওঠেনি।

১.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নসূচী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী:

১. পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা দাও, ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তিত প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করুন।

২. সমালোচনাসহ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ভৌগোলিক প্রভাব সমূহের আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী:

১. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ব্যবহারিক পরিসর সম্বন্ধে বিশ্লেষণ ধর্মী একটি রচনা লিখুন।

২. ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি উদ্ভাবনী নীতি? নিজের উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:

১. পররাষ্ট্রনীতির সংজ্ঞা দিন।

২. পররাষ্ট্রনীতি আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিগুলি উল্লেখ /করুন।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

G. Modelsky, *Theory of Foreign Policy.*

Roy. C. Macraidis and Kenneth W. Thompson, *The Comparative Study of Foreign Policy.*

James. N. Rosenau (ed) *Linkage politics. Essays on the Comergence of National and International Sytem,* The Free Press, New York. 1969.

F.S. Nothed (ed) *The Foreign policy of the Power*, Faber and Faber, London, 1968

Josepl, Frankel, *The Making of Foreign Policy An Analysis of Decision Making*, OUP, 1971.

Kenneth walth Foreign Policy and Democatic Politics, Berton. Little Brown. 1967.

Jayantanuj Bandopadhyaya, *The Making of India's Foreign Policy.* Third Edition, Allied Publishers, New Delhi, 2003.

একক ২ ☐ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গঠন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ ভূমিকা
২.৩ পররাষ্ট্রনীতির গঠন—প্রেক্ষাপট ও ক্রীড়ক—ভারতের উপর বিশেষ আলোকপাত করে
২.৪ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়ন—সিদ্ধান্ত গঠনকারী কাঠামো
২.৫ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়ন—ব্যক্তিত্বের প্রভাব
২.৬ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন—প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান
২.৭ সারাংশ
২.৮ প্রশ্নাবলী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১. উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গঠনশৈলী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সাহায্য করা।
- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কাঠামো বিষয়ে জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।
- ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি গঠনে ব্যক্তিত্বের ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করা।
- ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি গঠনের প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিষয়ে সম্যক ধারণা গঠনে সাহায্য করা।

২.২ ভূমিকা

পররাষ্ট্রনীতি যে কোনো দেশের একটি বিশেষ নীতি কারণ এই নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে একই সাথে দুই ধরনের লক্ষ্য থাকে—আন্তর্জাতিক পরিসরে সাফল্য অর্জন ও অভ্যন্তরীণ পরিসরে সহমত তৈরি। রাষ্ট্রের অন্য ধরনের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা, সামরিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকে শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ সহমত সৃষ্টি করা। এই নীতিগুলি দেশের মধ্যে করা হয় ও দেশের নাগরিকদের জন্য। অন্যদিকে পররাষ্ট্রনীতি তৈরি হয় দেশের মধ্যে কিন্তু দেশের সীমানার বাইরে অন্যদেশ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের জন্য। যদিও পররাষ্ট্রনীতি যে কোনো দেশে সব থেকে কম দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু এটি সব থেকে জটিল নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে। পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে থাকে আন্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতি, অভিবাসন নীতি এবং অবশ্যই বৈদেশিক কূটনীতি, দেশের যে কোনো নীতি প্রণয়ন একটি রাজনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ ভিত্তিক কাজ এর সাথে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য দরকার কৌশলগত চিন্তা, পরিচ্ছন্নতা, বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে অভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি শুধরে নেওয়া যেতে পারে

রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে। ভুল নীতি স্থগিত রাখা যেতে পারে এবং নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া যেতে পারে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতিতে একটি ভুল পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত চিরদিনের জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি দেশের সম্মান, অবস্থান ও ভূমিকাকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারে কারণ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোনো দ্বিতীয় নতুন সিদ্ধান্ত হতে পারে না। পররাষ্ট্রনীতি একবারই হয় এবং সেটা যথার্থ হওয়াই উচিত।

William Wallace এর মতানুসারে আভ্যন্তরীণ নীতির থেকে যে বৈশিষ্ট্য পররাষ্ট্রনীতিকে পৃথক করে তা হল এই যে পররাষ্ট্রনীতি আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিসরের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষকরা বিশেষভাবে জোর দেয় আন্তর্জাতিক কারণের উপর যার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সামনে পছন্দসই নীতি গ্রহণের বিকল্পগুলি সীমিত হয়ে যায়। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলোচনায় পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তুর উপর বেশি জোর দেওয়া হয় কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির প্রক্রিয়ার উপর বেশি নজর দেওয়া হয় না। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর মধ্যে একটা উদ্যোগের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি নাগরিক ও সরকারকে একই ভাবে চঞ্চল করে তোলে কিন্তু নাগরিকরা খুব কম সময় বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে আগ্রহী হয়। এই তারতম্যের সুদূর প্রসারী প্রভাব আছে। এর মাধ্যমে এটা বোঝায় যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী আধিকারিকরা সাধারণ মানুষের থেকে সচেতনতায় ও চিন্তা ভাবনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে। এর মানে এটাও যে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বেগ পেতে হয় নাগরিকদের থেকে সহমত আদায় করতে। Christopher Hill মনে করেছেন যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধীতা থাকবেই কিন্তু এরদ্বারা আমরা বুঝতে পারি রাজনীতির কিছু গূঢ় প্রশ্নসমূহ—বিভিন্ন বিষয়ে—কি করা হয়েছে, কি করা যাবে, কি করা হবে।

১.৩ পররাষ্ট্রনীতি গঠন—প্রেক্ষাপট ও ক্রীড়ক ঃ ভারতের উপর বিশেষ আলোকপাত

A. Appadurai —এর মতে 'পররাষ্ট্রনীতি' ও 'বৈদেশিক সম্পর্ক' এই দুটি ধারণা একই সাথে ব্যবহার করা ভালো একটি দেশের সাথে অন্যদেশগুলির সম্পর্কের সামগ্রীকতা বুঝতে। পররাষ্ট্রনীতি বলতে একটি দেশের অন্য দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে গঠিত নীতি, স্বার্থ ও লক্ষ্যের সমন্বয়কে বোঝায়। বৈদেশিক সম্পর্ক বলতে একটি দেশের অন্য দেশের প্রতি সেই ব্যবহারকে বোঝায় যা তার পররাষ্ট্রনীতিকে মান্যতা দেয় যেমন যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন করা, চুক্তিসম্পাদন করা, অনুদান দেওয়া বা গ্রহণ করা, অন্যরাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, কূটনৈতিক সম্পর্কে তৈরি করা ও আলোচনা চালানো।

একজন বিশ্লেষকের মতে 'পররাষ্ট্রনীতির বিষয়টি আসলে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পালিত সন্তান।' আভ্যন্তরীণ রাজনীতির একটি বিষয় হিসেবে দেখলে, পররাষ্ট্রনীতি আসলে একটি বিশেষ 'বিষয় পরিসর' (Issue area) যা উন্নত দেশগুলিতে চিহ্নিত হয়, একটি বিশেষ মূল্যবোধের সমষ্টিকে যেটা জড়িয়ে আছে কিছু নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়ক ও তাদের বিচারের উপর। তাই বলা যায় যে পররাষ্ট্রনীতির আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া একটি সময় ও একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে গঠিত। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নির্ভর কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনকারী ক্রীড়কদের নিয়ে গঠিত। তবে এটি একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং এখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রশাসক ছাড়াও সমাজের আরও অন্য পরিসর থেকেও আসে।

Rosenau মনে করেন যে একটি বিষয়ের পরিসর হিসাবে পররাষ্ট্রনীতি আসলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি

সমাজের সবরকম বিতর্কের সমষ্টি যা আবর্তিত হয় কিভাবে সমাজ তার বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখেছে তা নিয়ে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই বাহ্যিক পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা যায় তা হল পররাষ্ট্রনীতি আর এই নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বা অনিয়ন্ত্রণের ফলে তৈরি বিতর্কগুলো পররাষ্ট্র বিষয়ক বিশেষ 'নীতি পরিসর'। যখন বিতর্কগুলো স্তিমিত হয়ে আসে তার ওপর নিয়ন্ত্রণের ফলে বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বদলের ফলে নতুন বিষয়ে চলে আসে, এই নির্দিষ্ট পররাষ্ট্রনীতি 'বিষয় পরিসর' স্তিমিত হয়ে যায় আর নতুন বিষয় পরিসর তৈরি হয় যা নিয়ে আভ্যন্তরীণ সমাজ আলোচনা করে। পররাষ্ট্রনীতি তখনই একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে মানা হয় যখন তাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ও আলোচনা সরকারী পরিমণ্ডল ছেড়ে সমাজের একটি বৃহৎ পরিসরে প্রভাব ফেলবে। অন্যভাবে বলতে গেলে পররাষ্ট্রনীতি 'বিষয় পরিসর' আসলে একটি আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিসরের ব্যাপার, আন্তর্জাতিক পরিসরের আলোচনার ব্যাপার নয়। এখানে আলোচিত হয় না বাহ্যিক পরিসরে কি ঘটেছে কিন্তু আলোচিত হয় কিভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বাহ্যিক পরিবেশের মোকাবিলার জন্য।

ভারতবর্ষে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয় একটি অতি-রাজনৈতিক আভ্যন্তরীণ পরিসরে যেখানে কোনো সরকার বদলের সাথে সাথে সমস্ত নীতির বদল ঘটে। একটি নির্বাচনের পরে পরিবর্তনের মানসিকতা ও নতুন চাহিদার ফলে আভ্যন্তরীণ সমাজ সরকারী নীতির পরিবর্তনকে মেনে নিলেও, আন্তর্জাতিক সমাজ কিন্তু সম্পূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন থেকে নীতির পরিমার্জন ও প্রবাহমানতাকেই গুরুত্ব দেয়। ভারতে যদিও সরকারীভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব বিদেশ মন্ত্রণালয়ের ওপরে আছে কিন্তু বাস্তবে বিদেশমন্ত্রী সরকারের সামগ্রিক নীতি কাঠামো থেকে বের হতে পারে না। আর সরকার আসলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অর্থাৎ আগের সরকারের নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পক্ষে থাকে। এটা লক্ষ্য করা গেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় কংগ্রেস ও জনতা দলের মধ্যে ক্ষমতার পালা বদলের সময় বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর পরিস্থিতি বাধ্যবাধকতার জন্য ভারতের সমসাময়িক সরকারগুলি পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন থেকে বিরত থেকেছে। 'পূর্বে তাকাও নীতি, নয়া উদারনৈতিক, বাজার অর্থনীতি, এশিয় সংঘবদ্ধতা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি—পররাষ্ট্রনীতির এই দিক নির্দেশ যা উত্তর ঠাণ্ডা লড়াই যুগে প্রথম ভারতীয় সরকার রূপায়ণ করেছিল তা মোটামুটি পরের সরকারগুলিও মেনে চলেছে। তাই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষাপট পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমীকরণ।

এই নীতি প্রণয়নের ক্রীড়করা হল আন্তমন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (P.M.O) কেন্দ্রীয় সুরক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গোয়েন্দা বিভাগ। অন্যদিকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ পরিসরের চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে। ভারতবর্ষে বিদেশ মন্ত্রণালয়ের (M.E.A) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা এবং বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীদের চরিত্র সমান গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে।

২.৪ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন—সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামো

অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় 'সংসদীয় গণতন্ত্রে আভ্যন্তরীণ নীতির পাশে পররাষ্ট্রনীতিও প্রশাসনের দায়িত্ব। বৈদেশিক বিভাগ সরকারের অন্যান্য বিভাগের মত প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে চলে। কিন্তু বর্তমানের জটিল ও পরিবর্তিত আধুনিক বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ব্যাপারে বিদেশ মন্ত্রক তত্ত্বভিত্তিক পরামর্শ

দেয় প্রশাসনিক বিভাগকে অন্য যে কোনো বিভাগের থেকে বেশি। ১৯৪৭ সালে বিদেশ ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সূচনা হয় বিদেশবিভাগ ও কমনওয়েলথ সম্পর্ক বিভাগের সংযুক্তির মাধ্যমে। ১৯৪৯ সালে 'কমনওয়েলথ সম্পর্ক কথাটি বাদ যাওয়ার ফলে বর্তমান বিদেশ মন্ত্রণালয় (M.E.A) গঠিত হয়।'

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য সিদ্ধান্ত বিদেশমন্ত্রণালয় যার নেতৃত্বে আছেন বিদেশমন্ত্রী। এই বিদেশমন্ত্রণালয় South Block বলে একটি বাড়িতে স্থিত। পররাষ্ট্রনীতির কার্যালয় ও সামরিক মন্ত্রণালয় অবস্থিত South Block. নয়া দিল্লিতে রাইসিনা হিলের উপর অবস্থিত। নেহেরুর সময়কালে বিদেশমন্ত্রীর পরেই সিদ্ধান্তগ্রহণের কাঠামোতে সাধারণ সম্পাদক ছিল বিদেশমন্ত্রকের। কিন্তু লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যখন নেহেরুর মৃত্যুর পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে সর্দ্দার স্মরণ সিংকে ১৯৬৪ সালে পূর্ণ সময় বিদেশমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন তখন থেকেই সাধারণ সম্পাদকের পদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর থেকে বিদেশ সচিব বিদেশ মন্ত্রকের মুখ্য দায়িত্বে থাকেন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের কাঠামো বলতে বিদেশ মন্ত্রণালয়ের স্তরবিন্যাস পরিকাঠামোই বোঝায়। এই মন্ত্রকের কর্মীবৃন্দ ছয়টি স্তরে বিভাজিত—সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, অধিকর্তা, সহকারী সচিব ও সহযোগী সচিব (Under Secretary, Deputy Secretary, Director, Joint Secretary, Additional Secretary and Secretary)। রাজনৈতিক প্রশাসনের দিক থেকে বিদেশমন্ত্রণালয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদটি হল বিদেশমন্ত্রী (২০১৪ সালে বর্তমান মন্ত্রীর নাম সুষমা স্বরাজ) এবং বিদেশমন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী (২০১৪ সালে জেনারেল V. K. Singh)। রাজনৈতিক প্রশাসনের নিচেই শুরু হয় আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন আর সেখানে এই মন্ত্রণালয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল সচিব (২০১৪ সালে সুজাতা সিং)। ২০১৪ সালে বিদেশ সচিবকে ধরে বিদেশমন্ত্রকের চার সচিব আছেন যথাক্রমে—সচিব (পশ্চিম নভতেজ শর্মা), সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন মূলক যোগাযোগ পরিচালন—সুজাতা মেহেতা), সচিব (পূর্ব—অনিল ওয়াধা), এই চার সচিবের নীচে আছেন তিনজন অতিরিক্ত সচিব যথাক্রমে—অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিব যিনি ভারত আফ্রিকার যৌথ সম্মেলনে মূখ্য সমন্বয়কারী, অতিরিক্তসচিব যিনি মন্ত্রকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। এই অতিরিক্ত সচিবের সমমর্যাদায় আছেন একটি বিশেষ সচিব (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয়)। আগে সচিব ও অতিরিক্ত সচিব উভয় পাঁচজন করে ছিল কিন্তু এখন এই পদের সংখ্যা কমেছে ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে। পদমর্যাদা অধস্তনতার নিরিখে এই মন্ত্রকে আছে বেশ কিছু সহ সচিব এবং বিভাগীয় প্রধান। এই বিভাগগুলি আবার নির্দিষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত—'বিশেষজ্ঞ ও সমর্থিত বিভাগ' যেমন পরিচালন, সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক বিভাগ' যেমন আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপ, বৈদেশিক রাষ্ট্র ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের তথ্যের মূল উৎস হল বিভিন্ন দেশে তাদের পরিচালিত 'Missions' এবং 'Posts' এ কাজ করা কর্মীবৃন্দ বিদেশ বিভাগ যা ভারতের রাজধানীতে এই Missions এবং Posts দের কাজকর্মগুলো দেখে তাদের মূল দায়িত্ব হল একদিকে Missions এবং Posts আর অন্যদিকে বিদেশমন্ত্রীও ক্যাবিনেটের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ স্থাপন করা। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয় সরকারীভাবে ভারতের সমস্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য দায়ী। বিদেশমন্ত্রকের ভৌগোলিক সীমানা বিভাগ (Territorial Division) দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের দায়িত্বে আছে আর মন্ত্রকের ক্রিয়াশীল বিভাগ (Functional Division) এর দায়িত্বে আছে নীতি পরিচালন, বহুক্ষমতা কেন্দ্রীক গোষ্ঠী, আঞ্চলিক গোষ্ঠী, আইনি ব্যাপার, নিরস্ত্রীকরণ প্রথাগত ব্যবহার, অন্য দেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়, অনাবাসী ভারতীয়, গণমাধ্যম ও প্রচার এবং পরিকল্পনা প্রশাসন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামোর মধ্য পড়ে ভারতীয় বিদেশ পরিষদের (Indian Foreign Service) কর্মীবৃন্দ যেখানে আট থেকে দশ জনকে নেওয়া হয় বছরে এবং বর্তমানে এদের কর্মী সংখ্যা ছয়শো অফিসার যারা ১৬২-র বেশি Missions এবং Posts এর দায়িত্বে আছেন ও ভারতের মধ্যেও বিদেশ মন্ত্রকের বিভিন্ন জায়গায় আছেন। ভারতীয় বিদেশ কার্যের পরিষদের উপর গঠিত Pillai Committee যথার্থই বলেছে যে 'বিদেশকর্মী সভার প্রাথমিক দায়িত্ব হল বৈদেশিক সমস্ত বিষয়ে অবিরত তথ্য সরবরাহ, বিদেশ মন্ত্রকের কাছে সমসাময়িক ঘটনা ও ভারতের স্বার্থ জড়িত এমন সমস্ত বিষয় সাপক্ষে পূর্ণাঙ্গ ও সুচিন্তিত রিপোর্ট তৈরির মাধ্যমে ... যেগুলিকে পুষ্ট করতে হবে নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণ ও পরামর্শের মাধ্যমে যার প্রভাবে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী নীতি বদল সম্ভব হয়'।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ—পরিকাঠামোর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে জনগণের কাছে নীতির তথ্য পৌঁছায় তা হল সরকারী মুখপাত্র ও সহসচিব (বাহ্যিক প্রচার) এর কার্যালয় যা বিদেশ মন্ত্রকের সাথে যোগাযোগের একমাত্র প্রক্রিয়া। ২০১৪ সালে এই বিভাগের মুখ্য মুখপাত্র হল Syed Akbaruddin এবং সহ সচিব এর সাথে আছেন একজন অধিকর্তা, একজন সহযোগী সচিব, দুইজন সহকারী সচিব, দুইজন বিশেষ কাজে নিযুক্ত অফিসার ও আট জন প্রচারকার্যে নিযুক্ত অফিসার।

এই ধরনের স্তরবিন্যাস ভারতে পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোর মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচার, নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২.৫ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ব্যক্তিত্বের প্রভাব

ভারতের মতো যে কোনো সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উচ্চমন্ত্রণালয়ের যৌথ দায়িত্ব থাকে যার নেতৃত্বে থাকেন প্রধানমন্ত্রী যিনি সমগুরুত্ব সম্পন্ন মন্ত্রীদের মধ্যে প্রথমজন হওয়ার ফলে (First among equals) মসৃণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস হয়ে থাকেন। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করে যে 'সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি বিশেষ উপাদান পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো ও প্রক্রিয়ায়। তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, আচরণগত বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতায় টিকে-থাকার অভীপ্সা ও ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করার বাসনা প্রভাবিত করে পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণ ও প্রণয়ন কে'। সরকারীভাবে যদিও ভারতে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বিদেশমন্ত্রী ও বিদেশ সচিবের আছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অনেকাংশে পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো ও দিক নির্দেশিকা রূপায়ন করতে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং সেই জন্য প্রধান মন্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, প্রধানমন্ত্রীকে আসলে তৈরি করে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা—নির্বাচনের মাধ্যমে কতটা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও সমর্থন তিনি পেলেন তার উপরও নির্ভর করে প্রধান মন্ত্রীর প্রভাব। আন্তর্জাতিক পরিসরের কাছে কিন্তু একটি সরকার প্রধানমন্ত্রীর নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে যেমন—নেহেরুর সরকার, ইন্দিরার সরকার বা মোদীর সরকার। তাই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বুনিয়াদ তৈরি করেছেন জহরলাল নেহেরু যিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী ছিলেন। নেহেরু ১৯৪৩-১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সরকারের সময়ে স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে খসড়া তৈরি করেছিলেন। নেহেরুর মতাদর্শগত চিন্তার প্রেক্ষাপট ছিল বিস্তৃত—ফেবিয়ান সমাজবোধ

থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম থেকে গান্ধীর অহিংসা। একজন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্ভুত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিজের সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও ভারতীয় দর্শনের উপর অগাধ জ্ঞান, নেহেরুকে একজন আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবক্তা করে তুলেছিল যেখানে তিনি সংঘবদ্ধ মানবসমাজ ও সহযোগিতাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিসরের কল্পনা করতে শিখিয়েছিলেন। নেহেরুর মতে ভাববাদ হল 'আগামী দিনের বাস্তববাদ' আর পররাষ্ট্রনীতি রূপায়ণের ব্যাপারে বাস্তববাদী হওয়াই প্রয়োজন। নেহেরুর জ্ঞানমার্গের বিস্তার, দার্শনিক ও মতাদর্শের মুক্ততা ভাগ্য ও তার্কিকতা, পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ব্যাপারে তাকে বিশেষ ভূমিকা নিতে সাহায্য করেছিল। নেহেরু শান্তির দূত ছিলেন, বিদেশী ক্ষমতার হাত থেকে মুক্তির ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং তিনি এশীয় সংঘবদ্ধতার পক্ষে ছিলেন। নেহেরু নিজে এবং ভারতবর্ষের নাম বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় নামঙ্কিত করলেন নির্জোট আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করে, নেহেরুর সময়কালে ১৯৬২-র চিন যুদ্ধে পরাজয়ে নেহেরুকে মানতে বাধ্য করেছিল জীবনের শেষ লগ্নে এসে এই সত্য যে, তিনি নির্জোটিতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তার ফলে একধরনের কৃত্রিম পৃথিবীতে বাস করেছিলেন আধুনিক বিশ্বে।

ইন্দিরা গান্ধি এমন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন যা তাকে সুচতুর ভাবে তার সমাজতান্ত্রিক বড় আদর্শের (Rhetoric) কথাগুলিকে (যেগুলি তার পিতা নেহেরুর সাথে অনুধাবন করেছিলেন) সুচতুর ভাবে ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলেন, তার নিজের রাজনৈতিক আস্তিত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক কাঠামো বিস্তারের জন্য। এই কথাগুলি দ্বারা তিনি তার প্রধানমন্ত্রীত্বের একটি কঠিন সময়ে পাশে পেয়েছিলেন বামপন্থী দলগুলির সমর্থন, ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের ভাঙনের সময় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যথেষ্ট সমর্থন জুটিয়ে ছিল, এবং তার পররাষ্ট্রনীতির অতি সোভিয়েতিকরণ ও মার্কিন বিরোধিতাকে যৌক্তিকতা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে অস্থির অবস্থার সময় যেখানে চিনের সাবধানবাণী পূর্ব পাকিস্থানের মুক্তির ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করতে এইসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের সৌহার্দ্য বৃদ্ধিও হয়েছিল, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল যেটা সেই সময়ের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দাবি ছিল এবং সেটা সম্ভব হল ইন্দিরা গান্ধীর চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য। তার কৌশলী কূটনীতিবিদ্যা ও ক্ষমতার ব্যক্তিকরণে (যা নিজের রাজনৈতিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আশঙ্কা থেকে গড়ে উঠেছিল) বৈশিষ্ট্যতার জন্য ইন্দিরা গান্ধী নিজের বিদেশ সচিবদের বারংবার পরিবর্তন করতেন, বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে কৌশলীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আবার সঠিক সময় নিজের থেকেই যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিলেন যাতে বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা না হয় সে ভাবে, ১৯৭৪ সালে পরমাণু পরীক্ষা করলেন ভারতের সামরিক সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মার্কিন ও সোভিয়েতের পরোক্ষ নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে এবং সিকিমকে ভারতের মধ্যে অধিগ্রহণ করলেন।

রাজীব গান্ধীর অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের রাজনৈতিক আচরণ (যা তার মায়ের মৃত্যুর পর হঠাৎ করে ক্ষমতা আসার ফলে নিজের প্রতি আস্থার অভাবে থেকে গড়ে উঠেছিল) তার পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশিকার ওপর প্রতিফলিত হয়েছে যার কয়েকটি নির্দশন হল তার উচ্চ মন্ত্রালয়ের মন্ত্রী (ক্যাবিনেট) ও বিদেশ মন্ত্রীদের হঠাৎ করে যৌক্তিক কারণ ছাড়া বদল, পাকিস্তানের সাথে ভালোভাবে যোগাযোগ না করেই নিজের দায়িত্বেই সামরিক মহড়া করা যা একটি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল, শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত যা শ্রীলঙ্কার সরকারের পক্ষে ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত তামিল নাগরিকদের বিরুদ্ধে, নিজের এবং দেশের ক্ষমতা জাহির করার প্রবণতা মালদ্বীপের আভ্যন্তরীণ সমস্যা মেটানোর জন্য সেনা পাঠিয়ে, তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। পাকিস্তানের সাথে আলাপচারিতা চালিয়ে যাওয়ার

সিদ্ধান্ত যা ফলপ্রসূ না হয়েও (বেনজির ভুট্টো রাজীব সরকারের আমলে অনেক আলোচনার পরেও কাশ্মিরের জেহাদিদের সমর্থন করেছিলেন।)

পি. ভি. নরসীমা রাও ঠাণ্ডা যুদ্ধ উত্তর পৃথিবী মোকাবিলা করেছেন তার প্রাজ্ঞতা, রাজনীতি সম্বন্ধে সাম্যক অভিজ্ঞতা (কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা হওয়ার সুবাদে) তার নরম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা নিয়ে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাও ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে বিশ্বের বাজারের জন্য, ভারতের মার্কিন সম্পর্ক বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হন ও ভারতকে বিশ্বরাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলেন। আই. কে. গুজরাল একজন পরিপক্ক কূটনীতিবিদ হওয়ার সুবাদে, পররাষ্ট্র বিষয়ে সাম্যক জ্ঞান থাকার সুবাদে, ও নেহেরুর চিন্তার কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রথমে বিদেশমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অবহেলিত একটি দিক—দক্ষিণ এশিয় প্রতিবেশী অঞ্চল—নিয়ে চিন্তা করে সম্পর্কের উন্নতির হেতু কিছু স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

অটল বিহারী বাজপেয়ী একজন অগাধ পড়াশুনা জানা মানুষ ছিলেন। বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি আবার সংঘ পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। এই রকম একজন চরিত্র যার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটি উপাদান আছে—জ্ঞান (যার প্রতিফলন তার কৌশলী পদক্ষেপ—ভারত মার্কিন সম্পর্ক উন্নয়নে দেখা যায়) আর আনুগত্য (যা তাকে বাধ্য করায় দুটি জিনিস করতে— ১. বিশেষ পরিচিত লোক যেমন, ব্রজেশ মিশ্রকে এক সাথে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত করতে আর ২. অন্য দিকে মুসলিমদের প্রতি বিরাগ ভাজনতা)। তিনি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছেন—যেমন পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা, কারগিল যুদ্ধ জয়, আগ্রা সম্মেলন ও লাহোর বাস কূটনীতি, এগুলি সবই পরস্পর বিরোধী পদক্ষেপ—একই সাথে সৌহার্দ্যতা ও শত্রুতা।

মনমোহন সিং ছিলেন নেহরুর পর একটানা সবথেকে বেশি সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী। একজন বিশ্ববিদিত অর্থনীতিবিদ্ যখন 'দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন' (সঞ্জয় বাবুর ২০১৪ সালে প্রকাশিত বই এর নাম 'The Accidental Prime Minister') তখন তার মধ্যে দেখা যায় ভদ্রতার অপরিসীম প্রতিফলন যা তাকে নীরবে দলীয় সভাপতির নির্দেশ মানতে বাধ্য করে বা দলীয় সহ সভাপতির অপমান কে সহ্য করতে বাধ্য করে। মন্টেক সিং আলুয়ালিয়াকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রেখে, মনমোহন সিং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিকে সত্যিকারের উদারবাদী করে তুলেছিলেন। অর্থনৈতিক উন্মুক্ততার সর্বোচ্চ পরিণাম হিসাবে খুচরো ব্যবসাতেও বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধির এবং আভ্যন্তরীণ বিরোধীতার সামনেও ভারত মার্কিন পারমাণবিক চুক্তিতে অবিচল থেকে আর ভারতকে সত্যিকারের 'ব্যবসায়ী রাষ্ট্র' (Trading State) হিসাবে তৈরি করে বিশ্বের সমস্ত বহুক্ষমতা ভিত্তিক সংগঠনগুলিতে সক্রিয় সদস্য করে। ভারত তার নেতৃত্বে বিশ্ব রাজনীতিতে একটি বিশাল উপস্থিতি তৈরি করেছে কিন্তু কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ভূমিকা লাভ করেনি।

২০১৪ সালের মে মাসে ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তার দৃঢ় প্রত্যয়ী চরিত্র, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পুষ্ট মনন, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দশ বছরেরও বেশি নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষকদের কাছে তার থেকে আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে নতুনত্ব আশা করলেও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নতুনত্ব কেউই আশা করেনি। কিন্তু তার পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে দিয়েই তিনি সবাইকে অবাক করেছেন। তার শপথ গ্রহণে SAARC গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত রাষ্ট্র প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়ে, ভূটান এবং নেপালকে তার প্রাথমিক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিদেশ সফরের গন্তব্য রেখে, পাকিস্থানকে চরম সাবধানবাণী দিয়ে ভারতের

সাথে কূটনৈতিক আলোচনা ও কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে আলোচনার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে, চিনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নীরব শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়ে বিকল্প ক্ষমতার পরিসর যেমন BRICS কে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ SAARC পরিবেশ গঠনে উদ্যোগী হয়ে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে বৈচিত্রময় বিভিন্ন চরিত্রের নেতৃত্বে—ভাববাদী মানবিক নেহেরু, ব্যক্তি ক্ষমতাকেন্দ্রীক ইন্দিরা গান্ধী, অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী রাজীব গান্ধী, নরমত সময়োচিত নরসীমা রাও, চিন্তাশীল গুজরাল, বাস্তববাদী ও কৌশলী বাজপেয়ী, আনুগত্য পূর্ণ মনমোহন সিং ও সুচতুর মোদী। তার ফলে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির দিক নির্দেশিকাগুলি ও বৈচিত্র্যময় ও মনোজ্ঞ হয়েছে।

২.৬ ভারতের পররাষ্ট্রীনীতি প্রণয়ন-প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান

যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের তিনটি পর্যায় থাকে—তার প্রেক্ষাপট (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক), তার ক্রীড়ক (যে সমস্ত চরিত্র তার প্রণয়ন ও তার রূপায়ণ করে) ও তার ক্রিয়াশীলতা (প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠান)। পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্ত অনেক কৌশলী ও তত্ত্ব ভিত্তিক চিন্তার মাধ্যমে নেওয়া হয় তাই সিদ্ধান্তটা প্রক্রিয়া হলে প্রক্রিয়ার পরিসরটা হল আন্তঃমন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য—একটি হল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (P.M.O) যেটা আগেকার প্রধানমন্ত্রীর সচিবলায় (P.M.S) থেকে গড়ে উঠেছে। P.M.O তার বর্তমান নামকরণ হয়—মোরাজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে ১৯৭৭ সালে P.M.S এর জায়গায়। নেহেরুর সময় সামান্য উপস্থিতির পর ইন্দিরা গান্ধীর সময় ক্ষমতাশালী ও মোরাজী দেশাই এর হাতে নতুন নামকরণের ফলে P.M.O সবথেকে সক্রিয় ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। রাজীব গান্ধীর আমলে, অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৈধতা ও প্রভাব এতটাই ছিল যে একে এক এক সময়ে বিদেশ মন্ত্রণালয়কেও ছাপিয়ে গেছে। U.P.A সরকারের আমলে P.M.O এর থেকে M.E.A বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় বিদেশমন্ত্রীদের ব্যক্তিত্বের জন্য যেমন নটোয়ার সিং, প্রণব মুখার্জী, শশী থারুর এবং বিদেশ সচিব—যেমন শিব শঙ্কর মেনন, শ্যামশরণ দের মত ব্যক্তিদের প্রভাবশালী উপস্থিতির ফলে। তবে মোদী সরকার আসার ফলে এই প্রবণতা হয়তো উল্টো যাবে কারণ মোদীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজের ভাবনা অনুযায়ী নেওয়ার জোরালো ইচ্ছার ফলে। P.M.O ও M.E.A এর মধ্যেকার ক্ষমতার তারতম্য নির্ভর করে অনেকটাই সরকরের আভ্যন্তরীণ সমর্থনে আর প্রধানমন্ত্রীর চারিত্রিক সবলতা ও দুর্বলতার ওপর।

তুলনামূলক ভাবে নতুন যে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠানটি পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতে গুরুত্ব পাচ্ছে তাহলো জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ (NSC) যদিও আইনগতভাবে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি সিং ১৯৯০ সালে, এই প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব গাম্ভীর্য ও সাবালকত্ব লাভ করে ১৯৯৮ সালে NDA সরকারের আমল থেকে যখন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব যৌথ নিরাপত্তা চিন্তক কমিটি (Joint Intelligence Committee) থেকে কেড়ে নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষা পরিষদ সচিবালয় (National Security Council Secretaruat) কে দেওয়া হয়। এই পরিষদের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী আর অন্যান্য সদস্যরা হলেন সামরিক, বাণিজ্য ও বিদেশমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সহ সভাপতি (তবে মোদী সরকার পরিকল্পনা কমিশন উঠিয়ে দেওয়ার ফলে এই সদস্য আর থাকবে না)। এই পরিষদে আছে কৌশলী পরিকল্পনা গোষ্ঠী

(Strategic Policy Group) জাতীয় সুরক্ষা উপদ্রেষ্টা (National Security Advisor) এবং একটি সচিবালয় যার প্রতিনিধিত্ব করে যৌথ নিরাপত্তা চিন্তক কমিটি (Joint Intelligence Committee). NDA ও UPA সরকারের আমলে এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে বহু আলোচনা হলেও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় সুরক্ষার বেহাল দশা দেখা যায়—যেমন ১৯৯৮ সালে বিমান অপহরণ, ২০০১ এর সংসদ ভবনে হামলা ২০০৮ এর মুম্বাইতে সন্ত্রাসবাদী হামলা—এই ঘটনাগুলির এই NSC প্রতিষ্ঠানটিকে সমালোচনার সম্মুখে দাঁড় করায় ও এটিকে অ-ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান (Non Functional Body) বলেও অভিহিত করা হয়। ২০১৪ সালের মোদী সরকারের প্রথম কয়েক মাসে এই প্রতিষ্ঠান আছে এবং জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অজিত কুমার ধোবাল।

ভারতের গৃহমন্ত্রণালয়ের অবিনস্ত Intellignce Bureau (I B) অনেক বছর ধরে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করতো। ১৯৪৭ সালে Research and Analysis Wing (RAW) এর গঠনের পর বৈদেশিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ ও সরবরাহ RAW র দায়িত্ব হয়। RAW র মূল লক্ষ্য হল অগ্রাসী মনোভাব নিয়ে বৈদেশিক ঘটনা তা সে যতই লঘু হোক না কেন যেগুলি ভারতের নিরাপত্তার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সে সম্বন্ধে যে কোনো উপায়—চরবৃত্তি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ এমনকি বিশ্বাসঘাতকতা ও খুনের মাধ্যমে তথ্য জোগাড় করা। RAW র সক্রিয়তা বেশ কিছু দেশের বিশেষ ভাবে নজরে পড়ে যেমন আফগানিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মায়ানমার, সিঙ্গাপুর ও হংকং। এই তথ্যগুলি পড়ে নির্দিষ্ট ভাবে সাজিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় এবং কিছু Computer জাত সূত্রের মাধ্যমে পরিবেশনা করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র ও গণমাধ্যমকেও RAW স্বাধীনভাবে তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারে।

নয়াদিল্লীস্থিত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশ্লেষক গোষ্ঠী বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে RAW র কাজের জন্য যথেষ্ট কর্মী সংখ্যা নেই বৈদেশিক তথ্য সংগ্রহের জন্য।

২.৭ সারাংশ

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যেখানে প্রধানমন্ত্রীগণ যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে পররাষ্ট্র বিষয়কে দেখে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা জাহির করার লক্ষ্যে আর সেজন্য বিদেশমন্ত্রককেও পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কখনও P M O বা কখনও N S C এর মাধ্যমে। বহু স্তর বিন্যস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিকাঠামো যা M E A তে আছে আর তার সাথে বিদেশমন্ত্রণালয়ের কর্মীবৃন্দ ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণকে একদিকে জটিল করে তোলে আবার অন্যদিকে বহুস্তরীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তকে আরও সঠিক করে তুলতে পারে। একথা বলা যেতে পারে যে চরিত্রের দিক থেকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে জওহরলাল নেহেরু তার মূল্যবোধ ভিত্তিক চিন্তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে M E A সবথেকে উল্লেখযোগ্য।

২.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নসূচী

দীর্ঘ প্রশ্নসমূহ:

১. ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে যুক্ত ক্রীড়কদের নিয়ে আলোচনা করুন বিশেষ চরিত্রদের উপর আলোকপাত করে।

২. সবিস্তারে বর্ণনা করুন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান সমূহের গুরুত্ব ও কার্যাবলী।

মাঝারি প্রশ্নসমূহ:

১. ভরতের পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামো বিশেষণ করুন।

২. ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ব্যক্তিত্বের প্রভাব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ:

১. ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচয় দিন।

২. ভারতের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে প্রক্রিয়া বিষয়ে টীকা লিখুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

William Wallace, *Foreign Policy and the Political Process*, Macmillan, London. 1971.

Rosenau, Jomes, N. ed. (1967), *Domestic Sources of Foreign Policy*, Free Press, New, York.

A. Appadorai, The Domestic Roots of India's Foreign Policy, 1978.

Jayantanuj Bandopadhyaya, *The Making of India's Foreign Policy*. Thrid Edition, Allied Publishers, New Delhi, 2003.

একক ৩ ☐ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি—একটি বিবর্তনমূলক রচনা
৩.৪ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি—ভিত্তিমূলক নীতিসমূহ
৩.৫ নির্জোটতা ও ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি
৩.৬ ভারতের নির্জোট আন্দোলন—একটি সমালোচনা ভিত্তিক প্রকল্প
৩.৭ সারাংশ
৩.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নসূচী
৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন বিষয়ে ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিসমূহের বিষয়ে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্জোটতার ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা।
- ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী পৃথিবীতে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা।

৩.২ ভূমিকা

একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি তার জাতীয় স্বার্থে নিহিত থাকে। জাতীয় স্বার্থ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় একটি দেশের উদ্যোগ তার সীমানার নিষ্কুলসতা রক্ষার্থে তার অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন বা বাস্তববাদীদের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভিত্তি অন্বেষণ ও বৃদ্ধির প্রয়াস। কিন্তু কিছু বিশ্লেষকের মতানুযায়ী পররাষ্ট্রনীতি বলতে বোঝায় কিছু মূল্যবোধের সমষ্টি বা নীতিসমূহ যা দেশের দৈনন্দিন জাতীয় স্বার্থের অন্বেষণের কাঠামো তৈরি করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং আন্তর্জাতিক সার্বভৌম রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য হয়। স্বাধীনতার সময়কাল থেকেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি একটি প্রবাহমানতা (Consistency) লক্ষ্য করা যায়। তবে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিবর্তনের সাথে স্থায়ী সামঞ্জস্য রেখে তা বদলেছে এবং পরিমার্জিত হয়েছে। বলাদাস ঘোষালের মতে পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র দেশের সার্বভৌমিকতা, সীমানা রক্ষা ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষাকে বোঝায় না, এর মানে এটাও যে নির্ভরতার মাত্রা কমিয়ে একটি দেশের সরকারের সামর্থের প্রতিফলন যার

দ্বারা স্বাধীনভাবে সে তার নীতি নির্ধারণ করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর মানে হতে পারে আঞ্চলিক ও বিশ্ব নেতৃত্বের পরিমণ্ডলে নিজের অধিকার ও প্রাকৃতিক ন্যায়সঙ্গত অবস্থান আদায় করে নেওয়া। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মতাদর্শ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র যা প্রভাবিত করেছিল ভারতীয় কংগ্রেসকে যে দল স্বাধীনতার পর চার দশক ক্ষমতায় ছিল ও তার নেতৃত্বে থাকা জওহারলাল নেহেরু যিনি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূল স্থাপতি ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে জাতীয় কংগ্রেসের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের খসড়া নেহেরু নিজেই তৈরি করতেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যবর্তী সরকারের সময় এবং তার পরেও নেহেরু ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের দায়িত্বে। ১৯৪৭-এ নেহেরু বলেন 'আমরা যে নীতিই গ্রহণ করি না কেন,দেশের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে লক্ষ্য থাকা উচিত কোনটা জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা শক্তি এবং সৌহার্দের কথাও বলতে পারি এবং এর আক্ষরিক মানে বোঝাতে চাই।' কিন্তু শেষ বিচারে, একটি সরকারের পররাষ্ট্রনীতি তার দেশের ভাবনার জন্য গৃহীত হয় এবং সে কখনো এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেবেনা যা সাময়িক বা সুদূরপ্রসারী সময়ে সেই দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। তাই দেশের সরকার সমাজতান্ত্রিক হোক বা সাম্রাজ্যবাদী হোক, তার বিদেশমন্ত্রী প্রাথমিক স্তরে দেশের স্বার্থের কথাই ভাববে। নেহেরু ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি ও ভাববাদ ও বাস্তববাদের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন বা তার কথায় ধ্বনিত হয়েছে—'আমরা ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব সহযোগিতার বিষয়টি দেখি এবং চেষ্টা করি যতটা সম্ভব বিশ্বশান্তি সংরক্ষিত থাকে।' ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি সবসময় বিশ্ব শান্তি, মানবিক ও ন্যায়ধর্মী বিশ্বের পক্ষে থেকেছে যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনো ধরনের বৈষম্য থাকবে না।

৩.৩ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি :একটি বির্বতনমূলক রচনা

ভারতের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রবেশ একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল যার মাধ্যমে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কারণে এবং নির্জোটতার মতো ধারণার প্রসারের মধ্য দিয়ে ভারত হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি প্রাকৃতই উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র যদিও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ক হয়ে ওঠেনি। ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে (একমেরু পৃথিবী, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ভারতের এক ঐতিহাসিক সুহৃদকে হারানো, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন) এবং অন্য দেশগুলির মতো ভারতও সম্মুখীন হয় এক নতুন কৌশলী পরিবেশন যা দাবী করে নতুন নীতিসমূহের। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের জায়গায় আসে অস্থির জোট সরকারের যুগ যার প্রভাব পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ভারতের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি লক্ষ্য করা যায়—স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতির অন্বেষণ (১৯৪৭-১৯৬৬), কেন্দ্রীকতা ও সমাজবাদের বিষাক্ত মিশ্রণ (১৯৬৬-১৯৯০) সংস্কারে লক্ষ্যে, ১৯৯০-এর সময় থেকে বিশ্বায়ন ও পারস্পরিক নির্ভরতার দ্বারা প্রভাবিত বেশি বিদেশী অনুদান পাওয়া জন্য এবং ভারতের পররাষ্ট্র অনুদানের মাধ্যমে নিজের প্রতিবেশী অঞ্চল ও আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলিতে প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি আছে তা হল—শক্তি ও খাদ্য সুরক্ষা, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার জন্য তৈরি হওয়া অনিয়ন্ত্রক বিশ্বঅর্থনীতির তারতম্য, চিনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের অবিরাম বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ গ্রাম-শহর বিভেদ এবং জনবন্টন ব্যবস্থার বেহাল দশা বিশ্ব উন্নয়ন ও পরিবেশ পরিবর্তনতার আভ্যন্তরীণ প্রভাব। ২০০৮-২০০৯ সালের জি-২০ সম্মেলনে ভারতীয় অর্থনীতির

সবলতা ও স্থায়িত্ব (বিশেষ করে ২০০৮-এর অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষিতে) ..... হয় এবং বিশ্লেষকেরা মনে করেন যে ভারতীয় অর্থনীতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিকে নতুনভাবে সাহায্য করতে পারে পররাষ্ট্রনীতির সবলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। বর্তমান বহুপাক্ষিক বিশ্বে ভারত একটি 'উদীত' ক্ষমতা বলে বিবেচিত হয় আর ভারতের 'উদীয়মান' ক্ষমতার চিত্র এখন বিশ্ব আর মনে রাখতে চাইছে না। ভারত ক্রমেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা 'ব্যস্ত' রাষ্ট্র হয়ে উঠছে। পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিবেশ বাধ্য করেছে তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনতে তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখে। ভারতের পররাষ্ট্র ক্ষেত্রের এই ব্যস্ততা অনেকাংশেই জাড়িত আছে ১৯৯১ সালের প্রণীত আভ্যন্তরীণ নয়া অর্থনৈতিক নীতির সংস্কারের মধ্যে। বর্তমানের ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আভ্যন্তরীণ বিতর্কের মূল বিষয় হল নির্দিষ্ট পররাষ্ট্র বিষয় এর বিবরণ নয় বরং পরিবর্তিত নীতির সাথে মানাতে কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা। একটি বিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির যাত্রা হল নির্জোটতা থেকে বহুপাক্ষিক জোটবদ্ধতা, একক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা থেকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মেলবন্ধন, একটি সক্রিয় পররাষ্ট্রনীতি থেকে অতি-সক্রিয় পররাষ্ট্রনীতি এবং দার্শনিক কাঠামো ভিত্তিক নীতি থেকে মুহূর্ত ভিত্তিক (ad hoc) কৌশলী নীতির সিদ্ধান্ত।

৩.৪ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি: ভিত্তিমূলক নীতিসমূহ

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত চেষ্টা করেছিল তার পররাষ্ট্রনীতির পছন্দসমূহকে কিছু নির্দিষ্ট ভিত্তিমূলক নীতির ওপর গঠন করতে যেমন নির্জোটতা, ঔপনেবেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবিদ্বেষের বিরোধিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, নিরস্ত্রীকরণ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে নিবিড় যোগাযোগ। বলাই বাহুল্য যে এই সমস্ত নীতিসমূহ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিগত মতাদর্শগত বিশ্বাস ও কাজ করার ধরনের দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই নেহেরুকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নীতিমানমূলক কাঠামোর রচয়িতা/জনক বলা হয়।

নির্জোটতা ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, ভারতের স্বাধীনতার সময় বিশ্ব দুটি মহাশক্তিধর দেশের মধ্যে বিভাজিত ছিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভারত পছন্দ করলো দুদেশের থেকেই দূরে থাকতে। এই নীতি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি। এই নীতি ভারতকে আটকে রাখেনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করতে। এই নীতির ফলে ভারত শুধুমাত্র যে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দরজা খোলা রেখেছে তা নয়, বিভিন্ন দেশের থেকে অনুদান গ্রহণের রাস্তাও খোলা রেখেছিল। এই নির্জোট নীতি এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্র এই নীতি গ্রহণকেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়কালে শ্রেয় বলে মনে করেছিল।

ভারত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার দ্বারা পরিচালিত, আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল প্রায় দুশো বছর ধরে যার ফলে স্বাধীনতার সময় ভারতের অর্থনীতি ভগ্নপ্রায় দশায় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে তাই ভারত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করেছিল, এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও অন্যান্য প্রভাবকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে প্রসারিত করতে। এমতাবস্থায় নেহেরুর সিদ্ধান্তের নিরিখে ভারত যখন ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর সদস্যপদ

গ্রহণ করে তখন প্রতিবাদ, সমালোচনা ও নিন্দা করা হয়েছিল তবে মনে করা যেতে পারে যে এই পদক্ষেপ আসলে তদানীন্তন অস্থির পরিবেশে ভারতের সুরক্ষার স্বার্থে নেওয়া হয়েছিল দ্বিমেরুকরণের মধ্যে না জড়িয়েও। সাবেকী সাম্রাজ্যবাদও ঔপনিবেশিকতার অবসানের পর শুরু হয় নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদের যুগ এবং ভারত ক্রমাগত তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমর্থন করে গিয়েছে। ভারত জোরালো ভাবে সমর্থন করেছে নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিসরের (NIEO) দাবীকে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমন্বয় ঘটাতে, যাতে সবাই মিলে নয়া-ঔপনিবেশিকতাকে প্রতিহত করতে পারে।

বর্ণ-বিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা বা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রসারের উদ্যোগের থেকে কোনো অংশে কম নয়। ভারত হল প্রথম সদস্যরাষ্ট্র যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এই বিষয়টি তোলে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ ও মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন বক্তব্যের পরিপন্থী বর্ণ-বিদ্বেষ বিষয়টি সেটা উল্লেখ। তাই বলা যায় যে ১৯৯০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের অবসান ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি বড়ো সাফল্য। পরবর্তী সময়ে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষাঙ্গ সম্প্রদায় ও রোডেশিয়ার আফ্রিকান নাগরিকদের অবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে প্রচার করে। ভারতের কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন লীলা শেঠী, কিরণ দেশাই, সলমন রুশদি বলেন যে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিদেশে এই বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছেন আর তাই বলা যায় যে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির বর্ণ-বিদ্বেষ বিরোধীতার উপাদানটি আজও প্রাসঙ্গিক।

নির্জোট নীতি গ্রহণের সাথে সাথেই ভারত প্রচার করতে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন মতাদর্শগতভাবে প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের বাণী। ভারত এই প্রচার অভিযানের মাধ্যমে চিন, নেপাল, যুগোস্লাভিয়া, ইজিপ্ট—প্রভৃতি দেশের সাথে প্রগাঢ় সম্পর্ক তৈরি করে। বিশ্বশান্তিকে কার্যকর করার লক্ষ্যে নেহেরু পঞ্চশীল নীতির সূচনা করেন—পারস্পরিক সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক অনাগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করা, অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সাম্য ও স্বার্থ রক্ষা, এবং শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। এই পঞ্চশীল নীতি নেহেরু প্রবর্তন করেন চিনের সাথে সম্পর্কের নিরিখে ১৯৫৪ সালের তিব্বত অঞ্চল নিয়ে পারস্পরিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে। তবে এই নীতির উৎস প্রোথিত আছে প্রবাহমান কাল ধরে চলে আসা সনাতন ভারতীয় ধর্ম ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর যার ভিত্তি হল সর্ব-ধর্ম-সমভাব বা সমস্ত ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা। এই শান্তিপূর্ণ সহবস্থান বা আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার মতো মূল্যবোধগুলি আজও ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ বর্তমান শতাব্দীতেও। ২০০৮ সালের নৃশংস মুম্বাই এর সন্ত্রাসবাদী হামলার পরেও ভারত যেরকম সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে সেটাই সব থেকে বড়ো প্রমাণ।

ভারত একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হওয়ার সুবাদে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতি প্রথম থেকেই অগাধ আস্থা রেখেছে এবং এই সংগঠনের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা অভিযানে ভারত তার সেনা পাঠিয়েছে মধ্য প্রাচ্যে, সাইপ্রাসে, কঙ্গো ও জাইরি (Zaire) তে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগে অংশগ্রহণের পাশাপাশি ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা যেমন ILO, UNESCO, UNICEF এদের কর্মসূচীতে। ১৯৯০ সাল থেকেই ভারত তার আন্তর্জাতিকতার একটা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার লক্ষ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের দাবী জানিয়ে আসছে তবে এখনও অবধি তা ফলপ্রসূ হয়নি।

ভারত সবসময় নিরস্ত্রীকরণের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছে দুটি কারণে—প্রথমতঃ ভারত মনে করে যে নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে বিশ্ব অশান্তির সমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য খরচ কম হবে

আর সেই অর্থ কাজে লাগবে সামাজিক উন্নয়নের জন্য। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার যে কোনো পদক্ষেপের পক্ষে ভারত থেকেছে যা নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিমূলক নীতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মূল নির্যাস এটা নয় যে ছয় দশক আগে গৃহীত নীতিসমূহ একই রকম থেকেছে। মূল বিশ্লেষণের নির্যাস হল যে একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করতে গেলেও এই মূল্যবোধ সমূহ গুরুত্বপূর্ণ আলোকের কাজ করে।

৩.৫ নির্জোটতা ও ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি

নির্জোটতা হলো প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর একান্ত অবদান স্বাধীন ও স্বকীয় পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে। নেহেরুর মতে সেই সময় ভারতের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যেও তার অবস্থান সুদৃঢ় করার এবং তার পররাষ্ট্রনীতির সমস্ত দিক খোলা। একটি সুবিশাল সুদীর্ঘ ইতিহাসের উত্তরাধিকারী হয়ে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিকার রয়েছে নিজের বক্তব্যকে স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার। তার অতিকায় উপমহাদেশীয় সুলভ অবস্থানের কারণে এটা নির্ধারিত হয়েছিল যে ভারত আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর' রাষ্ট্র হতে পারে না। তবে নির্জোটতা কখনোই নিরপেক্ষতার আরেক নাম নয়—অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সাথে মতানৈক্যের নীতি যা উনবিংশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করেছিল। উল্টোদিকে নির্জোটতা নীতি মেরুকরণীয় বিশ্বব্যবস্থার চাপের থেকে মুক্ত করে একটি জাতি-রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। নেহেরুর কথায়—'নির্জোটতা মানে হল নিজেকে (পড়তে হবে জাতি-রাষ্ট্র) কোনো সামরিক জোটের মধ্যে আবদ্ধ না করা বা কোনো রাষ্ট্রের সাথে নিজেকে যুক্ত না করা। এই নীতির লক্ষ্য হল সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যদিও কখনো কখনো এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রভাবিত করেই সিদ্ধান্তকে এবং সব দেশের সাথে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক তৈরি করা।' নির্জোট নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মতাদর্শগতভাবে স্বাধীন থাকার নেহেরুর বাসনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্ব ব্যবস্থায় যা দুটি মতাদর্শগতভাবে দ্বান্দ্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত—তা বোঝা যায় ১৯৫৫ সালে ভারতের পার্লামেন্টে (সংসদে) নেহেরুর একটি বক্তব্যের মাধ্যমে—'বিশ্ব এবং বিশ্বরাজনীতি মনে করা হচ্ছে বিভাজিত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ... আমরা আমাদের পথ বেছেছি এবং তা বদলাতে পারি নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী, কারও নির্দেশ বা অঙ্গুলিহেলনে নয় ... আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী এই কমিউনিজম্ ও কমিউনিজ্‌মের বিরোধীতার মধ্যে জারি থাকা হিংসাত্বক বিরোধের সাথে মেলে না।'

নির্জোট নীতি গ্রহণের তাৎক্ষণিক প্রেক্ষাপট হল বিশ্বের বিভাজন দুটি পরস্পর বিরোধী ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমি রাষ্ট্রের দ্বারা, অন্যটি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাধান্যকারী ভূমিকায় পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়কালে। নেহেরু মনে করেছিলেন যে উন্নয়ন এবং সেবামূলক কাজপ্রদান, দারিদ্রতা ও অনগ্রসরতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য লক্ষ্য তৈরি করাটাই যে কোনো সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য। যদি কোনো সামরিক গোষ্ঠীর সাথে এই ধরনের রাষ্ট্র জড়িয়ে যায় তাহলে সে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে তার নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ্যচ্যুত হবে—দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও ক্ষুধার সাথে লড়াইয়ের লক্ষ্য থেকে চ্যুত হবে। তাই নেহেরু সমস্ত রকমের জোটভিত্তিক সংগঠনের বিশেষ করে সামরিক জোটের বিরুদ্ধে ছিলেন যেমন বাগদাদ চুক্তি, মানিলা চুক্তি, SEATO ও CENTO প্রভৃতি গোষ্ঠী যেগুলিকে তিনি ভারতের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

তবে যেরকম আগেই বলা হয়েছে, এই ধরনের সামরিক চুক্তির বাইরে থাকা মানেই নিরপেক্ষতা বা অনিচ্ছা ব্যক্ত করা নয়—এর মানে হলো প্রতিটি বিষয়কে তার নিজগুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা ও স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করা কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক ও তার পরে যেটা সঠিক সেই বিষয়ের পক্ষে থাকা। নির্জোট নীতি যে কতটা ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সাথে জড়িত তা ১৯৬০ সালে নেহেরুর কথা থেকেই বোঝা যায়—'যে কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি একে অন্যকে প্রভাবিত করে এবং তার জন্যও সামগ্রিকভাবে এই দুই নীতি একই দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হওয়া ভালো যাতে এই নীতিগুলো সংযুক্ত থাকে। মোটামুটি ভাবে ভারতে এই সংযুক্তিকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।' ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বিশ্বের যুযুধান দুই বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের নেতৃত্বের জোটে অংশগ্রহণ করাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শের পরিপন্থী ভাবতো আর গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী হয়ে নেহেরু এই ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। একই সময় নির্জোটনীতি ভারতের জাতি রাষ্ট্র গঠনে বড় ভূমিকা নিয়েছে দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে স্থিতিশীল ও একসূত্রে বেঁধে রেখেছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াতেও সাহায্য করেছে। তবে নেহেরু এই নির্জোট নীতি প্রণয়নে কোনো ব্যক্তিগত সাফল্য নিতে চাননি। তার কথায়—'এটা একেবারেই ভ্রান্ত যদি ভারতের নীতিকে নেহেরুর নীতি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এটা ভ্রান্ত তার কারণ আমি যেটা করেছি তা হলো শুধুমাত্র নীতির সোচ্চার উপস্থিতি তৈরি করা। এই নীতি আমি তৈরি করিনি। এই নীতি নিহিত আছে ভারতের পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে, ভারতের অতীত চিন্তায় ভারতের সামগ্রিক মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে গড়ে ওঠা মানসিক কাঠিন্য, এবং বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির ওপরে। আমার ভূমিকা এই নীতিগ্রহণে থেকেছে কারণ ইতিহাসের পর্যায়ক্রমে এই সময়কালে আমি ভারতের পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম।'

পররাষ্ট্রনীতিতে নির্জোটতা ভারতকে সবথেকে সাহায্য করেছিল তার অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করতে। কোনো একটি জোটের সাথে ভারতকে জড়িত না করার ফলে, ভারত এই নীতির জন্যও যুযুধান দুই জোটের যে কোনো রাষ্ট্রের সাথেই তার নিজের সুবিধা মতো অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে। ভারত পশ্চিমি দেশগুলি থেকে কৃৎকৌশল (Technology) এবং ধনসম্পদ, যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ ও খাদ্যবস্তু আমদানি করত। একইরকম ভাবে সামরিক অস্ত্র আমদানির জন্য ভারত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করত কোনো দেশের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করেই এবং যেহেতু সামরিক অস্ত্রসরবরাহকারী দেশগুলি জানত ভারতের কাছে অনেক বিকল্প রয়েছে এই ভারতের সাথে তারা দরদাম করত এবং ভারত সবথেকে তুলনামূলকভাবে সস্তা লেন দেন করতে পারত। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল যে যদিও নির্জোট নীতি কোনো জোটবদ্ধতার বিরোধী কিন্তু এই নীতির নিজস্বতার জন্যই নির্জোট আন্দোলন মঞ্চ (NAM) তৈরি হয় যা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সঙ্গতি তৈরি করে এবং প্রকৃতিগত ভাবে ভারতকেই এই প্রক্রিয়ার নেতা হিসাবে দেখা যায়। এই উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে NAM সেই নীতির প্রতিফলন যা তাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা প্রদান করে এবং একদিকে দুটি বৃহৎ সামরিক জোটের হাত থেকে রক্ষা করে ও অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ স্তরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দৃষ্টি নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে। ভারত ১৯৫০ থেকে ১৯৯০ অবধি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও NAM এর প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করার ফলে তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বদানের একটা সত্যি স্বাভাবিক ভূমিকা পালন করে।

NAM এর প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিবর্তন ১৯৭০ সাল থেকে লক্ষণীয়। এই সময়ে ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠে কিভাবে কৃৎকৌশলের প্রগতি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুরক্ষিত করা যায়

এবং দক্ষিণপন্থী শক্তির সাথে মৈত্রী স্থাপনের মাধ্যমে প্রগতিবাদী রাজনৈতিক ভিত্তি সুরক্ষিত করা যায়। NAM এর মঞ্চ এবং ভারতের NAM এর প্রাথমিক নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ভারতকে সুযোগ করে দিয়েছিল তার অঞ্চলের বাইরে বিশ্বজুড়ে তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এবং নিজস্ব প্রগতির জন্য রাজনৈতিক সমর্থন বিশ্ব রাজনৈতিক পরিসরে আদায় করার, কিন্তু NAM এর সামগ্রিকতা অর্থনৈতিক ও কৃৎকৌশলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সীমিত প্রভাব রেখেছে। ১৯৭০ এর আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা, ১৯৮০-র পর্যায়ক্রমিক উদারীকরণ এবং ১৯৯০ এর মুক্ত অর্থনীতির আবির্ভাব ভারতে এক নতুন উচ্চবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে যারা নতুন যোগাযোগের পন্থা খুঁজছে ত্রিশক্তির সাথে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপান) এবং সহযোগিতা আদায় করছে এদের থেকে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক স্ববিরোধীতা নিরসনের জন্য। এই পরিবর্তন NAM এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারতের প্রভাবের পরিবর্তন থেকে বোঝা যায়, বিশেষ করে ভারতের সাবেকী ও স্থিতিশীল ভূমিকার মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে—১৯৯৭ সালে কিউবা-র প্রস্তাব—NAM কে তার প্রাকৃতিক মিত্র ধারণা সমাজতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা—ভারত বিরোধিতা করে, ১৯৮৯ সালে ভারত G-15 গোষ্ঠী গঠন করে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, ১৯৯২ সালে ভারত খারিজ করে দেয় মায়ানমারের প্রস্তাব পশ্চিমি দেশগুলিতে বয়কট/একঘরে করার আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রক্রিয়ায়, ২০০৭ সালে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমাণবিক চুক্তি করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যৌথ বিবৃতি পেশ করে NAM এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, G-20 গোষ্ঠীতে ভারত অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় G-20 গোষ্ঠীর গৃহীত পদক্ষেপকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রত্যেক দেশের লক্ষ্য থাকে স্বাধীন ও মুক্ত থাকার এবং নির্জোটনীতি হচ্ছে এমন একটা পন্থা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যার মাধ্যমে ভারত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়কালে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছিল। এই সময়কালে যখনই কোনো সরকার কোনো রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তখনি নির্জোট নীতি বাধ্য করেছে পররাষ্ট্রনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে অন্য রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে (১৯৭১ সালের ভারত রুশ মৈত্রী চুক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে ১৯৭৭ সালে ভারত-মার্কিন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো)। ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর সময়ে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নিবিড়তাকে সমালোচনা করা হয় ভারতের নির্জোট নীতির ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তনে নির্জোটতার ভূমিকা ছিল বিচারকের (referee) যাতে পররাষ্ট্রনীতির কোনো বিচ্যুতিকে নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলবদ্ধ করা।

৩.৬ ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে নির্জোটতা ঃ একটি সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ

১৯৯০ সালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান নির্জোট আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল কারণ NAM এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি কৌশল ও প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে NAM-এর ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ নিয়ে সন্দিহান ছিল। নির্জোট আন্দোলনের সমালোচকেরা উন্মুক্তভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন করেছিল ও তার সাথে মিত্রতা করেছিল। নেহেরুকে সমালোচনা করে বলা হয় যে তিনি বেশি ভাববাদী হয়ে পড়ছিলেন বাস্তবতার থেকে দূরে গিয়ে এবং ভারতের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় বিশেষ তাৎক্ষণিকতা দেখাতে পারেননি। অনেকেই মনে করেন যে ঠাণ্ডা লড়াই নির্জীব/মৃত প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের সমালোচনার প্রেক্ষিতে স্মরণ করা যেতে পারে যে NAM একই সাথে একটি কৌশল ও একটি আন্দোলন। যদি বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি কৌশলের ক্ষেত্রে এটি

অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয় একমেরু পৃথিবীর সূচনার পর থেকে তবুও একটি মানবিক আন্দোলন হিসাবে বিশ্বে ন্যায়, সাম্য, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে NAM আরও খুব বেশি করে প্রাসঙ্গিক বিশেষ করে ২০০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের পর থেকে যার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় ধনতন্ত্রের শেষ লগ্নের শীথিলতা। অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বর্তমান মার্কিনি আধিপত্য বিস্তারকারী বিশ্বে NAM ও তার কাজকর্মের প্রাসঙ্গিকতা হারানোর কোনো কারণ নেই। এই বর্তমান বিশ্বেও NAM গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বিশেষ করে তিনটি ক্ষেত্রে—প্রথমত, এটি একটি আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করতে পারে তৃতীয় বিশ্বের পক্ষে পশ্চিমি ক্ষমতাশালী প্রভাবের বিরুদ্ধে একটি প্রাধান বিরোধী প্রতিবাদী মঞ্চ হিসাবে। দ্বিতীয়ত, NAM তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির যে আন্দোলন বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের কাঠামোর পূণর্বিন্যাসের লক্ষ্যে রয়েছে তাকে শক্তিশালী করতে পারে G-77-এর মতো তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য সংগঠনের সাথে। তৃতীয়ত, NAM উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাথে। চতুর্থত, NAM উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভিতরে ও বাইরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গণতান্ত্রিকিকরণের জন্য বিশ্বজনীন আন্দোলন সংগঠিত করতে যাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, 'নির্জোট আন্দোলন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি সুদূরপ্রসারী পন্থা হিসাবে থাকবে ভারতের জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য তৃতীয় বিশ্বের সামগ্রিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য।

বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের মতো নির্জোটপন্থা অবলম্বন করা দেশের কাজ অনেক যা নিম্নলিখিত ভাবে বলা যেতে পারে—(ক) নির্জোট আন্দোলন রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার সঠিক অর্থ তাকে ব্যবহারিক করে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সার্বভৌমিকতার গুরুত্বের কথা প্রচার করবে (খ) সার্বিক এবং অবিরাম আন্দোলন গড়ে তুলবে প্রাধান্য, শোষণ, যুদ্ধ, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, নারী দমনের বিরুদ্ধে (গ) আন্দোলন করবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভারসাম্য ভিত্তিক কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে (ঘ) এক নতুন ধরনের বিপ্লবের কথা প্রচার করবে—সামাজিক প্রান্তিক মানুষরা যাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুযোগসুবিধাগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান বিশ্বে NAM এর ভূমিকা ও কৌশল নিয়ে প্রস্তাবনার সাম্প্রতিক পরিবর্তনের আলোয় বলা যায় যে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরোধিতা করে যেমন কুয়ালালামপুর সম্মেলনে NAM করেছিল যাতে NAM-এর দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল।

এই নতুন শতাব্দীতে খুব অসুবিধাজনক হবে না নতুন দিল্লির একটি আকাঙ্ক্ষাকে বুঝাতে—বিশ্ব রাজনীতিতে সর্বোচ্চ প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জায়গা করে নিতে—একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী দেশের তকমা লাভের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই নেহেরুর সময়কালের বিশ্ব নেতৃত্বের শিরোপা পাওয়ার মূল্যবোধ ভিত্তিক আকাঙ্খার থেকে আলাদা যা ঠাণ্ডা যুদ্ধকাল সময়ে দেখা গেছে। বর্তমান সময় হল বহুপাক্ষিক বিশ্বের (multiplies world) এবং ভারতীয় মহাসাগরের সন্নিটস্থ প্রতিবেশী অঞ্চলে চিত্রটা চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিমেরু ভারসাম্যের। এই পরিস্থিতিকে অনেকে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'নতুন ঠাণ্ডা লড়াই' হিসাবে দেখছে যার পরিপ্রেক্ষিতে 'নতুন NAM' এর প্রয়োজন আছে এবং ভারতের নয়া নির্জোট নীতি তৈরির সময় এসেছে। ভারত তার সদর্থক নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে নির্জোটতার মাধ্যমে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিশ্ব জুড়ে অন্যান্য দেশ ও সংগঠনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে।

নির্জোটতা ও তৃতীয় বিশ্বের নেতৃত্বের মতো মূল্যবোধের উচ্চস্থান থেকে ভারতকে সরে যেতে হচ্ছে ঠাণ্ডা

লড়াই উত্তর বিশ্বে বিকল্প নীতির সন্ধানে যেমন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদের পুনর্গঠনের দাবী। নিজ ক্ষমতায় দীপ্ত ভারতের উন্মেষ যার ফলে যে সার্বজনীনতার পরিবর্তে নিজস্বাধীনতার নীতি গ্রহণ করে এবং ২০০৪ সালে নিজের জায়গা করে নেয় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন গোষ্ঠীতে যাকে 'Five Interested Parties' বলা হয়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত। ভারতের নতুন বিশ্ব দর্শননীতি হল 'সহযোগিতাবাদী বহুত্ববাদ' যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারত সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে পরিবেশ পরিবর্তনের মতো বিষয় এবং G-20-র মতো গোষ্ঠীতে নতুন কূটনীতি যেমন অর্থনৈতিক কূটনীতি উপস্থাপিত করে। তবে ডেভিড মেলোন মনে করেন যে এই ধরনের বহুপাক্ষিক গোষ্ঠীগুলিতে ভারতের 'আলোচনা টেবিলের আচরণ' নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির টানাপোড়েনে। অন্যান্য দেশেও এই ধরনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব থাকে কিন্তু ভারতের বিশেষত্ব হচ্ছে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভারত এখনও সুচতুর ভাবে তার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপের প্রভাবকে কাটিয়ে কোনো নির্দিষ্ট লাভজনক সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয়নি। ভারতীয় রাজনীতির একজন বিশ্লেষক হিসাবে মেলানো প্রশ্ন করেন যে 'ভারত কি ধরনের বিশ্ব ক্ষমতা কি লক্ষ্য নিয়ে এবং কাদের সহযোগিতা নিতে চায়?' এবং তিনি এই মতে উপনীত হন যে ১৯৫০-এর সময় যা ভারতের পক্ষে অভাবনীয় ছিল আজ তা হাতের নাগালে যেমন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও পুঁজি কূটনীতির উচ্চমঞ্চে ভারত আজ অবলীলাক্রমে জায়গা পাচ্ছে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অস্থিরতার মধ্যে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা তৈরির প্রেক্ষাপটে ভারত তার বহুপাক্ষিক ও কিছু দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ককে বিষয়ভিত্তিক তাৎক্ষণিক জোটবদ্ধতার মাধ্যমে সাজাবে আগামী দিনে। ভারতের বিশ্ব রাজনীতিতে পুনরুত্থান বিশেষ করে যদি সে তার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপকে সঠিকভাবে সামলাতে পারে তবে তা হবে একবিংশ শতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি অন্যতম যুগান্তকারী পরিবর্তন।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতির উপাদান হিসাবে নির্জোট আন্দোলনের সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ কখনোই নির্জোটতাকে পেছনে ফেলে দিতে পারেনা বিগত দিনের একটি নীতি হিসাবে যা শুধুমাত্র দ্বিমেরু পৃথিবীতে প্রযোজ্য। নির্জোটনীতিকে বুঝতে হবে একটি সদর্থক ও কৌশলী পদক্ষেপ হিসাবে যার মাধ্যমে যোগাযোগ বৃদ্ধি সম্ভব কোনো জোটে না জড়িয়ে (Connectivity without entanglement)। বর্তমান ভারতের নীতি প্রণয়নকারীদের প্রাথমিক দায়িত্ব নির্জোটতার নতুন অর্থকে প্রচার করা ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এই নীতি নিয়ে মতৈক্য (domestic consensus) তৈরি করা যেমন নেহেরুর সময়কালে ছিল।

৩.৭ সারাংশ

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ভারতের সমৃদ্ধ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদানের মধ্যে নিহিত যেমন সবাইকে নিয়ে চলা, সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদ। এই উপাদানগুলি পরাষ্ট্রনীতির ভিত্তিপ্রস্তর বা নীতিগুলির উৎস। জওহরলাল নেহেরু দ্বারা রূপায়িত এই নীতিগুলো সময় ও কালের পরীক্ষায় সিক্ত। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধিতা, (এখন সেটা নয়া-উপনিবেশবাদ বিরোধিতা) নিরস্ত্রীকরণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (বর্তমানের সন্ত্রাসবাদ অধ্যুষিত বিশ্বে আরোই প্রাসঙ্গিক) এবং নির্জোটতা—এই নীতিগুলো এমন যে যেকোনো দেশ প্রতিধ্বনি করতে পারে বর্তমানের হিংসাত্মক, বিভাজিত, বৈষম্যমূলক, সামরিক ঘাঁটি পরিচালিত বিশ্বে। ভারতের নির্জোটতা ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি

নতুন করে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে বর্তমান জটিল সদ্য গড়ে ওঠা বহুপাক্ষিক ৯/১১ পরবর্তী বিশ্বে এবং বিশ্বক্ষমতাশালী দেশ হিসাবে ভারতের উত্থান সম্ভবপর হবে যখন ভারত সুদীর্ঘ সুদূরপ্রসারী সুচিন্তিত লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে নির্জোট পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করবে।

৩.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ প্রশ্নসমূহ:

ক) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল নীতিগুলি বর্ণনা করুন। এই নীতিগুলো কি বর্তমান বিশ্বেও প্রযোজ্য? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

খ) ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর পৃথিবীর পরিস্থিতির ওপর বিশেষ আলোকপাত করে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্জোট নীতির ওপর সমালোচনাধর্মী বিশ্লেষণ করুন।

মাঝারি প্রশ্নসমূহ:

ক) পররাষ্ট্রনীতির একটি কৌশল ও একটি আন্দোলন হিসাবে নির্জোট নীতির পার্থক্য করুন।

খ) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির নীতিসমূহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নসমূহ:

ক) ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন সংক্ষেপে লিখুন।

খ) ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে নির্জোট নীতির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে দুটি যুক্তি দিন।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Sam Mayo & Paris Yeros (ed.) *Reclaiming the Nation: The Return of the National Question in Africa, Asia and Latin America,* Photo Press, London, 2011.

David. M. Malone, *Does the Elephant Dance: Contemporary Indian Foreign Policy,* OUP, New Delhi, 2011.

Aneek Chatterjee, *Wrold Poltics,* Pearson, New Delhi, 2012.

Mohamad Badrul Alam, Basic Determinants of India's Forign Policy and Bilateral Relations in Rumki Basu (ed) International Poltics: Concepts, Theories and Issues, Sage, New Delhi,2012

Partha Pratim Basu, India's Foreign Policy. Foundation Principles, in Politics, Departmental Journal of Asutosh College, 2009.

একক ৪ ❐ ভারতের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্ক

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি—প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক
৪.৪ ভারতের পরাষ্ট্রনীতি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক
৪.৫ ভারতের পরাষ্ট্রনীতি—ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ।
৪.৬ সারাংশ
৪.৭ প্রশ্নমালা
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্যগুলি হল—

- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির যোগাযোগ প্রক্রিয়া ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করা।
- ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।
- ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান রাশিয়ার বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

৪.২ ভূমিকা

একটি দেশের ক্রিয়াশীল পররাষ্ট্রনীতি বলতে বোঝায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংগঠনের সাথে সেই দেশের নির্দিষ্ট যোগাযোগ স্থাপনা। এই ধরনের যোগাযোগ স্থাপনা দুইধরনের হতে পারে—দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক (Bilateral ও Multilateral)। এই দুইধরনের যোগাযোগ কখনও কখনও একযোগে ও একসাথে চলে এবং একটি ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি অন্য ক্ষেত্রের নিবিড়তার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভারত ও চীন দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সুসম্পর্ক স্থাপনা করতে না পারলে বহুক্ষমতাকেন্দ্রিক জোটবদ্ধ সংগঠন যেমন BRICS ও SCO-তে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে এই দুই দেশ কাজ করে। এরকম ভাবেই ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক

বিরোধিতাকে প্রশমন করার চেষ্টা হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা SAARC সম্মেলনের সময়ে আলাদা ভাবে আলোচনার বসে। যখন নিজ অঞ্চলের মধ্যে একটি দেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে প্রতিবেশী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক প্রক্রিয়া বলা হয়। ভারত যে অঞ্চলে অবস্থিত তা হল দক্ষিণ এশিয়া যেখানে আটটি দেশ আছে যারা আঞ্চলিক সংগঠন SAARC-এর সদস্য। তবে প্রতিবেশী দেশগুলিতে চিনের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে কিছুটা জোর করেই ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বিশ্লষণ করা হয়। একইসাথে একটি দেশের ক্রিয়াশীল পররাষ্ট্রনীতি বলেতে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলির সাথে তার সম্পর্ককেও বোঝায়। ভারতবর্ষকে বর্তমানে বিশ্বে ক্ষমতার অলিন্দে একটি বৈধ 'উদীত ক্ষমতা' হিসাবে দেখা হয় (মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা ২০১০ সালের ভারতের সংসদের যৌথ অধিবেশনে এভাবেই ভারতকে অভিহিত করেন)। বর্তমানে ভারত যোগাযোগ স্থাপন করছে বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনগুলির সাথে যাতে মনে করা যেতে পারে যে ভারত হল একবিংশ শতকের একটি 'বাণিজ্যিক রাষ্ট্র' (Richard Rosecrance তার বইয়ের নাম রেখেছিলেন 'The Trading State')। এই সমস্ত যোগাযোগ ক্রিয়ার মাধ্যমে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ভারতের জাতীয় স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে এই যোগাযোগ-স্থাপনের মধ্যে দিয়ে।

৪.৩ ভারতের পরাষ্ট্রনীতি—প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক

দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারতের বিশালকায় উপস্থিতি ভারতকে ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় (Core) দেশ হিসাবে উপস্থিত করে আর ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে প্রান্তিক (Periphery) দেশ হিসাবে উপস্থিত করে। ভারতের এই কেন্দ্রীয়তার সাথে অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির অসাম্যমূলক প্রকারভেদ করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি যেমন নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির দ্বিপাক্ষিক নীতি তৈরির ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে আস্থা, বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব তৈরি করার উপর। ১৯৯৬ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে ভারত সুদূরপ্রসারী ভাবে আঞ্চলিক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দেয়। ভারতের প্রতিবেশী দ্বিপাক্ষিক নীতির এই পরিবর্তনের প্রথম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ কারণ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গুজরাল মেনে নিয়েছিলেন যে ভারতের আঞ্চলিক নীতির সবথেকে বড় অসুবিধার জায়গা হল বাংলাদেশ।

ভারত ও বাংলাদেশ পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল তাদের ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য। বহুদিন ধরেই বাংলাদেশ মনে করেছিল যে ভারতের তুলনায় সে হীনবল ও ভারতীয় আগ্রাসনের একটা ভয় ছিল কারণ, বিশালকায় ভারত তার বেশিরভাগ সীমানা অঞ্চলবর্তী জায়গায় উপস্থিত। বাংলাদেশের এই দুশ্চিন্তা গ্রহণযোগ্য কারণ ভারতীয় কৌশল প্রণেতারা সবসময় বাংলাদেশের প্রাধান্যর কথা বলেন ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের যোগসূত্রকারী সড়ক-এর ক্ষেত্রে। তাই ভারতের কৌশলগত চিন্তায় বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রহিসাবে চিহ্নিত বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব ভারতের কাছে আরো বৃদ্ধি পায় যখন ভারত 'পূবে-তাকাও' নীতি (Look East) প্রণয়ন করে ASEAN অঞ্চলের সাথে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক বিস্তারের লক্ষ্যে। বাংলাদেশের উৎপত্তির সময় থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অম্ল-মধুর সম্পর্ক হিসাবে দেখা যায় যেখানে দুই দেশের সরকার পরিবর্তন সম্পর্কের ধারাকেও বদলে দেয়। তাই ক্ষমতাসীন সরকারের মানসিকতা একটি

বড় প্রভাবকারী বিষয়। অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রভাবকারী বিষয়গুলি হল জাতীয়তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একে অন্যের প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাত্রা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির, গঙ্গা ও তিস্তা নদীর জলবন্টন, ছিটমহল হস্তান্তর সীমানা অঞ্চলে (তিন বিঘা চরের সমস্যা) ইত্যাদি বিষয়গুলি। বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতের সহযোগিতা চাকমা উপজাতির বিদ্রোহ ঠেকাতে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বৃদ্ধি করতে পারে যেরকম ২০০৮ সালে কোলকাতা-ঢাকা রেল চলাচল করেছিল। বর্তমান শেখ হাসিনা ও মোদী সরকারের আমলে দু'দেশই কৌশলী ভূ-রাজনীতি তৈরি করছে যেখানে তারা একে ওপরকে ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা বন্ধ করে প্রতিবেশী হিসাবে দেখবে এবং ছোটোখাটো সীমানা সমস্যা যেমন ছিটমহল হস্তান্তর এবং ভূ-সীমানা ও নদী সীমানাকে চিহ্নিত করবে আর জটিল সীমান্ত সমস্যা যেমন জলবন্টন ও অনুপ্রবেশ আলোচনার মাধ্যমে অনেকাংশে মিটবে বলে মনে করা হয়।

১৯৫০ সালের ভারত-নেপাল মৈত্রী চুক্তি (যা ২০০৬ সালে পুনর্নবীকরণ করা হয়) দ্বিপাক্ষিক ঐতিহাসিক সম্পর্কের কাঠামো তৈরি করেছে। ভারত ও নেপাল সংস্কৃতি এবং ধর্মের দ্বারা একত্রিত হলেও ইতিহাস ও ভূগোল তাদের আলাদা করে রেখেছে, নেপাল একটি স্থলবেষ্টিত দেশ (Land locked country) এবং বহুকাল ধরে রাজাদের শাসনে ছিল। ১৯৫১ সালে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনে যার মাধ্যমে রাজাদের শাসনের অবসান হয় শুরু হওয়ার পর ভারত-নেপাল সম্পর্ক উন্নত হতে শুরু করে। ১৯৯৬ সালে ভারত Mahakali River water চুক্তি করে নেপালের সাথে বিভিন্ন বাঁধ ও ব্রিজ তৈরির লক্ষ্যে যাতে দ্বিপাক্ষিক স্তরে জিনিসপত্র ও লোকজন চলাচল করতে পারে এবং নেপাল যাতে বাংলাদেশের চিটাগাঁও বন্দর থেকে বাণিজ্য করার জন্য দ্রব্যসামগ্রী আদানপ্রদান করতে পারে। কালাপানি সংক্রান্ত সমস্যা, ভারত-নেপাল-চিন-এর সীমানা অঞ্চলের ছিটমহল এবং অন্যান্য ভারত-নেপাল সমসা মেটাতে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নেপাল সংক্রান্ত ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হল—অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য গঠিত যৌথ কমিশনের কাজ পর্যালোচনা করা, সৌর-বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র নেপালে তৈরি করা, নেপালে ভারতীয় বংশদ্ভূত নাগরিকদের সুরক্ষা, বন্যার জলের অসুবিধা ঠেকাতে যৌথ কমিটি গঠন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, বিদ্যুৎ, সুরক্ষা, সীমানা পরিচালন বিষয়গুলি। ভারত তার বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে স্বাধীন মুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরিতে নেপালের উদগ্রীবতাকে সবসময় সমর্থন করে এবং সম্প্রতি ১৭ বছর পর কোন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর (নরেন্দ্র মোদী) নেপাল যাত্রার মাধ্যমে নেপালীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি হয়েছে।

ভারত-ভূটন সম্পর্ক এই অঞ্চলের অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থেকে তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ। ১৯৪৯ সালের ভারত-ভূটান চুক্তির অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, এটা নির্ধারিত হয় যে ভূটান তার বৈদেশিক সম্পর্ক বা নীতি তৈরির ক্ষেত্রে ভারতের সাথে আলোচনা করবে। তবে ২০০৭ সালের ভারত-ভূটান চুক্তি নবীকরণের মাধ্যমে ভূটান তার বৈদেশিক ও সামরিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ২০০৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার ভুটান সফরের সময় অঙ্গীকার করেন যে ভারত এই হিমালয় পাদদেশে অবস্থানকারী প্রতিবেশীর পাশে সমর্থন ও স্থায়িত্বের কারণ হয়ে সবসময় থাকবে। প্রায় এক দশক ধরে ভারতের উত্তর-পূর্বের জঙ্গিরা ভূটানে আশ্রয় গ্রহণ করছে এবং ভারতের অবিরাম অনুনয়ের পরেও ভারত-ভূটান যৌথ সামরিক অভিযান এখনও হয়ে ওঠেনি। ভারত ভূটানের সর্ববৃহৎ অনুদানকারী দেশ কারণ ভূটানের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ভারত ৬০% শতাংশ অনুদান দিচ্ছে এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বাৎসরিক ব্যয়ের ২০% শতাংশ ভূটানের জন্যও বরাদ্দ থাকে। ভারত ভুটানের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক দেশ এবং ১৯৭২ সালের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি

অনুযায়ী ভূটান ভারতের সাথে মুক্ত বাণিজ্যিক লেনদেন করতে পারে। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তার প্রথম বিদেশ সফরের স্থান ভুটান করায় ভূটনের মধ্যে আস্থা তৈরি হয়েছে যার ফলে অগামীদিনে জলসম্পদ সুরক্ষায় ও পরিবেশ রক্ষায় আন্ত-সরকার সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

শ্রীলঙ্কা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৮ সালে। সে সময় থেকেই সেখানে গৃহযুদ্ধ চলছে সংখাগরিষ্ঠ সিন্হলা প্রজাতির মানুষ ও সংখ্যালঘু তামিলদের মধ্যে যা চরম আকার নেয় ১৯৮৩ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার ও LTTE (Liberation Tigers of Tamil Elam) গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের মাধ্যমে যার ফলে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশে তামিলরা বড় সংখ্যায় অনুপ্রবেশ করে। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী ও জয়াবর্ধনে ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি সম্পাদন করে যার মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের প্রশমন ঘটাতে ভারত সরকারি সাহায্য করবে এবং সেই অঙ্গীকার অনুসারেই ভারতীয় শান্তি রক্ষা বাহিনীকে (IPKE) ১৯৮৮ সালে পাঠানো হয় যার মাধ্যমে ভারত প্রভূত সমালোচিত হয় সিন্হলা ও তামিল উভয় গোষ্ঠীর কাছেই। তাই ২০০৮ সালে যখন শ্রীলঙ্কা সরকার ও LTTE-র মধ্যে সংঘর্ষ চলছে তখন ভারত এই সংঘর্ষে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বিরত থেকেছে। এরই মধ্যে ভারত শ্রীলঙ্কার সাথে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে ২০০০ সালে এবং শ্রীলঙ্কার উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য ভারত পঞ্চম বৃহৎ বাজার হিসাবে দেখা গেছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কা একইসাথে বিভিন্ন বহুক্ষমতাকেন্দ্রিক জোটের সদস্য যেমন SAARC ও BIMSTEC। ভারতের শ্রীলঙ্কার প্রতি পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হল প্রভাকরণ উত্তর শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মানবিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য অনুদান দেওয়া ও ভারত-শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা।

১৯৪৯ সালের ৮ আগস্ট সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কের কাঠামো প্রস্তুত করে যার ভিত্তি ছিল 'লাভজনক দ্বিপাক্ষিকতা' (beneficial bilateralism) যার মাধ্যমে দুটি দেশই উভয়ের উদ্বেগ ও সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তিত থাকবে এবং উভয়ের সুরক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা প্রশমনে সাহায্য করবে। এই দর্শনের প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৭৬ সালে যখন দুই দেশই তাদের মধ্যে জলপথ সীমানা নির্ধারণ করে কোনো দ্বিপাক্ষিক অশান্তি ছাড়াই। মালদ্বীপ 'স্থলবন্দী' (land loked) দেশ এবং যথেষ্ট সামরিক শক্তি নেই সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার। বহু বছর ধরে ভারত সবরকম সহায়তা প্রদান করেছে মালদ্বীপকে এবং বিশেষ করে পরিকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সহযোগিতার বহু ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয় ১৯৯০ সালের প্রথম ভারত-মালদ্বীপ যৌথ কমিশনের বৈঠকে যেমন পরিবেশ দূষণ বন্ধ করতে গ্রীনহাউস গ্যাসের নিষ্ক্রমণ কমাতে, মালদ্বীপের সরকারি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে তারা তাদের দেশের বিদেশমন্ত্রক পরিচালনা করতে পারে এবং ভারতের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক তথ্য যাতে মালদ্বীপ পায়। ভারতের মালদ্বীপ নীতির লক্ষ্য হল বর্তমান দ্বিপাক্ষিক সৌহার্দ্য সম্পর্ককে আরও উন্নত করা সরকারি পর্যায়ের যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে।

স্বাধীনতার সময়কাল থেকে চূড়ান্ত অনাস্থা ও রক্তক্ষয়ী হিংসার বাতাবরণ ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। এই অঞ্চলে বিগত ৬০ বছর ধরে এই সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যুদ্ধ ও হিংসার এক অদ্ভুত আবহাওয়ার। দ্বিপাক্ষিক এই বৈরীতাকে বারেবারে জিইয়ে রেখেছে দুদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং ১৯৯৮ সালের পর থেকে এই বৈরীতায় একটি পারমাণবিক মাত্রা যোগ হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেও দু'দেশই নিজেদের মধ্যে আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যৌথভাবে (Confidence Building Measures-BMS) সামরিক ও অসামরিক স্তরে। ১৯৫৬ সালে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয় কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে। ১৯৭১

সালে ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে মুক্তি সংক্রান্ত যুদ্ধে। কাশ্মীর নিয়ে যৌথ অক্ষরেখা সীমানা নির্ধারণ করা হয় ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তির সময় যার ফলে যুদ্ধবিরতির সময় দখল করা সীমানাকেই কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণের অক্ষরেখা (Line of Actual Control) বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৯ সালে ভারতকে সম্মুখীন হতে হয় পাকিস্তানের গুপ্তচর বাহিনীর নেতৃত্বে (ISI) কাশ্মীর অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ১৯৯৮ সালে দুদেশের পারমাণবিক উৎক্ষেপণ পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে। ১৯৯৯ সালে ভারতের NDA সরকার প্রধানমন্ত্রী বাজপায়ীর নেতৃত্বে অমৃতসর-লাহোর বাসা যাত্রা সুচনার মাধ্যমে তবে এই 'বাস-কূটনীতির' অব্যবহিত পরেই ১৯৯৯ সালে পরবর্তী সময়ে কাশ্মীর বিধানসভা ও ভারতীয় সংসদভবনে সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী হুরিয়েত কনফারেন্সের নরমপন্থী নেতা আব্দুল গোনী লোনের খুন, ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার মতো ঘটনাকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতে অস্থিরতা তৈরির পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়। এই অস্থিরতা ভারত-পাক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে অনেকাংশেই ব্যাহত করেছে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর বৈঠক ও ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে আগ্রা বৈঠক ভারত-পাক কূটনৈতিক আলোচনার উল্লেখযোগ্য সম্মেলন বলে চিহ্নিত করা যায়। ভারতের পাকিস্তান নীতি মুক্তমনে প্রণয়ন করা হয়—পাকিস্তানের দিক থেকে সদর্থক ভূমিকাকে প্রশংসা করা হয় আবার নঞর্থক ভূমিকাকে কড়া হাতে মোকাবিলা করা হয়। বর্তমানে ভারতের মোদী সরকার পাকিস্তানকে চরম সাবধানবাণী জানিয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার যদি পাকিস্তান ভারতের অভ্যন্তরে বিচ্ছন্নতাবাদীদের সাথে সম্পর্ক রাখে ও আলেচানায় বসে।

ভারত-পাকিস্তানের উদ্বেগপূর্ণ সম্পর্কের প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হল ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্ক। ঐতিহাসিক ভাবে আফগানিস্তানের সাথে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। তবে ২০০১ সালে ৯/১১-র সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে এবং তৎসহ সন্ত্রাসবাদী আশ্রয়স্থান হিসাবে আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন হামলা আফগানস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই প্রেক্ষিতে আফগানিস্তান ২০০৫ সালের SAARC গোষ্ঠীর ঢাকা সম্মেলনে SAARC এর সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। যার ফলে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে তার সামগ্রিক আঞ্চলিক পরিচিতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে নিবিড় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক দেখা যায় ২০০৫ ও ২০০৬ সালে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ জোরের সাথে ব্যক্ত করেন ভারতের সচেষ্ট ভূমিকা থাকবে আফগানিস্তানের স্থায়িত্ব, প্রতিপত্তি ও সার্বভৌমিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের অর্থনীতির পরিকাঠামো উন্নয়নে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের বিপুল অনুদান স্পষ্ট করে দেয় ভারতীয় নীতির লক্ষ্য—তালিবান পরবর্তী অধ্যায় আফগানিস্তানকে কৌশলে দ্বিপাক্ষিকভাবে জড়িত রাখা যাতে পাকিস্তান আফগানিস্থানকে ভারতের বিরুদ্ধে ভূ-রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করতে না পারে।

ভারত-মায়ানমার সম্পর্ক ইতিহাসে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত কারণ ভারত একটি অন্যতম রাষ্ট্র যে বার্মার স্বাধীনতার পক্ষে ছিল এবং স্বাধীন বার্মার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ১৯৪৮ সালেই। ১৯৪৮-১৯৫২ এই সময়কাল ভারত-মায়ানমার সুসম্পর্ক ছল মূলত নেহরু ও বার্মা নেতা উনু নির্জোট আন্দোলনের অংশীদার হওয়ায়। ১৯৬২-১৯৮৮ সালে বার্মা সামরিক নেতা জেনারেল নি উইন-এর নেতৃত্বে নির্জোট আন্দোলন থেকে সরে আসে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকার (isolationalism) নীতি গ্রহণের ফলে ভারত মায়ানমার সম্পর্ক শিথিল/ ও শীতল হয়ে পড়ে। মায়ানমারের সামরিক শাসনের গণতন্ত্র-বিরোধী পদক্ষেপ এবং ভারতের গণতন্ত্রের পক্ষে পদক্ষেপ যেমন গণতন্ত্রপন্থী বার্মার নেত্রী আন সান সুকি-কে সম্মান প্রদান করা

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো নিম্নগামী করে তোলে। ভারতের 'পূবে-তাকাও' নীতির প্রেক্ষাপটে ভারতে মায়ানমারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মনোভাব বিভিন্ন বহুক্ষমতাকেন্দ্রিক সংগঠনের মাধ্যমে যেমন BIMSTEC, BCIM এবং Mekong-Ganga Cooperation ও ভারত-মায়ানমার গ্যাস পাইপলাইনের সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নতি হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির উন্নয়ন, মায়ানমারে চিনের প্রভাবকে প্রতিহত করা ও ASEAN দেশগুলির কাছে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়ে ভারত একটি অতি-উদ্যোগী (Pro-active) মায়ানমার নীতি গ্রহণ করেছে। ভারতের সাথে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের ঐতিহাসিক ভাবে নিবড়ি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় তাদের সভ্যতার সাদৃশ্যের কারণে। ১৯৫৪ সালে চিনের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ভারত চিনের একটি অঞ্চল হিসাবে তিব্বতকে মেনে নেয়। এই চুক্তি একইসাথে প্রতিফলিত করে দ্বিপাক্ষিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে—অর্থাৎ সহবস্থানের পাঁচটি নীতির প্রতি দায়বদ্ধতা আর এই সময়ে স্লেগান ছিল—'হিন্দী চিনি ভাই ভাই'। ১৯৫৯ সালে চিন সন্দেহ প্রকাশ করে দ্বিপাক্ষিক সীমানা নিয়ে এবং ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধ হয়। এর সাথে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে চিন ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে এবং ধর্মগুরু দালাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পৃথিবীতে দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক মতপার্থক্য তৈরি করেছিল। ১৯৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর চিন যাত্রা এবং ১৯৯৩ সালে যৌথ বার্তা প্রকাশ ১৯৯৫ সালের গুরুত্বপূর্ণ 'Peace and Tranquillity চুক্তি', ২০০৩ সালে বাজপায়ীর চিন যাত্রার সময় যৌথ ঘোষণা Principles for relations এবং Comprehensive Cooperation নিয়ে, 'A shared vision for the 21st Century of China and India' প্রকাশ—দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক যোগাযোগ ও আস্থা বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর পরিস্থিতিতে ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে স্পর্শকাতর বিষয় হিসাবে যেতে পারে তিব্বত, অরুণাচল প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ, সীমানা লাগোয়া চিনের সামরিক উপস্থিতি Mcmohan Line কে অগ্রাহ্য করে। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত-চিনের বাণিজ্য বিপুলভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধ উত্তর পৃথিবীতে বেড়েছে এবং চিন এখন ভারতে সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক দেশ। তাই ভারতের চিন নীতি হল 'congagement' বা নিয়ন্ত্রিক-যোগাযোগ বিশেষ করে ১৯৯৮ সালের পোখরান পরবর্তী অধ্যায়—রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবে চিনকে মোকাবিলা করা আর একই সাথে অর্থনৈতিকভাবে চিনের সাথে নিবড়ি যোগাযোগ স্থাপন করা।

ডেভিড মেলোনের মতানুসারে বর্তমানে প্রতিবেশী সন্নিহিত অঞ্চলে ভারত একটি চক্রাবৃত ঝামেলার মধ্যে আছে—একদিকে এই অঞ্চল যদি সহযোগী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ না হয় তবে ভারতের পক্ষে আঞ্চলিক ক্ষমতাশালী দেশের বেশি কিছু হওয়া সম্ভব না, আবার যদি ভারত তার অঞ্চলের বাইরে সম্পর্ক স্থাপন না করে তাহলে সে বিশ্বে ক্ষমতাশালী হিসাবে এতটাই চিন্তায় রাখে যে সে পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক মিত্রশক্তি লাভের চেষ্টা করে। ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক নতুন অধ্যায় শুরু হয় যখন ১৯৯০ সালে ভারত মুক্ত অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে, নির্জোট পন্থাকে কম গুরুত্ব প্রদান করে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ককে নতুনভাবে সাজাতে আগ্রহী হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পরে পাকিস্তানের সাথে মার্কিনী হৃদ্যতা কমে আসে। ২০০০ সালে রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টন-এর উপমাহদেশ তথা ভারত সফরের সময় ও পরে রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (জুনিয়রের) সময়কালে ভারত-মার্কিন নিবিড়তা এক অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছায় এবং এর প্রেক্ষাপট ছিল কিছু সার্থের মিলন—বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের উত্থানকে প্রতিহত করা, শক্তি-সম্পদের উৎস খুঁজে বের করা। এই নিবিড়তার মাধ্যমে ভারতের কৌশলী ভূমিকা স্বীকৃত হয় এবং পশ্চিম সীমান্ত দ্বারা প্রভাবিত ভারতের সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে অবস্থানকে মেনে নেয়। অত্যন্ত উন্নত ও শক্তিশালী সামরিক অস্ত্র ও কৃৎকৌশলের আদানপ্রদান এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে গাঢ়

যোগাযোগ এমনকি যৌথ সামরিক মহড়া এই দ্বিপাক্ষিক উন্নত সম্পর্কের ফলশ্রুতি। ২০০৪ সালের Next step in strategic partnership process (NSSP), Open skies Agreement-এর সাফল্যভিত্তিক সমাপন এবং ২০০৫ সালে Civilian Nuclear Deal এর রূপায়ন দু'দেশের আভ্যন্তরীণ বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে—ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে রাজসিক উচ্চতায় নিয়ে যায়। ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ২০০১ সালে ১৩.৪৯ বিলিয়ান ডলার থেকে ২০০৬ সালে ৩১.৯১৭ বিলিয়ন ডলারে। ২০১০ সালে রাষ্ট্রপতি ওবামার ভারত শফরকালে ভারতকে 'সাধারণ মিত্র' (ally) থেকে 'বিকল্পহীন সহযোগী' (indispensible partner) আখ্যা দেওয়া ও ভারতের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যাদের দাবিকে সমর্থন দেওয়া আসলে ৯/১১-র পরবর্তী পৃথিবীতে মার্কিন ক্ষমতার ক্ষয়িষ্ণুতার বার্তার প্রেক্ষিতে ভারতের সাথে সহযোগিতার জন্য মার্কিন তাগিদকে বোঝায়।

ডেভিড মেলোন ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি মাপকাঠির কথা বলেছেন— মতাদর্শ, কৌশল এবং মূল্যবোধ—যার দ্বারা ভারত-মার্কিন সম্পর্ক প্রভাবিত হয়েছে। ১৯৪৭-৬৬-র মতাদর্শগত পার্থক্য, মেলোনের মতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকক্ষেত্রেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কিছুক্ষেত্রে পরিস্থিতিকে গুরুত্ব না দেওয়ার দোষে দুষ্ট। সম্প্রতি ভারত সহনশীলতা দেখাচ্ছে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে বোঝার জন্য এবং পারস্পরিক দ্বিপাক্ষিক বৈরীতা অসন্তোষকে সরিয়ে রেখে সাবেকী সুরক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে ভূ-কৌশলগত পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার কথা মাথায় রেখে। তবে ভারতের নীতির এই পরিবর্তন এখনও এতটা প্রভাব ফেলতে পারেনি যার ফলে আঞ্চলিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি ভারতকে সমীহ বা সম্ভাষণের চোখে দেখবে।

৪.৪ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক

ভারতের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দুটি বিশেষ শক্তিধর রাষ্ট্রের উদ্ভবের সাথে সম্পর্কিত—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত উইনিয়ন। যদিও ভারত এই দুই রাষ্ট্রের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছে সবক্ষেত্রে তার এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। ভারতের সাথে এই দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাহিদার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।

ডেনিস কক্স্ এর ভাষায় বলা যায় যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বেশিরভাগ সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক 'পারস্পরিক বীতশ্রদ্ধ গণতন্ত্র' (estranged democracies) এর মধ্যে সম্পর্ক হিসাবে থেকেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর বিশ্বে এই দুই দেশের সম্পর্ক এতই নিবিড় ও ঘণীভূত হয়েছে সমস্ত ক্ষেত্রেই যে অনেক বিশ্লেষক এই সম্পর্ককে দেখেছে 'প্রাকৃতিক সহযোগী'র (natural allies) মধ্যেকার সম্পর্ক হিসাবে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়ে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মতো একটি অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ককে অনুদান দেয় যাতে সে কমিউনিস্ট আদর্শে প্রভাবিত না হয়ে পড়ে কিন্তু নয়া দিল্লীর নির্জোট পন্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯৬৭-১৯৮৯ এর কৌশলগত

স্ববিরোধিতা (বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যুদ্ধ একদিকে অন্যদিকে অন্যদিকে মার্কিনি আফগানিস্তান যুদ্ধ) এবং ১৯৯০ এর সময় থেকে পারস্পরিক স্বার্থ ভিত্তিক সহযোগিতা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে Pokhran -II এর প্রভাব ও পারস্পরিক মূল্যবোধের সম্বন্ধে সচেতনতা, আঞ্চলিক ক্ষমতা ভারসাম্য তৈরি করা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন দক্ষিণ এশিয়া নীতি তাত্ত্বিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানকে আলাদা করেছে)—এই নতুন বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিনের বিরোধী শক্তি হিসাবে ভারতকে দেখছে যদিও সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন ভারত এখনও করতে পারেনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সম্প্রতি ২০১৪ সালের দেবযানী খোবড়াগরের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। এই মার্কিন নীতি বোঝায় বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত কতটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এবং একই সাথে একমেরু পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণুতা।

ভারতের মার্কিন নীতি হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত কারণবশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি। ২০১৪ সালে মোদী সরকারের গঠনের পর ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে বেশ সমীহ ও গুরুত্ব আদায় করেছে যার প্রতিফলন মোদীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরের জন্য মার্কিন আমন্ত্রণ। সার্বিক ভাবে বলা যায় যে আগামী দিনে এই সম্পর্ক আরও পরিশীলত, বিস্তৃত ও নিবিড় হবে।

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ভালোভাবেই শুরু হয়েছিল। রমেশ ঠাকুরের মতে, অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনীতিগতভাবে সোভিয়েত সহায়তা ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোকে শক্তিশালী করে তুলেছে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। ভারত মনে করতো যে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিসরে হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মতাদর্শগত বিরোধ, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের উত্থানকে ঠেকানো ও উপমহাদেশে—ভারতের আঞ্চলিক ক্ষমতা হিসাবে পরিণত হওয়ার তাগিদ এই দুই দেশকে সুসম্পর্ক রাখতে সাহায্য করেছে। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হেলিকপ্টার প্রদান করেছিল সামরিক কাজে লাগানোর জন্য যেমন MIG-21, ১৯৬৫ সালের ভারত পাক যুদ্ধের সময়ে চিনের সমর্থিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে সমর্থন করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭১ সালে ভারত-সোভিয়েত শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এই সম্পর্ককে অন্য মাত্রা এনে দেয়। ১৯৮০ সালের ব্রেজনেভ নীতি পাঁচটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতার কথা স্পষ্ট করে—পারস্য অঞ্চলের মতো বিদেশী ঘাটিতে সেনা মোতায়ন নয়, শক্তির প্রদর্শন হেতু ভীতি সঞ্চার নয়, নির্জোট দর্শনকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, পারস্পরিক অধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্মান জানানো, সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেনে কোনো বাধা সৃষ্টি না করা। ১৯৮৪ সালে দুদেশের মধ্যে সামরিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছিল। ১৯৮৭-৮৮ অর্থবর্ষে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন রুবেল ছিল এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার বহুমুখী বিস্তার ঘটেছিল কারণ রাষ্ট্র ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। ভারতের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি নীতিগুলি নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতান্ত্রিক ধারণা প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়ার পরে রাশিয়া ঐ ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েল্‌তসিন ভারত সফরে আসেন এবং এই সফরকে শুধুমাত্র ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে তাই শুধু নয়, এর মাধ্যমে মস্কোর বিশ্ববিক্ষ্যা (worldview) ও পররাষ্ট্রসংক্রান্ত বিষয়ে ও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়। ১৯৯৩ সালে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের রাশিয়া সফরের সময় একটি উল্লেখযোগ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—Indo-Russian

Aviation Limited Cooperation। ১৯৯৮ সালে ভারত ও রাশিয়া বৃহৎ পারমাণবিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যার ফলস্বরূপ পরমাণু উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় তামিলনাড়ু প্রদেশের কোদাইকুলাম জেলায় ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে ভারত ও রাশিয়া সম্পাদন করে Strategic Partnership Document বা কৌশল সম্পর্কিত চুক্তি যার মাধ্যমে এই পারস্পরিকতাকে মানা হয় যে কোনো দেশই কোনো চুক্তি, সামরিক গোষ্ঠী ও দেশের সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হবে না যা অন্যদেশের জাতীয় স্বার্থের ও সুরক্ষার পরিপন্থী হয়। ২০০০ সালে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনের ভারত সফরকালে দুদেশের মধ্যেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়। পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে ভারত-রুশ সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল স্থায়িত্বের প্রবাহমানতা। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর রাশিয়া সফরকাল দুদেশের মধ্যে সহমত তৈরি হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়াতে যেমন—সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আফগানিস্তানের বিষয়ে যৌথ ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর (Joint working Group) মাধ্যমে ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ভারতের জাতীয় সুরক্ষা পরিষদ ও রাশিয়ার সুরক্ষা সংসদের করা সমন্বয়কারী গোষ্ঠীর সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক সুরক্ষা, অর্থনৈতিক ও শক্তিবৃদ্ধি সংক্রান্ত গভীর সম্পর্ক স্থাপন হলেও সবথেকে উল্লেখযোগ্য হল রাশিয়ার সমর্থন প্রকাশ ভারতের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সুরক্ষা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদের দাবীকে। রাশিয়ার প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ২০১৩-২০১৪ সালের ইউক্রেন ও সিরিয়ার ঘটনার সময় বিশ্বের সমস্ত ক্ষমতাশালী দেশগুলির মতামতের বিরুদ্ধে গিয়ে রাশিয়ার অবস্থানকে ভারতের সমর্থন প্রদান। এর থেকে বোঝা যায় যে ভারত তার পথ খোলা রাখছে পশ্চিমের ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলি সাথে (যার নেতৃত্বে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) রাশিয়ার সংঘাত বাধে তাহলে ভারত পরিস্থিতি বুঝে যে কোনো পক্ষকে সমর্থন করতে পারে।

ডেভিড মেলানোর মতানুসারে ভারত-রুশ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ভারত ও রাশিয়ার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে, সামরিক অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে, গণতান্ত্রিক উদারনৈতিক সংবিধানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধের ভিত্তিতে। সবথেকে বড় ব্যাপার হল ভারত রাশিয়া গ্যাস পাইপলাইন পরিকল্পনা ও ভূরাজনৈতিক কারণ ভারতকে বাধ্য করে রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে সম্পর্কের তুলনায়, নয়া দিল্লি রাশিয়ার সাথে ও ই.উ.-এর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রাধান্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

৪.৫ ভারতের পররাষ্ট্রনীতি—ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ই.উ.) সাথে যোগাযোগ

ভারত-ই.উ সম্পর্ক ১৯৬০-এর সময়কাল থেকে শুরু হয়। ভারত হল সেই প্রাথমিক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যারা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (E.E.G.) সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এর পরে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ ও ১৯৮১ সালে। ১৯৯৪ সালে সহযোগিতা চুক্তির ফলে (যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তৃতীয় প্রজন্মের চুক্তি বলে অভিহিত করা হয়) বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাইরেও সম্পর্কের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। ভারতের সাথে ই.উ.-এর সম্পর্কের ভিত্তি হল রাজনৈতিক মূল্যবোধের মিল—গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ, বহুক্ষমতাকেন্দ্রিকতা, মানবাধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে ও ২০০৪ সালের জুন মাসে ইউরোপীয় কমিশনের সাথে ভারতের যোগাযোগের ফলে 'ই.উ ভারত উন্নততর সখ্যতা' কিছু নির্দিষ্ট

বিষয় ও পন্থা নির্ধারণ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কটাকে কৌশলগত সংযুক্তিতে পরিণত করার জন্য। ২০০৬ সালের হেলসেঙ্কি সম্মেলনে ভারত ই.উ বাণিজ্যিক সম্পর্ক তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে রূপান্তরিত করার কথা বলে। ইউরোপীয় বাহ্যিক সম্পর্ক ইউরোপীয় প্রতিবেশী নীতি সংক্রান্ত আধিকারিক বেনিটা-ফেরেরো-ওয়ালডনার এবং বাণিজ্যিক আধিকারিক পিটার মেনডলেসন ভারতকে অভিহিত করেছেন এমন একটি রাষ্ট্র হিসাবে যার সক্ষমতা আছে বিশ্বের একটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ই.উ-র একটি যোগ্য সহযোগী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার। ১৯৯০ সাল থেকে ভারত ই.উ. দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বাণিজ্য, উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে কৌশলগত মিত্রতায় বিবর্বিত হয়েছে। ই.উ ভারতের সবথেকে বৃহৎ বাণিজ্যিক লেনদেনকারী গোষ্ঠী যারা ভারতের মোট বাণিজ্যের একের পাঁচ শতাংশ ই.উ. থেকে আসে আর ই.উ. একইসাথে ভারতে সবথেকে বেশি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করে। ই.উ-র সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে ইউ.কে. (ব্রিটেন), জার্মানি ও বেলজিয়াম, ভারতের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন সবথেকে বেশি। ভারত ই.উ. আলোচনাচক্রে বলেছিলেন যে 'ভারতের সাথে 'ই.উ-র সম্পর্ক একটি পারস্পরিকতায় আবদ্ধ এবং তাই সচেতনতা ও সৌহার্দ্যের মাত্রা বৃদ্ধি প্রয়োজন যাতে দুপক্ষের মধ্যেও আরও শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি হয় বিস্তৃত ই.উ.-র সময়কালে।' ২০০৮ সালে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট বা মন্দা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে ভারত-ই.উ.-র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রাধান্য কমেছে। অর্থনৈতিক মন্দার পরবর্তী সময়ে ই.উ. ভারতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার অর্থনীতি হিসাবে দেখে যার সাথে লেনদেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ই.উ.। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সাথে ই.উ.-র উন্নয়নমূলক সহযোগিতা বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যেমন আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা বজায়, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করা এবং দারিদ্রদূরীকরণ, SAARC গোষ্ঠীর সাথে আলোচনায় ই.উ. আগ্রহ প্রকাশ করেছে SAARC প্রতিষ্ঠানের আরও নিবিড় সম্পর্ক তৈরিতে আগ্রহ। এই ভাববেগকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০৬ সালে ই.উ.কে SAARC-এর সম্মেলনগুলিতে 'পরিদর্শনকারী (observer) হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য স্থায়ী আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই উপস্থিতির মাধ্যমে ই.উ-SAARC সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়া আরও নিবিড় হবে ই.উ.-র আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উপস্থিতির মাধ্যমে, ই.উ-র নিজের বহুত্ববাদের সাথে বিভিন্নতার সাথে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিচ্ছুরণের মাধ্যমে ও ই.উ-র দেখা অস্থিরতা মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতার গ্রহণের মাধ্যমে। যেহেতু আঞ্চলিক স্থিরতা বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব ভারতের ওপর বেশি করে বর্তায় তাই ভারত-ই.উ. ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দুভাবে—(ক) ভারত শিক্ষা নিতে পারে ইউরোপীয় প্রতিবেশী নীতি (European Neighbourhood Policy) সংক্রান্ত বিভিন্ন পন্থা থেকে যার মাধ্যমে ভারত তার আঞ্চলিক নীতির পরিমার্জন করতে পারে। (খ) ভারত শিক্ষা নিতে পারে ই.উ-র বহুস্তরীয় পরিচালন কাঠামো থেকে যার মাধ্যমে আঞ্চলিক অস্থিরতা দূরীকরণ সম্ভব সার্বভৌমিকতা, পরিচিতি (identity) সীমানা ও সুরক্ষার নতুন অর্থ অন্বেষণের মাধ্যমে আর এই সব বিষয়গুলি ভারত ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করে।

৪.৬ সারাংশ

ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি একটি চলমান উদাহরণ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সময়কাল থেকেই। এই সম্পর্ক যোগাযোগের মাধ্যমে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সবথেকে উল্লেখযোগ্য

দিক হল বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যাতে তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চল অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং অস্থির বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান বিদ্বেষ। প্রতিবেশীদের প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রনীতি অস্থিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে গর্বিত যার প্রতিফলন হল বিভিন্ন আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ গ্রহণ। নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের সাথে ভারতের সম্পর্ক স্থিতিশীল। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপে ভারতীয় নীতি প্রভাবিত হয়। পাকিস্তানের সাথে ভারতের সম্পর্ক স্বাধীনতার সময় থেকেই নিম্নগামী দু-একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত ছাড়া। দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারতকে তার প্রতিবেশী সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হয় চিনের প্রভাবকে মাথায় রেখে। ভারত চিনের ক্ষেত্রে 'নিয়ন্ত্রক-যোগাযোগ' (Congagement) নীতি নিয়েছে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে সুসম্পর্ক তৈরিতে ব্যস্ত থেকেছে আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে রাজনৈতিক-সামরিক ও কৌশলগত চুক্তির মাধ্যমে যার ফলে বিশ্বের দুটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যেও নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বর্তমান রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে ভারত-রুশ মৈত্রী চুক্তি যার মাধ্যমে নিবিড় ভারত-রুশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ভারতের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক প্রতিফলিত করে যে ভারত বহুপাক্ষিক সম্পর্কেও আগ্রহী। যদিও ই.উ-র সদস্য রাষ্ট্রগুলির সাথে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে তবুও ভারত আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে ই.উ.-র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তার নিজের (ভারতের) বিশ্বরাজনীতিতে একটি সবল অর্থনৈতিক ও কৌশলগত চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে ।

৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নসূচী

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী:

ক) সমালোচনা সহ ভারতের সথে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক আলোচনা করুন চিনের উপস্থিতির ওপর বিশেষ আলোকপাত করে।

খ) 'ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবিংশ শতাব্দীর অপরিহার্য মিত্রশক্তি'—এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিবর্তন আলোচনা করুন।

মাঝারি প্রশ্নাবলী:

ক) ঠাণ্ডা লড়াই ও ঠাণ্ডা লড়াই উত্তর পৃথিবীর প্রেক্ষিতে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) ভারত-ই.উ. (EU) সম্পর্কে ভারত কি একটি প্রাধান্যকারী ক্রীড়ক? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী:

ক) ভারত ও মায়নমারের বৈদেশিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করুন।

খ) ভারত-ভুটান সম্পর্কের বিষয়ে টীকা লিখুন।

David M. Malone, *Does the Elephant Dance? Contemporary Indian Foreign Policy*, Oxford University Press, 2011, New Delhi

Aneek Chatterjee, *World Poltics*, Person, New Delhi, 2012.

Mohamad Badrul Alam, Basic Determinants of India's Forign Policy and Bilateral Relations in Rumki Basu (ed) International Poltics: Concepts, Theories and Issues, Sage, New Delhi,2012

Partha Pratim Basu, India's Foreign Policy. Foundation Principles in Politics, Departmental Journal of Asutosh College, 2009.

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064 & Printed at Gita Printers, 51A, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009.